University of Rajshahi **Rajshahi-6205** **Bangladesh.**

RUCL Institutional Repository **http://rulrepository.ru.ac.bd**

Institute of Bangladesh Studies (IBS) PhD thesis

2020-12

History of Sanskritization of Kaibarta Caste

Roy, Nibedita

University of Rajshahi

http://rulrepository.ru.ac.bd/handle/123456789/1027

Copyright to the University of Rajshahi. All rights reserved. Downloaded from RUCL Institutional Repository.

পিএইচডি অভিসন্দর্ভ

কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়নের ইতিহাস

[History of Sanskritization of Kaibarta Caste]

নিবেদিতা রায়

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর ২০২০

কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়নের ইতিহাস

[History of Sanskritization of Kaibarta Caste]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এ পিএইচডি
প্রোগ্রামের আংশিক পূরণ হিসেবে দাখিলকৃত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ

গবেষক
নিবেদিতা রায়
পিএইচডি ফেলো
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

তত্ত্বাবধায়ক
ড. স্বরোচিষ সরকার
অধ্যাপক
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর ২০২০

ঘোষণাপত্র

“কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়নের ইতিহাস [History of Sanskritization of Kaibarta Caste]” শিরোনামে এই অভিসন্দর্ভটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজে পিএইচডি ডিগ্রির আংশিক পূরণ হিসেবে লিখিত হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার জন্য পেশ করা হয়নি।

এই অভিসন্দর্ভের একাধিক অধ্যায়ের ফলাফল নিয়ে ইতিমধ্যে আমি পাঁচটি প্রবন্ধ রচনা করেছি। প্রবন্ধ পাঁচটির নাম ও প্রকাশনাতথ্য নিম্নরূপ:

১. “কৈবর্ত জাতিবর্ণের আত্মপরিচয়,” *ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল*, ২৫ সংখ্যা (২০১৭), পৃ. ৫৭-৭০;
২. “কৈবর্ত,” স্বরোচিষ সরকার সম্পা., *বাঙালি জাতিবর্ণের উৎস সন্ধান: নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কৈবর্ত, রাজবংশী* (ঢাকা: মাদার্স পাবলিকেন্স, ২০১৯), পৃ. ১০৩-১৩৮;
৩. “কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামাজিক জঙ্গমতা: সিলেট জেলার উপর একটি সমীক্ষা” *স্থানীয় ইতিহাস*, ২২তম সংখ্যা (ডিসেম্বর ২০১৯), পৃ. ১৯৪-২০৩;
৪. “বাংলা সাহিত্যে কৈবর্ত: আত্মপরিচয় ও পেশা” *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, ৬৪ বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা (জানুয়ারি-জুন ২০২০), পৃ. ১৫৩-১৬২।
৫. “কৈবর্ত থেকে মাহিষ্যে উত্তরণ: সংস্কৃতায়নের বঙ্গীয় দৃষ্টান্ত,” *ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল*, ২৭ সংখ্যা (২০১৯) [প্রকাশনার জন্য গৃহীত];

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি প্রোগ্রামের শর্ত অনুযায়ী এগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ দুটি অভিসন্দর্ভের শেষে যুক্ত করা হলো:

১. “কৈবর্ত জাতিবর্ণের আত্মপরিচয়,” *ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল*, ২৫ সংখ্যা (২০১৭), পৃ. ৫৭-৭০;

২. “বাংলা সাহিত্যে কৈবর্ত: আত্মপরিচয় ও পেশা” *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, ৬৪ বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা (জানুয়ারি-জুন ২০২০), পৃ. ১৫৩-১৬২।

(নিবেদিতা রায়)
পিএইচডি ফেলো, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬–২০১৭
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ

প্রত্যয়নপত্র

“কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়নের ইতিহাস [History of Sanskritization of Kaibarta Caste]” শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি নিবেদিতা রায়ের দীর্ঘদিনের গবেষণার ফল এবং এটি কোনো যৌথকর্ম নয়। তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আমি এটি একাধিক বার পাঠ করেছি এবং এটিকে উন্নত করতে যথাসাধ্য পরামর্শ দিয়েছি। আমার বিশ্বাস, এই গবেষণায় প্রাপ্ত একাধিক তথ্য বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে নতুন ধারণা যুক্ত করবে। নিবেদিতা রায়ের পিএইচডি প্রোগ্রামের আংশিক পূরণ হিসেবে অভিসন্দর্ভটিকে আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এ দাখিল করার সুপারিশ করছি।

(ড. স্বরোচিষ সরকার)
অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ
এবং
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক

সারসংক্ষেপ

কৈবর্ত নামক বাংলার একটি প্রাচীন জনগোষ্ঠী সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কিভাবে নিজেদের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়, "কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়নের ইতিহাস [History of Sanskritization of Kaibarta Caste]" শীর্ষক অভিসন্দর্ভে সেই ইতিহাস ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এর মধ্যে প্রথম অধ্যায়টি 'ভূমিকা' এবং শেষ অধ্যায়টি 'উপসংহার'। অবশিষ্ট চারটি অধ্যায়ের প্রথমটিতে কৈবর্ত জাতিবর্ণের আত্মপরিচয় অনুসন্ধান করা হয়েছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা হয়েছে সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জাতিবর্ণটির প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, সময়ের ব্যবধানে কৈবর্ত জাতিবর্ণ কিভাবে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিবর্তন ঘটায় তা তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য এবং চতুর্থ অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামাজিক জঙ্গমতা।

অর্বাচীন কিছু হিন্দু শাস্ত্রে কৈবর্তকে বর্ণসংকর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা মর্যাদাহানিকর। উল্লিখিত শাস্ত্রসমূহের পাশাপাশি নানা ধরনের প্রাথমিক ও সহায়ক উপকরণ বিশ্লেষণের পরে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে যে, কৈবর্ত হলো প্রাচীন বাংলার একটি স্বতন্ত্র জনজাতি বা কৌম, কালক্রমে যারা একাধিক জাতিবর্ণ পরিচয়ে বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অংশ হয়।

কৈবর্তরা কিভাবে নিজেদের সামাজিক মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন হয় এবং নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে, সে ব্যাপারে ব্রিটিশ শাসন-আমলের বহু দালিলিক সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ১৮৯১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদনে বাংলার জাতিবর্ণগুলোর যে মর্যাদাক্রম প্রকাশিত হয় যেখানে কৈবর্ত জাতিবর্ণকে মর্যাদাহীন দেখানো হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় কৈবর্ত জাতিবর্ণকে কয়েক বছর ধরে সংগঠিতভাবে আন্দোলন করতে দেখা যায়। এই আন্দোলনের ফলে কৈবর্তদের কৃষিজীবী অংশ ১৯১১ সালে মাহিষ্য পরিচয় লাভ করে এবং সাধারণ হিন্দু তথা বর্ণহিন্দু হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করাতে সক্ষম হয়। তবে কৈবর্তদের একাধিক মৎস্যজীবী অংশ পূর্বের পরিচয়ে থেকে যায় এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী তারা তফসিলি শ্রেণির হিন্দু হিসেবে পরিচিতি পায়।

এই গবেষণায় উনিশ শতক থেকে শুরু করে একুশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামাজিক জঙ্গমতাকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা সম্ভব হলো। কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামাজিক জঙ্গমতা তাদের সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার পরিপূরক। গবেষণায় দেখা গেছে, সময়ের

পরিবর্তনে কৈবর্তদের পরিচয়ের পরিবর্তন হয়েছে, সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন হয়েছে, বসতির পরিবর্তন হয়েছে, পেশা-বৃত্তির পরিবর্তন হয়েছে, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার পরিবর্তন হয়েছে, অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ আমাকে এমফিল প্রোগ্রামে ভর্তির সুযোগ দেয় এবং প্রোগ্রামটিকে পিএইচডিতে স্থানান্তর করে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রথম দুই বছর (২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮) আমি ফেলোশিপ পাই এবং এক বছরের জন্য (২০১৭-২০১৮) 'সফর আলী আকন্দ পিএইচডি গবেষণা প্রণোদনা' লাভ করি। আমার গবেষণাকালের তৃতীয় বছর থেকে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আমাকে পিএইচডি প্রোগ্রামের মেধাবী ছাত্রী বৃত্তি প্রদান করে। এসব কারণে ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃপক্ষের নিকট আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের অধ্যাপক ড. স্বরোচিষ সরকার আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক। গবেষণাকর্মের যাবতীয় খুঁটিনাটি আমি তাঁর কাছ থেকে শিখেছি। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর সস্নেহ নির্দেশনা আমাকে ধন্য করেছে। তাঁর প্রতি আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা।

আমার এমফিল নিবন্ধন সেমিনারের বিশেষজ্ঞ আলোচক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. বিজয়কৃষ্ণ বণিক। এমফিল থেকে পিএইচডি স্থানান্তর সেমিনার এবং পিএইচডি দাখিলপূর্ব সেমিনারে বিশেষজ্ঞ আলোচক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ ফয়জার রহমান। আমার গবেষণা-প্রস্তাব পাঠ করে গঠনমূলক পরামর্শ দিয়েছিলেন নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. বখতিয়ার আহমেদ। কৈবর্ত জাতিবর্ণের জনমিতি সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিলাম ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. চন্দন রায়ের নিকট থেকে। গবেষণায় ব্যবহৃত সংস্কৃত কলেজের একটি ব্যবস্থাপত্র বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. কানাই লাল রায়। তাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শ ও সহযোগিতাকে আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজে এক বছর কোর্স-ওয়ার্ক করার সময়ে আইবিএসের পরিচালক অধ্যাপক ড. জাকির হোসেন, আইবিএসের শিক্ষক অধ্যাপক ড. এম জয়নুল আবেদীন, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজিমুল হক, ড. মোঃ মোস্তফা কামাল এবং ড. মোঃ কামরুজ্জামান গবেষণার পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে ধারণা দান করেছেন। এছাড়া যেসব বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের নিকট বাংলাদেশ বিষয়ে মূল্যবান শিক্ষা লাভ করেছিলাম তাঁরা হলেন প্রফেসর ড. মো. আবুল

কাশেম, প্রফেসর ড. মো. শহীদুল্লাহ, প্রফেসর ড. মো. মর্তুজা খালেদ, ড. সুলতানা কামাল প্রমুখ। সকলকে জানাই আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

এই গবেষণার জন্য বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বহুজনের নিকট থেকে আমি আতিথেয়তা ও সহযোগিতা পেয়েছি। এঁদের মধ্যে ভাষাবিদ পবিত্র সরকার, কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস, লেখক ও গবেষক এ কে শেরাম, সিলেট মৎস্যজীবী সমিতির নেতা সুসেন্দ্র চন্দ্র নমঃ ওরফে খোকন সরকার, পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট ভাষাসংগঠক নীতীশ বিশ্বাস, কলকাতার বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির সম্পাদক তিমিররঞ্জন হালদার ও সদস্য ডা. দুলালকৃষ্ণ দাস, পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট গবেষক ড. শিশুতোষ সামন্ত, পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক রাজপরিবারের সর্বশেষ বংশধর দীপেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রমুখের সহযোগিতা অতুলনীয়। এঁদের সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

আমার গবেষণার বিষয়ে আইবিএসের বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের ফেলোবৃন্দের সঙ্গে আলাপচারিতায় আমি অনেক সহযোগিতা পেয়েছি। বিশেষ করে নাজনিন নাহার, আরমান হোসাইন আজম, মোঃ জাহিদুল ইসলাম, মোঃ খোরশেদ আলম, খিলফাত জাহান যুবাইরাহ্‌, দেবব্রত মণ্ডল, আবু উলা মুহাঃ হাসিনুল ইসলাম আমাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন। এইসব শুভার্থী ও সহকর্মীদের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আইবিএসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইলো। তাঁদের সহযোগিতার হাত সর্বদা আমার জন্য উন্মুক্ত ছিলো।

গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য আমি বেশ কিছু লাইব্রেরি ও সংগ্রহশালা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এর মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ও আইবিএস লাইব্রেরি, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, কাজলা হেরিটেজ আর্কাইভ, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ লাইব্রেরি, পশ্চিমবঙ্গ জনগণনা ভবন, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি, পশ্চিমবঙ্গ আর্কাইভ প্রভৃতি অন্যতম। এই সকল লাইব্রেরির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। সাহায্য পেয়েছি কয়েকটি ওয়েবসাইট ও ই-লাইব্রেরি থেকে। এগুলোর মধ্যে shodhganga, archive প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অভিসন্দর্ভটি রচনার চূড়ান্ত পর্যায়ে আমি যখন দাখিলপূর্ব সেমিনারের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তখন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো গত ১২ই নভেম্বর ২০২০ আমার পরম পূজনীয় পিতা রমেশ চন্দ্র

রায়ের অকাল প্রয়াণে আমি বিমূঢ় হয়ে পড়ি। আমার এ অর্জনের খবর তিনি জেনে যেতে পারলেন না, এর চেয়ে দুঃখের আর কী আছে! তাঁর স্মৃতির প্রতি পরম শ্রদ্ধা।

আমার শ্রদ্ধেয় মাসিমা দেবী সরকারের পরামর্শ ও আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার মা নমিতা রায়, এবং শাশুড়ি-মা সুবালা দাস আমাকে নিরন্তর উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের আশীর্বাদ আমার পাথেয়।

যাঁর সহযোগিতা ছাড়া আমার গবেষণাটি সম্পন্ন করা একেবারেই সম্ভব ছিলো না, তিনি আমার জীবনসঙ্গী অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র দাস। চাকুরি জীবনের অনেক ব্যস্ততার মাঝেও সংসারের প্রায় সবটুকু দায়িত্ব তিনি একাই পালন করেছেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজেও সার্বক্ষণিকভাবে আমার সঙ্গে থেকেছেন, অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কৃতজ্ঞতাস্বীকারের নয়।

নিবেদিতা রায়

সূচিপত্র

ঘোষণাপত্র	গ
প্রত্যয়নপত্র	ঘ
সারসংক্ষেপ	ঙ
কৃতজ্ঞতাস্বীকার	ছ
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা	১
প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা	১
জাতিবর্ণ	১
কৈবর্ত	২
সংস্কার	৫
সামাজিক জঙ্গমতা	৫
সংস্কৃতায়ন	৬
তাত্ত্বিক কাঠামো	৬
জ্ঞান অবকাশ	১০
প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা ও লক্ষ্য	১৭
গবেষণা পদ্ধতি	১৮
গবেষণার এলাকা	১৮
প্রাথমিক উপকরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ	১৮
সহায়ক উপকরণ	২২
তথ্য বিশ্লেষণ	২২
গবেষণা-শৈলী	২৩
গবেষণার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা	২৩
দ্বিতীয় অধ্যায়: কৈবর্ত জাতিবর্ণের আত্মপরিচয়	২৬
হিন্দুশাস্ত্রে কৈবর্ত	২৬
ইতিহাসে কৈবর্ত	৩১
সরকারি দলিলপত্র ও ব্রিটিশদের লেখায় কৈবর্ত	৩৯
আদমশুমারি রিপোর্টে কৈবর্ত	৪৩
সহায়ক উৎসে কৈবর্ত	৫৫
বাংলা সাহিত্যে কৈবর্ত	৬০
কৈবর্ত জাতিবর্ণের পদবি	৭৮

তৃতীয় অধ্যায়: কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়ন: মর্যাদা প্রসঙ্গ ৮২
বাংলার জাতিগুলোর নাম পরিবর্তনের ইতিবৃত্ত ৮২
মর্যাদা বৃদ্ধির আন্দোলন: পটভূমি ৮৭
মর্যাদা বৃদ্ধির আন্দোলন: সূচনা পর্ব ৯৩
মর্যাদা বৃদ্ধির আন্দোলন: চূড়ান্ত পর্ব ৯৭
প্রসঙ্গ ১. সংস্কৃত শ্লোকের প্রক্ষিপ্ততা ১০৩
প্রসঙ্গ ২. হেলে ও জেলে কৈবর্তের স্বাতন্ত্র্য ১০৬
প্রসঙ্গ ৩. অস্পৃশ্যতা ১০৭
প্রসঙ্গ ৪. মর্যাদা ও কৈবর্তদের পুরোহিত ১০৮
প্রসঙ্গ ৫. ব্যবস্থাপত্র ১১০
প্রসঙ্গ ৬. আচার প্রতিপালন ১১৪
প্রসঙ্গ ৭. ভাষা ১১৪
প্রতিবেদন পরবর্তী অগ্রগতি ১১৫
মর্যাদা বৃদ্ধির আন্দোলন: উত্তর পর্ব ১১৮
মাহিষ্য আন্দোলনে পত্রিকার ভূমিকা ১২৩

চতুর্থ অধ্যায়: কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়ন: সংস্কার প্রসঙ্গ ১২৮
সংস্কার বিধায়ক ব্যক্তিবর্গ ১২৮
হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী সংস্কারসমূহের বিবরণ ১৩০
কৈবর্তের পালনীয় সংস্কার ১৪২
গার্ভসংস্কার ১৪৪
শৈশব সংস্কার ১৪৫
কৈশোর সংস্কার ১৪৬
যৌবন সংস্কার ১৪৮
অন্যান্য সংস্কার ১৫২
অস্পৃশ্যতা ১৫২
খাদ্যাভাস ১৫৪
ধর্ম-সংস্কার ১৫৫

পঞ্চম অধ্যায়: কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়ন: সামাজিক জঙ্গমতা প্রসঙ্গ ১৬০

কৈবর্ত জাতিবর্ণের জঙ্গমতা ১৬১
জাতিবর্ণগত পরবর্তন ১৬১
কৈবর্ত জাতিবর্ণে অনুপ্রবেশ ১৭০
আত্মপরিচয়ের পরিবর্তন ১৭১
পরিচয়ের প্রত্যাবর্তন ১৭১
পেশা ও বৃত্তিগত পরিবর্তন ১৭৩
জঙ্গমতায় শিক্ষার প্রভাব ১৮০
সাম্প্রতিক সময়ে কৈবর্তদের পেশা ১৮১
স্থানান্তরগত পরিবর্তন ১৮৩
ধর্মবিশ্বাসগত পরিবর্তন ১৮৫
অভ্যন্তরীণ ধর্মান্তরকরণ ১৯২

ষষ্ঠ অধ্যায়: উপসংহার ১৯৬

পরিশিষ্ট ১. কেস স্টাডি ২০৩
পরিশিষ্ট ২. সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির আবেদনসমূহ ২৩০
পরিশিষ্ট ৩. মাহিষ্য আন্দোলন সংক্রান্ত কয়েকটি পুস্তিকার আখ্যাপত্র ২৭৫
পরিশিষ্ট ৪. তথ্য সংগ্রহের আলোকচিত্র ২৮১

গ্রন্থপঞ্জি ২৮৯

সংযোজন: জার্নালে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধ ৩০৬

সারণি-সূচি

সারণি ৩.১:	কয়েকটি জাতিবর্ণের প্রার্থিত নাম ও স্বীকৃতি	৮৩
সারণি ৪.১:	মাহিষ্য নেতৃবৃন্দের জাতিবর্ণগত বিন্যাসে মাহিষ্যদের অবস্থান	১৪৩
সারণি ৫.১:	আসামে তফসিলি জাতিবর্ণের তালিকা	১৬৫
সারণি ৫.২:	১৮৭২, ১৮৮১, ১৮৯১ সালের আদমশুমারিতে কৈবর্ত জাতিবর্ণের জনবিন্যাস ও জঙ্গমতা	১৬৬
সারণি ৫.৩:	বাংলার সর্বমোট জনসংখ্যার অনুপাতে চাষি কৈবর্তদের শতকরা হার	১৬৮
সারণি ৫.৪:	১৯৩১ সালে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নমঃশূদ্র, মাহিষ্য এবং রাজবংশীদের অনুপাত	১৬৯
সারণি ৫.৫:	১৯০১-১৯৮১ সাল পর্যন্ত ভারতের কর্মজীবী মানুষের পেশাগত বিন্যাস	১৭৫
সারণি ৫.৬:	১৯০১ সালে বাংলার বিভিন্ন বিভাগে মাহিষ্যদের পেশাগত বৈচিত্র্য	১৭৬
সারণি ৫.৭:	বিভিন্ন জাতিবর্ণের ১০০০ জন উপার্জনক্ষম ব্যক্তির পেশাগত উপশ্রেণির বিন্যাস	১৭৯
সারণি ৫.৮:	১৭৯৩-১৮৪২ সাল পর্যন্ত কৃষ্ণনগরে হিন্দুদের খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরের সংখ্যা	১৯০

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১. সূচনা

বাঙালি হিন্দু সমাজ বহু ভাগে বিভক্ত। এর সামাজিক স্তরবিন্যাস খুব জটিল। ১৯৩৫ সালের পর থেকে এর প্রধান দুটি ভাগ: সাধারণ হিন্দু ও তফসিলি হিন্দু। এই দুই ভাগের মধ্যে বাংলাদেশ অঞ্চলে অন্তত ৯৩টি জাতি বা জাতিবর্ণ রয়েছে; বাঙালি হিন্দু বলতে এদেরই বোঝায়।[১] হিন্দু শাস্ত্রে হিন্দু সমাজের চারটি বর্ণের উল্লেখ থাকলেও ঐতিহাসিক কোনো কালপর্বেই উল্লিখিত চার বর্ণে গঠিত সমাজের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং পাওয়া যায় অসংখ্য জাতিবর্ণে বিভক্ত এক হিন্দু সমাজ; সংখ্যার হিসেবে যা কয়েক হাজার।[২] বাংলাদেশ অঞ্চলের উক্ত ৯৩ জাতিবর্ণের অন্যতম কৈবর্ত। উনিশ শতক পর্যন্ত জাতিবর্ণটি জেলে কৈবর্ত, হেলে কৈবর্ত, চাষা কৈবর্ত, তুঁতে কৈবর্ত প্রভৃতি নামে পরিচিত থাকলেও বিশ শতকের সূচনা নাগাদ তা সাধারণ হিন্দু ও তফসিলি হিন্দু শ্রেণির মধ্যে বিভক্ত হয়।[৩] বিশেষভাবে একটি অংশ মাহিষ্য নাম গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সাধারণ হিন্দু হিসেবে পরিচিতি পায়।[৪] সাধারণত ধারণা করা হয় যে, হিন্দু জাতিবর্ণসমূহ বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাম্প্রতিক কালের সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছে।[৫] কৈবর্ত জাতিবর্ণের ক্ষেত্রে এই সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া কিভাবে সংঘটিত হয়েছে, তা এই গবেষণার আলোচ্য।

২. প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা

২.১ জাতিবর্ণ

প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু শাস্ত্রে হিন্দু সমাজকে চারটি বর্ণে, যথা – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হিসেবে বিন্যস্ত করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই বর্ণগুলো এক পর্যায়ে 'জাতি' পরিভাষা লাভ করে। আধুনিক কালের ভারতীয় হিন্দু সমাজের তথাকথিত বর্ণ-উপবর্ণ-সংকর বর্ণাদিও 'জাতি' পরিচিতি

---

[১] অতুল সুর, *বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়* (কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৭), পৃ. ৬৩।

[২] Arundhuti Roy, "The Doctor and the Saint," in B.R. Ambedkar, *Annihilation of Caste* (New Delhi: Navayana Publishing, 2014), p. 24.

[৩] অতুল সুর, *বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়*, পৃ. ৬৩।

[৪] সত্যরঞ্জন বিশ্বাস, *মাহিষ্য আন্দোলনের ইতিহাস* (কলকাতা: নিউ ভারতী প্রেস, ১৯৮৯), পৃ. ৩৫।

[৫] M. N. Srinivas, *Religion and Society among the Coorgs of South India* (London: Oxford University Press, 1952). p. 32.

পায়। অন্যদিকে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে জাতি শব্দটি ইংরেজি ন্যাশন (nation)-এর প্রতিশব্দ হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে। এই বিবেচনায় ইংরেজি কাস্ট (caste)-এর প্রতিশব্দ হিসেবে এই গবেষণায় 'জাতিবর্ণ' পরিভাষাটি গ্রহণ করা হলো। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ব্রাহ্মণও যেমন একটি জাতিবর্ণ, কৈবর্তও তেমনি একটি জাতিবর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ গবেষণায় ইংরেজি রেস (race)-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'জনজাতি' শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের তালিকায় বাংলাদেশ অঞ্চলের এমন ৯৩টি জাতিবর্ণ স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে সাধারণ হিন্দু জাতিবর্ণগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, তিলি, মালাকার, তাঁতি, নাপিত, বারুই, কামার, কুম্ভকার, গন্ধবণিক, ময়রা, সুবর্ণবণিক, আগুরি, অঘোরী, চাষাধোপা, গোয়ালা, কৈবর্ত, মাহিষ্য, অগ্রদানী ব্রাহ্মণ, বাগল, যুগি, কাঁসারি, তাম্বুলী, স্বর্ণকার, সূত্রধর, শাহাবণিক, শাঁখারি, এবং বৈষ্ণব। অন্যদিকে তফসিলি জাতিবর্ণগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ বাউরি, চামার, ধোবা, ডোম, দোসাধ, ঘাসি, লালবেগি, মুসাহার, পান, পালি, রাজওয়ার, তুরি, বাগদি, বাহেলিয়া, বাইতি, বেদিয়া, বেলাহার, ভুঁইমালী, ভুঁইয়া, বিন্দ, দামাই, দোয়াই, গোঁড়ি, হাঁড়ি, জেলে কৈবর্ত, ঝালোমালো, কাদার, কামি, কান্দ্রা, কেওরা, করেঙ্গা, কাউর, কেওট, খটিক, কোচ, কোনাই, কোঁয়ার, কোটাল, লোহার, মাহার, মাল, মাল্লা, মেথর, নমঃশূদ্র, নুনিয়া, পলিয়া, পাটনি, পোদ্দ, রাজবংশী, সরকি, শুঁড়ি, তিয়র, বানটার, চৌপল, ভোগতা, দাবগর, হালারখোর, কানজর, কুরারিয়ার, নট, ভূমিজ, ভঙ্গি, এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।[৬]

এই গবেষণায় জাতিবর্ণ বলতে এই ৯৩টি জাতিবর্ণের প্রত্যেকটিকে বোঝানো হবে।

২.২ কৈবর্ত

কৈবর্ত জাতিবর্ণ বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ।[৭] কৈবর্ত জাতিবর্ণের প্রধান দুটি শাখাঃ ১. হালিক বা চাষি কৈবর্ত (মাহিষ্য) এবং ২. জালিক বা জেলে কৈবর্ত। তুঁতে কৈবর্ত নামে কৈবর্ত

---

[৬] স্বরোচিষ সরকার, *অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ* (ঢাকাঃ প্রতীক, ২০০৫), পৃ. ২৫।

[৭] ১৯৩১ সালের আদমশুমারিতে অবিভক্ত বাংলার সকল জাতিবর্ণের জনসংখ্যা আলাদাভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিবর্ণ হিসেবে কৈবর্তদের মোট সংখ্যা ৩৭,৯৪,৫৪৪ জন। এর মধ্যে চাষি কৈবর্ত (মাহিষ্য) ২৩,৮১,২৬৬ জন এবং জেলে কৈবর্তদের সংখ্যা ১৪,১৩,২৭৮ জন। কৈবর্তদের পরে নমঃশূদ্রদের স্থান। তাঁদের সংখ্যা ২২,৬৫,৪৭৬ জন। *Cencus of India, 1931,* vol. I, part II (Delhi: Manager of Publications, 1933), p. 524.

জাতিবর্ণের একটি শাখা রেশম চাষের সঙ্গে যুক্ত।[৮] এছাড়া গুড়ি কৈবর্ত নামে কৈবর্ত জাতিবর্ণের একটি শাখা সম্পর্কে জানা যায়, যারা ব্যবসা-বাণিজ্য পেশার সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া কেওট, মালো, জলদাস, পাটনি ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষও নিজেদের কৈবর্ত পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

অবিভক্ত বাংলার উত্তরবঙ্গ ও আসামে বসবাসকারী হিন্দুদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো অংশ কৈবর্ত জাতিবর্ণের মানুষ।[৯] বরেন্দ্রের কৈবর্তনায়ক দিব্য বা দিব্বোক পালরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান সামন্ত কর্মচারী ছিলেন বলে মনে করা হয়। অনন্তসামন্তচক্রের সঙ্গে তিনিও পালরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহপরায়ণ হয়ে রাজা দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করেন এবং বরেন্দ্র কেড়ে নিয়ে সেখানে কৈবর্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। বরেন্দ্র কিছুদিনের জন্য দিব্য, রুদোক ও ভীম এই তিন কৈবর্তরাজার অধীনতা স্বীকার করে। এ ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সমসাময়িক উত্তরবঙ্গ সমাজে কৈবর্তদের সামাজিক প্রভাব ও আধিপত্য, জনবল ও পরাক্রম যথেষ্ট ছিল।[১০] পরবর্তী কালে রামপালের হাতে পরাস্ত হয়ে কৈবর্তরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। পাল যুগের পরে সেন রাজাদের আমলে, বিশেষভাবে বল্লাল সেনের সময়ে (১১৬০-১১৭৬) জাতিবর্ণগুলো একটা নতুন বিন্যাস লাভ করে। তখন ব্রাহ্মণ ছাড়া বাংলার বাকি জাতিবর্ণগুলোকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়: ১. উত্তম সংকর, ২. মধ্যম সংকর, ও ৩. অন্ত্যজ। কৈবর্ত বা ধীবর এই বিন্যাসে মধ্যম সংকর পর্যায়ে পড়ে।[১১]

বিশ শতকের সূচনায় কৈবর্ত জাতিবর্ণ প্রধান দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯০১ সালে কৈবর্তদের মধ্যে কৃষি পেশার সাথে যুক্ত শাখাটি মাহিষ্য নাম ধারণ করে।[১২] মৎস্য পেশার সঙ্গে যুক্ত কৈবর্তই শুধু কৈবর্ত পরিচয় দিতে থাকে।

---

[৮] হিতেশরঞ্জন সান্যাল, "বাংলায় 'জাতি'র উৎপত্তি," শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত সম্পা. *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ* (দিল্লি: আইসিবিএস, ১৯৯৮), পৃ. ২৪।

[৯] Buchanan Hamilton, *General View of the History and Manner's of Kamarup, vol. 2* (Rangpur: S M Borua, 1985), pp.108-109.

[১০] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস: আদিপর্ব*, ৩য় সং (কলকাতা: দে'জ, ২০০০), পৃ. ২২৮।

[১১] অতুল সুর, *বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়* (কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৭), পৃ. ৫০-৫২।

[১২] সত্যরঞ্জন বিশ্বাস, *মাহিষ্য আন্দোলনের ইতিহাস* (কলকাতা: নিউ ভারতী প্রেস, ১৯৮৯), পৃ. ৭। ১৮৭২ সালেও মাহিষ্যগণ যে কৈবর্ত নামে পরিচিত ছিলেন তার একটি সাক্ষ্য পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "বঙ্গদেশের কৃষক," *বঙ্গদর্শন*, ভাদ্র ১২৭৯ [সেপ্টেম্বর ১৮৭২], পৃ. ২০১।

ভূমিকা

১৮৭২, ১৮৮১ এবং ১৮৯১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে চাষি কৈবর্ত (মাহিষ্য) ও জেলে কৈবর্ত উভয়ই কৈবর্ত নামে অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ১৮৯১ সালের পরে চাষি কৈবর্তগণ তাঁদের পরিচয় হিসেবে মাহিষ্য নাম দাবি করতে থাকে। এই আন্দোলনের ফলাফল স্বরূপ ১৯০১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে চাষি কৈবর্তের পরিবর্তে মাহিষ্য নাম অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯১১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে মাহিষ্য ও জেলে কৈবর্তের স্বতন্ত্র জাতিবর্ণ পরিচয় সরকারিভাবে স্বীকৃত হয়।[১৩]

মাহিষ্য আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পেছনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া। মাহিষ্য নাম গ্রহণের পাশাপাশি এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করেন এবং সেই অনুযায়ী সামাজিক সংস্কারসমূহ পালন করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। তবে কৈবর্ত নামে পরিচিত সকল জনগোষ্ঠী এই প্রক্রিয়ায় সমানভাবে এগিয়ে আসতে পারেনি। শুধু কৃষিবৃত্তিধারী কৈবর্তরা এতে এগিয়ে থাকে। তখন অন্যান্য বৃত্তিধারী কৈবর্তগণ পূর্ব পরিচয় এমনকি কখনো কখনো আলাদা পরিচয় ধারণ করে।

এই গবেষণায় সব ধরনের কৈবর্তকে আলোচ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই কৈবর্ত বলতে এখানে মাহিষ্য বা চাষি কৈবর্ত, জেলে কৈবর্ত, গুড়ি কৈবর্ত, তুঁতে কৈবর্ত, মালো কৈবর্ত, জলদাস কৈবর্ত, পাটনি কৈবর্ত সকলেই বোঝাবে।

বিভিন্ন সালের আদমশুমারি রিপোর্ট ও ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ার অনুযায়ী কৈবর্ত জাতিবর্ণ বাংলাদেশসহ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা প্রভৃতি প্রদেশে বাস করে। বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের প্রায় সব অঞ্চলেই জাতিবর্ণটির বসবাস। এর মধ্যে বাংলাদেশের সিলেট, খুলনা, যশোর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী, রংপুর, পাবনা, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম এবং পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, জলপাইগুড়িতে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। কৈবর্তদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আসামের কাছাড়, গোয়ালপাড়া, লখিমপুর, নওগাঁও, শিবসাগর প্রভৃতি জেলায় বাস করে।

[১৩] সত্যরঞ্জন বিশ্বাস, *মাহিষ্য আন্দোলনের ইতিহাস*, পৃ. ৩৫।

২.৩ সংস্কার

হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী 'সদাচার, সংযম ও বিহিত' কর্মের অনুষ্ঠান করাই হলো সংস্কার। কোন কোন বর্ণ কী কী উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করবে শাস্ত্রে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। অর্থাৎ একজন গৃহস্থের কর্তব্য, খাদ্যাখাদ্য, শৌচাশৌচ বা শুদ্ধি-অশুদ্ধি, চতুর্বর্ণের আপৎকালের বিধান, প্রায়শ্চিত্ত বিধান প্রভৃতি বিধিবিধানই সংস্কার নামে হিন্দু সমাজে পরিচিত।[১৪] এক কথায় বলা যায়, শাস্ত্র অনুসারে হিন্দুদের জন্য ধর্মীয় আচরণবিধিই হলো সংস্কার। চতুর্বর্ণের পার্থক্যের সাথে সাথে তাদের সংস্কারের মধ্যেও পার্থক্য দেখা হয়।

বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী, শাস্ত্রে বর্ণিত সংস্কার পালন হিন্দুদের নিকট মাঙ্গলিক কর্ম হিসেবে বিবেচিত। হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে, সংস্কার শরীর ও মনের শুদ্ধি ও মনুষ্যত্ব অর্জনে সহায়তা করে এবং মানুষের দৈহিক মলিনতা দূর করে ব্যক্তিকে দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণে বিভূষিত করে। নানা ধরনের আচার-অনুষ্ঠান, বিধি ও প্রথা নিয়ে এসব সংস্কার। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি হলো এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংস্কার।

এই গবেষণায় সংস্কার বলতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জাতিবর্ণভেদে হিন্দু সমাজে পালনীয় এসব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বিধিবিধান ও প্রথাকে বোঝানো হয়েছে।

২.৪ সামাজিক জঙ্গমতা

সামাজিক জঙ্গমতা বলতে একটি সমাজে কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর সামাজিক স্তরগত পরিবর্তনকে বোঝায়।[১৫] অর্থাৎ সমাজের মধ্যে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সমাজে বর্তমান বা প্রচলিত অবস্থান থেকে তার সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তনই হলো সামাজিক জঙ্গমতা।[১৬] অর্থনীতি, পেশা ও সামাজিক শ্রেণিগত অবস্থান দ্বারা সামাজিক জঙ্গমতা পরিমাপ করা যায়। সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থান মানুষের শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে যার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় একটি সমাজের জঙ্গমতার ধরন কেমন হবে। এই গবেষণায় কৈবর্ত জাতিবর্ণের জাতিবর্ণগত পরিবর্তন, পেশা-বৃত্তিগত পরিবর্তন, স্থানান্তরগত পরিবর্তন, ধর্মবিশ্বাসগত

---

[১৪] উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পা., *মনুসংহিতা* (কলকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৩০), পৃ. ভূমিকা ২।

[১৫] Nicholas Abercrombie etal., *Dictionary of Sociology* (England: Penguin Books, 1994), p. 386.

[১৬] Pitirim A. Sorokin, *Social and Cultural Mobility* (Illinois: The Free Press of Glencoe, 1959), p. 3.

পরিবর্তন প্রভৃতি বিবেচনার মধ্য দিয়ে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামাজিক জঙ্গমতাকে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২.৫ সংস্কৃতায়ন

সমাজবিজ্ঞানী এম এন শ্রীনিবাস ১৯৫২ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'সংস্কৃতায়ন' (Sanskritization) প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন।[১৭] দক্ষিণ ভারতীয় কুর্গ উপজাতিদের মধ্যে গবেষণা চালানোর সময়ে শ্রীনিবাস লক্ষ করেন যে বর্ণপ্রথার আওতায় অব্রাহ্মণ্য জাতিবর্ণের জনগণ উচ্চ সামাজিক মর্যাদা অর্জনের উদ্দেশ্যে তথাকথিত উচ্চবর্ণের (বিশেষ করে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়) জনগণের জীবনরীতি অনুকরণ করে। এই প্রক্রিয়া বা প্রবণতাকে শ্রীনিবাস সংস্কৃতায়ন আখ্যা দেন।[১৮]

শ্রীনিবাস সংস্কৃতায়ন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন, যেখানে কিছু জাতিবর্ণ হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্ণহিন্দুদের অনুরূপ আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, পোশাক, খাদ্যাভাস প্রভৃতি গ্রহণ করে এবং নিজেদের বর্ণহিন্দু হিসেবে দাবি করে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষা ও আর্থিক উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এই গবেষণায় সংস্কৃতায়ন বলতে কৈবর্ত জাতিবর্ণের যাবতীয় পরিবর্তন, যেমন – আত্মপরিচয়ের পরিবর্তন, সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন, সংস্কারের পরিবর্তন, পেশার পরিবর্তন, ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন প্রভৃতি বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়নের ইতিহাস মানে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামগ্রিক পরিবর্তনের ইতিহাস, তাদের রূপান্তরের ইতিহাস, তাদের বদলে যাওয়ার ইতিহাস।

৩. তাত্ত্বিক কাঠামো

উনিশ শতক নাগাদ বাঙালি হিন্দু সমাজ বিভাজনের সার্থক প্রতিফলন ঘটে ১৮৭৫ সালে প্রণীত লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্যের 'স্বম্বন্ধ নির্ণয়' গ্রন্থে। লালমোহন বিদ্যানিধি এই গ্রন্থে ব্রাহ্মণ ব্যতীত

[১৭] M. N. Srinivas, *Religion and Society among the Coorgs of South India*, p. 32.
[১৮] Ibid.

সকল বাঙালি হিন্দুকে চারটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করে বর্ণনা করেছেন। এই বিভাগ করতে গিয়ে তিনি প্রধানত শাস্ত্র এবং গৌণত সমকালীন সমাজে স্থিত ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হন। লালমোহনের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী কায়স্থ-বৈদ্যসহ বঙ্গীয় শূদ্রগণ চার ভাগে ভাগ বিভক্ত, যথা – ১. সৎশূদ্র, ২. জল আচরণীয় শূদ্র, ৩. জল অব্যবহার্য শূদ্র, এবং ৪. অস্পৃশ্য শূদ্র।[১৯] এই বিভাজন অনুযায়ী বাঙালি হিন্দুর জাতিবর্ণের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। গ্রন্থটিতে তিনি প্রতিটি জাতিবর্ণের সামাজিক অবস্থান নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন। লালমোহনের এই শাস্ত্র সমর্থিত বিভাজনের পাশাপাশি জাতিবর্ণগুলোর পারিসংখ্যানিক বিবরণ পাওয়া যায় ১৮৭২ সালে সূচিত উপমহাদেশের প্রথম আদমশুমারি থেকে। বিশেষভাবে ১৯০১ সালে আদমশুমারির প্রতিবেদনে এইচ এইচ রিজলি সম্ভবত এই শাস্ত্র এবং মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা থেকে জাতিবর্ণগুলোর উচ্চাবচ শ্রেণিবিন্যাস লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

বাঙালি জাতিবর্ণসমূহের এই উচ্চাবচ অবস্থানের পাশাপাশি অধিকাংশ বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়কে অস্পৃশ্য শূদ্র হিসেবে নির্ধারণের বিষয়টি সমাজচিন্তায় নতুন চিন্তার উদ্রেক করে। মনে হয়, এই অঞ্চলের অসংখ্য জনজাতিকে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে এই ধরনের বিন্যাস করতে হয়েছে। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে অন্যান্য জাতিবর্ণের মতো কৈবর্তও একটি জনজাতি হিসেবে পরিচিত ছিলো। এম এন শ্রীনিবাসের সংস্কৃতায়ন তত্ত্ব সেই অনুমানের পরিপূরক।

এম এন শ্রীনিবাসের মতে সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ায় বর্ণবহির্ভূত জাতিবর্ণ বা জনগোষ্ঠী ব্রাহ্মণাদি জাতিবর্ণের আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা অনুকরণ করে দাবি জানিয়ে থাকে যে, তারা মোটেও নিকৃষ্ট নয় এবং ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণাদি জাতিবর্ণের সমান। এই দাবির ক্ষেত্রে প্রায়ই যুক্ত থাকে নতুন অর্জিত আর্থিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতা।[২০] সংস্কৃতায়নের উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বর্ণবহির্ভূত আমিষভোজীরা তাদের আমিষ আহার বর্জন করে ব্রাহ্মণদের মতো নিরামিষাশী হয়, মাদক পানীয় বর্জন করে, পৈতা ধারণ করে এবং আপন দেবদেবীর পরিবর্তে পৌরাণিক (সংস্কৃত) দেবদেবীর অর্চনা শুরু করে। তাদের ধারণা যে, এভাবে ব্রাহ্মণ্য ধারায় জীবনযাপন করলে তাদের

---

[১৯] লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য, *সম্বন্ধ নির্ণয়* (১৮৭৫; ২য় সং; কলকাতা: শশিভূষণ ভট্টাচার্য, ১৮৯৬), পৃ. ১০৮।

[২০] M. N. Srinivas, *Social Change in Modern India* (Bombay: Orient Longman, 1972), p.2.

সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এভাবে সংস্কৃতায়নের মধ্য দিয়ে বর্ণবহির্ভূত হিন্দুদের মধ্যে সামাজিক জঙ্গমতা ঘটে, এবং জাতিবর্ণ হিসেবে সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা পরিবর্তিত হয়।

বাঙালি জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়নের কিছু উদাহরণ পাওয়া যায় নির্মলকুমার বসু রচিত 'হিন্দু সমাজের গড়ন' (১৯৪৯) গ্রন্থে। এ বইটিতে তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে অরণ্যবাসী কয়েকটি জাতি যেমন, মুণ্ডা, কলু বা তেলিদের ইতিহাস এবং এদের উপরে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের বিস্তার আলোচনা করেছেন। এছাড়া, ভারতবর্ষে আর্য সমাজের গঠন ও আর্য-সংস্কৃতির প্রকৃতি, বর্ণব্যবস্থার প্রাচীন ইতিহাস, মধ্যযুগের ইতিহাস, ইংরেজি আমলে পরিবর্তনের ধারা, বর্ণব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিক আন্দোলন অর্থাৎ ১৮৭২ সালের আদমশুমারি রিপোর্টের বিরুদ্ধে যোগী ও নমঃশূদ্রদের আন্দোলন এখানে স্থান পেয়েছে, যা তাদের সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়াকে প্রতিফলিত করে। কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়াও এসব জাতিবর্ণের অনুরূপ হওয়া সম্ভব।

আশির দশকে ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চায় 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' নামে একটি বিষয় বহুলভাবে জনপ্রিয় হয়। 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে।[২১] এ বিষয়টি সমাজবিজ্ঞান এমনকি ভাষা-সাহিত্য-শিল্পচর্চার গবেষণা ক্ষেত্রেও আলোড়ন তোলে। এই গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রণজিৎ গুহ, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম ভদ্র, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে প্রমুখ ব্যক্তি। তাঁরা 'সাবলটার্ন' শব্দটি ইতালির কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশির 'প্রিজন নোটবুকস' থেকে সংগ্রহ করেছেন। রণজিৎ গুহ এর বাংলা অর্থ করেছেন নিম্নবর্গের ইতিহাস। এর আগে ভারতের ইতিহাসে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলো এলিট বা শাসক শ্রেণি। যেমন – কংগ্রেস, মুসলিম লীগ প্রভৃতি। এই ইতিহাস ছিলো রাজনৈতিকভাবে জয়ীদের ইতিহাস। নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা যাঁরা করেন তাঁদের সার্থকতা এখানেই যে, তাঁরা সামাজিক ইতিহাসে নামহীন গোত্রহীন সাধারণ মানুষের কথা বলতে শুরু করেন। তাঁরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, শুধু শাসক শ্রেণি বা উচ্চবর্গ নয় বরং সামাজিক ইতিহাসে আপামর জনসাধারণেরও অস্তিত্ব রয়েছে, ইতিহাসের বাঁক বদলে তাঁদেরও অবদান রয়েছে। উত্তর আধুনিক চিন্তাবলয়ে এই জনগণই তাঁদের গবেষণার বিষয়বস্তু, এরাই তাদের ভাষায় নিম্নবর্গ।[২২]

[২১] গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পা., "নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার ইতিহাস," পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পা., *প্রজা ও তন্ত্র* (২য় সং; কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০০৫), পৃ. ৪১।

[২২] তদেব।

নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা নিয়ে অনেক সমালোচনাও রয়েছে। এই সমালোচনা শুরু হয়েছে নিম্নবর্গের পরিচয়বিধি নিয়ে। নিম্নবর্গের লেবেল যাদের উপর সেঁটে দেওয়া হয়, সামাজিক অবস্থানে, স্বার্থের টানে ও কর্মসম্পর্কের যোগসূত্রে তারা সবাই এক রকম নয়। তাঁদের ভাষ্যমতে, শ্রমিক, কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্ত গ্রাম ও শহরের গরিব জনতা, আদিবাসী, নারী সবাই নিম্নবর্গের।[২৩] আধুনিক সমাজ বাস্তবতায় সকল নারীর অবস্থান কি কেবল সমাজের নিম্নবর্গেই? নারীকে ঢালাওভাবে নিম্নবর্গের প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করায় যৌক্তিক নির্মাণের সমস্যা দেখা যায়। ঠিক তেমনি আদিবাসী, উপজাতি, জনজাতি সবাইকে নিম্নবর্গে ফেলে দেওয়ায় দেখা যায় একই রকম বিভ্রান্তি।[২৪]

সাবলটার্ন স্টাডিজের ইতিহাসের শুরু ঔপনিবেশিক আমল থেকে। তার আগের ইতিহাস তাঁদের কাছে অবান্তর। এ প্রসঙ্গে সনৎকুমার সাহার গঠনমূলক একটি সমালোচনা রয়েছে। তাঁর মতে, জাতিভেদপ্রথা প্রাক-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা। জাতিভেদপ্রথা বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় না। ঔপনিবেশিকতা পেরিয়েও তা বাস্তব। এক্ষেত্রে নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদদের নাকচ করে দিতে তিনি কৈবর্ত জাতিবর্ণের অবতারণা করেন। এগারো শতকে পাল রাজাদের আমলে কৈবর্ত বিদ্রোহ ঘটেছিলো। কৃষিকাজ ও মাছধরা ছিলো তাদের প্রধান জীবিকা। স্বাধীন রাজ্যও তারা গড়েছিলো কিন্তু টিকিয়ে রাখতে পারেনি। তাঁর মতে, রাজা নিম্নবর্গের হলেও রাজা-প্রজা সম্পর্কে সমতা আসেনি, বৈষম্য আরো অরাজকতা ডেকে এনেছিলা।[২৫] অবশেষে ১০৭৫ সালে পাল রাজা ধর্মপাল তাদের পরাস্ত করেছিলো। সনৎ কুমার সাহা মনে করেন, পাল রাজারা বৌদ্ধ ভাবাপন্ন ছিলেন তাই তারা জাতিভেদ প্রথাকে প্রশ্রয় দেওয়ার কথা নয়। কিন্তু কৈবর্তদের অস্পৃশ্যতাকে তারা দূর করেননি অথবা করতে পারেনি। আরো প্রায় একশো বছর পরে সেন রাজা বল্লাল সেন কৈবর্তদের সৎবর্ণের মর্যাদা দিয়ে তাদের সঙ্গে একটা রফা করেন। তাঁর মতে, জাতিভেদের সাথে কৃষির সম্পর্ক অনেক প্রাচীন। নিম্নবর্গের কেউ রাজা হলেই তার সমাধান আপনা-আপনি হয়ে যায় না এর উদাহরণ কৈবর্ত রাজাদের ব্যর্থতা। বর্ণবিন্যাসে তথাকথিত নিম্নবর্ণেও বহুস্তর রয়েছে, বহু জল-অচল সমস্যাও আছে। এই বিরোধ ঘোচাবার কথা কৈবর্ত

[২৩] সনৎকুমার সাহা, “নিম্নবর্গের খতিয়ান: আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রতারণা,” সনৎকুমার সাহা, *কথায় ও কথার পিঠে* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৮), পৃ. ১৫৩।

[২৪] তদেব, পৃ. ১৫৪।

[২৫] তদেব, পৃ. ১৫৮।

রাজারাও ভাবেনি। সনৎকুমার সাহা মনে করেন, এ বিষয়টির তাৎপর্য নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদদের কাছেও গুরুত্ব পায় না।[২৬]

বর্তমান গবেষণাটিও একটি সমাজ-ইতিহাস গবেষণা। এই গবেষণার মূল কেন্দ্রবিন্দু কৈবর্ত জাতিবর্ণ, যারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ও অনগ্রসর। জাতিবর্ণটি একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জনজাতি থেকে জাতিবর্ণে পরিণত হয়েছে। তবে এই গবেষণাটিকে কোনো বিশেষ ঘরানা বা আদর্শের মধ্যে আটকে রেখে নয় বরং সকলের মতামতকে সমান গুরুত্ব দিয়ে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়নের ইতিহাস উদ্ধার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪. জ্ঞান অবকাশ

এম এন শ্রীনিবাসের বেশ কয়েকটি গবেষণাপত্র জাতিবর্ণ ও সংস্কৃতায়নের সঙ্গে জড়িত। কুর্গ জাতির সংস্কৃতায়ন নিয়ে তাঁর কাজটি এক্ষেত্রে প্রারম্ভিক। বইটির নাম: *রিলিজিয়ন অ্যান্ড সোসাইটি অ্যামাঙ্গ দ্য কুর্গস ইন সাউথ ইন্ডিয়া*।[২৭] এছাড়া আরো কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি তাঁর সংস্কৃতায়ন ধারণাটিকে প্রলম্বিত করেছেন। যেমন *স্যোসাল চেঞ্জ ইন মডার্ন ইন্ডিয়া* (১৯৭২) গ্রন্থে শ্রীনিবাস দেখিয়েছেন যে, সামাজিক পরিবর্তন ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্ষুদ্র পর্যায়ে একটি গ্রামের উপর তিনি বস্তুনিষ্ঠ একটি গবেষণায় দেখান যে, সামাজিক প্রক্রিয়া কালানুক্রমিকভাবে হয়ে থাকে। যেমন, একটি গ্রামের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে, তা হলো প্রথমে সংস্কৃতায়ন (Sanskritization), এরপর পাশ্চাত্যীকরণ (Westernization) এবং সবশেষে ইহজাগতিকীকরণ (Secularization)। *কাস্টস ইন মডার্ন ইন্ডিয়া অ্যান্ড আদার এসেজ* (১৯৬২) বইটিতে তিনি বর্ণগুলোকে আরও অনেক উপবিভাগে ভাগ করেন, যাদের নিজেদের স্বকীয় বৃত্ত (পেশা, আচার-অনুষ্ঠান সংস্কৃতি প্রভৃতি) রয়েছে। এই উপবিভাগগুলোর সঙ্গে কিছু নিয়ন্ত্রক থাকে যেমন: মর্যাদাক্রম, স্পৃশ্যতা বা অস্পৃশ্যতা, বর্ণ, পঞ্চায়েত, সভা প্রভৃতি। বর্ণাশ্রম এবং সংস্কৃতায়ন নিয়ে শ্রীনিবাসের অন্যান্য বইগুলো হলো: *দ্য ডমিন্যান্ট কাস্ট অ্যান্ড আদার এসেজ* (১৯৮৭), *দ্য কোহেসিভ রোল অব সংস্কৃতাইজেশন*

---

[২৬] তদেব।

[২৭] M. N. Srinivas, *Religion and Society among the Coorgs of South India* (London: Oxford University Press, 1952).

(১৯৮৯), *ভিলেজ, কাস্ট, জেন্ডার অ্যান্ড মেথড* (১৯৯৬)।[২৮] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই গবেষণার সংস্কৃতায়ন বিষয়ক ধারণাটি শ্রীনিবাসের গ্রন্থ থেকে প্রায় অভিন্ন অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে।

নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাসঃ আদিপর্ব' বইটিতে তিনি বর্ণবিন্যাস আলোচনা করতে গিয়ে হিন্দুশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ যেমন, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বল্লালচরিত, কুলজী গ্রন্থমালা প্রভৃতি গ্রন্থ এবং সমকালে প্রাপ্ত সরকারি-রেসরকারি দলিল দস্তাবেজ, প্রতিবেদন প্রভৃতি থেকে জাতিবর্ণ সংক্রান্ত বহু তথ্য উপস্থাপন করেছেন। এমনকি তিনি এ সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে 'বাঙালি হিন্দুর বর্ণভেদ' নামে স্বতন্ত্র একটি বই লিখেছেন।[২৯] উভয় গ্রন্থে নীহাররঞ্জন রায় কৈবর্ত জাতিবর্ণের ইতিহাস ও পরিচয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। যদিও কৈবর্তদের সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া, অর্থাৎ কিভাবে কৈবর্ত জাতিগোষ্ঠী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে মাহিষ্য ও কৈবর্ত নাম গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেননি।

বাঙালি জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়নের কিছু উদাহরণ পাওয়া যায় নির্মলকুমার বসু রচিত 'হিন্দু সমাজের গড়ন' (১৯৪৯) গ্রন্থে। এ বইটিতে তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে অরণ্যবাসী কয়েকটি জাতি যেমন, মুণ্ডা, কলু বা তেলিদের ইতিহাস এবং এদের উপরে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের বিস্তার আলোচনা করেছেন। এছাড়া, ভারতবর্ষে আর্য সমাজের গঠন ও আর্য-সংস্কৃতির প্রকৃতি, বর্ণব্যবস্থার প্রাচীন ইতিহাস, মধ্যযুগের ইতিহাস, ইংরেজি আমলে পরিবর্তনের ধারা, বর্ণব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা এবং বিভিন্ন জাতির সামাজিক আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৩০] কিন্তু কৈবর্তদের সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি তাঁর আলোচনায় স্থান পায়নি।

অতুল সুর রচিত 'বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' বইটিতে বাঙালি নৃতত্ত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা রয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, প্রাচীন বাংলার সামাজিক সংগঠন গুলো কৌমভিত্তিক ছিল। তিনি ধারণা করেন পুণ্ড্রদের বংশধর হচ্ছে বর্তমান পোদ জাতি ও কর্বটদের বংশধর হচ্ছে কৈবর্ত। সেন রাজাদের সময়ে বাংলায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিস্তার ঘটে। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে কৈবর্ত জাতিবর্ণ সংকর এবং ১৮৭২ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী কৈবর্ত জাতি বৃহত্তম। তাঁর উল্লেখ অনুযায়ী, বর্তমানে চাষি কৈবর্তরা মাহিষ্য নামে পরিচিত হলেও ১৮৭২ সালের আদমশুমারি

---

[২৮] *The Dominant Caste and Other Essays* (1987), *The Cohesive Role of Sanskritization* (1989), *Village, Caste, Gender and Method* (1996).

[২৯] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালি হিন্দুর বর্ণভেদ* (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, ১৯৪৭)।

[৩০] নির্মল কুমার বসু, *হিন্দু সমাজের গড়ন* (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী , ১৯৪৯), পৃ. ১৪৮-১৫৪।

রিপোর্টে এরা কেউই নিজেদের মাহিষ্য বলে দাবি করেননি।[৩১] এভাবে সংস্কৃতায়ন সম্পর্কিত কোনো আলোচনা তাঁর গ্রন্থে না থাকলেও তাঁর দেওয়া বহু তথ্য সংস্কৃতায়ন তত্ত্বকে সমর্থন করে।

প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার তাঁর 'আসপেক্টস অফ কাস্ট অ্যান্ড সোস্যাল স্ট্রাকচার ইন এ রুর‍্যাল কমিউনিটি ইন বাংলাদেশ' গবেষণাগ্রন্থে গ্রামীণ সমাজ কাঠামো এবং জাতিগুলোর মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া খুব সংক্ষিপ্তভাবে মাহিষ্য জাতিগোষ্ঠী এবং তাদের সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৩২] তাঁর এ গবেষণায় তিনি গ্রামীণ সমাজ কাঠামো এবং জাতিগুলোর মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ককে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর দেওয়া বেশ কিছু তথ্য পরোক্ষভাবে সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'স্যোসাল মবিলিটি ইন দ্য লেট নাইনটিনথ অ্যান্ড আর্লি টুয়েনটিথ সেঞ্চুরীস' (১৯৮৫) নামক গবেষণাগ্রন্থে ব্রিটিশদের দৃষ্টিতে জাতিব্যবস্থা, ব্রিটিশ আমলে জাতিব্যবস্থার সাথে মর্যাদা, বৈষম্য এবং রাজনীতির সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সামাজিক জঙ্গমতা আলোচনা করেছেন।[৩৩] গবেষণাটিতে নমঃশূদ্র জাতির আন্দোলন কেসস্টাডি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়নি।

গবেষণাগ্রন্থটির আলোকে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বই লিখেছিলেন, যেখানে ঔপনিবেশিক ভারতে (১৮৭২-১৯৪৭) নমঃশূদ্র জাতিবর্ণের আত্মপরিচয়ের আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[৩৪] এছাড়া আরও একটি বইয়ে বাংলার জাতিব্যবস্থা এবং নমঃশূদ্র জাতির উপর আলোচনা রয়েছে।[৩৫] শেষোক্ত বইটিতে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও আন্দ্রে বেতেই, হিতেশরঞ্জন সান্যাল, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুরজিৎ সিংহ প্রমুখ লেখক বাংলার জাতিব্যবস্থা ও বিভিন্ন জাতিবর্ণের উপরে

---

[৩১] অতুল সুর, *বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়* (কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৯৯), পৃ. ৪০।

[৩২] Profulla Chandra Sarker, "Aspects of Caste and Social Structure in a Rural Community of Bangladesh" (MPhil Thesis, IBS, Rajshahi University, 1976), p. 60.

[৩৩] Sekhar Bandyopadhayay, "Social Mobility in Bengal in the Late Nineteenth and the Early Twentieth Centuries" (PhD Dissertation, University of Calcutta, 1985).

[৩৪] Sekhar Bandyopadhayay, *Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namasudras of Bengal, 1872-1947,* 2nd ed. (1997; New Delhi: Oxford University Press, 2011).

[৩৫] শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত সম্পা., *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ* (দিল্লি: আইসিবিএস, ১৯৯৮), পৃ. ১২০।

লিখেছেন। এঁদের আলোচনার লক্ষ্য মূলত নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনা করা। তাই সঙ্গত কারণেই সেখানে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়ন সম্পর্কে তারা আলোচনা করেননি।[৩৬]

স্বরোচিষ সরকার তাঁর 'অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি' (১৯৯৭) প্রবন্ধটিতে অন্যান্য জাতিবর্ণের পাশাপাশি হিন্দু সমাজে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামাজিক অবস্থান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে এদের সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৩৭] প্রসঙ্গত কৈবর্তদের মর্যাদা বৃদ্ধির আন্দোলন সেখানে আলোচিত হয়।[৩৮] স্বরোচিষ সরকারের 'অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটিও জাতিবর্ণের আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।[৩৯] এছাড়া তাঁর 'নমঃশূদ্রের উৎস সন্ধান' (২০০৬) প্রবন্ধটিতে নমঃশূদ্রদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি সংক্রান্ত আন্দোলন ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা স্থান পেয়েছে।[৪০] এসব রচনায় সংস্কৃতায়ন প্রত্যয়ের সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও এখানে নমঃশূদ্র জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়ন সম্পর্কিত বহু তথ্যের সন্নিবেশ ঘটেছে, যা পরোক্ষভাবে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে ভাবতে সাহায্য করে।

"স্যোসাল মবিলিটি ইন সিডিউল কাস্টস: এ স্যোসিওলজিক্যাল স্টাডি ইন বালিয়া ডিস্ট্রিক্ট (ইউপি)" (১৯৯৯) শিরোনামে বিনোদ কুমার বৈদ্য একটি গবেষণাগ্রন্থে উত্তর প্রদেশের তফসিলি জাতির সামাজিক জঙ্গমতা নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৪১] প্রসঙ্গক্রমে জেলে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামাজিক জঙ্গমতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে স্বাভাবিকভাবেই সমগ্র কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়ন এখানে আলোচিত হয়নি।

---

[৩৬] আন্দ্রে বেতেই, "পদমর্যাদা: মূল্যায়ন ও ক্রমোচ্চ বিন্যাস," হিতেশরঞ্জন সান্যাল, "বাংলায় 'জাতি'র উৎপত্তি," পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "জাতি ও নিম্নবর্গের চেতনা," সুরজিৎ সিংহ, "হিন্দু-ভূমিজ পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যম ও প্রকৃতি," অন্তর্ভুক্ত, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত সম্পা. *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ* (দিল্লি: আই সি বি এস, ১৯৯৮), পৃ. ৫।

[৩৭] স্বরোচিষ সরকার, "অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনের পটভূমি", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, পঞ্চদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৭, পৃ. ১০১।

[৩৮] তদেব, পৃ. ১১৭।

[৩৯] স্বরোচিষ সরকার, *অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ* (ঢাকা: অবসর প্রকাশ, ২০০৫),

[৪০] স্বরোচিষ সরকার, "নমঃশূদ্রের উৎস সন্ধান," *গণমুক্তি*, নমঃশূদ্রের উৎস সন্ধান সংখ্যা, ২০০৬।

[৪১] Vinod Kumar Baidya, "Social Mobility in Scheduled Castes: A Sociological Study in Ballia Districts (U.P)" (PhD Dissertation, Mahatma Gandhi Kashi Vidhyapeeth, Varanasi, 1999).

রাকেশ কুমার "স্যোসাল মবিলিটি অ্যামাঙ্গ ব্যাকওয়ার্ড কাস্টস ইন ওয়েস্টার্ন ইউপি: এ স্যোসিওলজিক্যাল স্টাডি " (২০০২) শিরোনামে একটি গবেষণাগ্রন্থে উত্তর প্রদেশের অনগ্রসর জাতির সামাজিক জঙ্গমতা নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৪২] তাঁর গবেষণায় তিনি অনগ্রসর জাতিগুলোর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, আর্থসামাজিক অবস্থা এবং সামাজিক মর্যাদা নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত না হলেও এই গবেষণা থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ ধারণার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়।

"ইকোনমিক লাইফ রিফ্লেক্টেড ইন দি ফোকলোর অব দ্য কৈবর্ত কমিউনিটি অব আনডিভাইডেড কামরূপ ডিস্ট্রিক্ট অব আসাম" (২০১৩) শিরোনামে একটি গবেষণাগ্রন্থে উৎপল ডেকা লোকসাহিত্য বা লোকবিদ্যার মাধ্যমে কৈবর্ত জাতিবর্ণের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৪৩] গবেষণাটিতে নির্দিষ্ট একটি এলাকার কৈবর্ত জাতিবর্ণের অর্থনৈতিক জীবনের পাশাপাশি তাদের পরিচয়, স্থানান্তর, জনমিতি, সামাজিক জঙ্গমতা প্রভৃতি সামগ্রিক জীবনব্যবস্থাকে পর্যালোচনা করা হয়েছে – যা বর্তমান গবেষককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভাবতে সাহায্য করেছে।

গীতালি বোড়া তাঁর "কন্টিউনিটি অ্যান্ড চেঞ্জেস ইন ইকোনমি অ্যাম্যাঙ্গ দ্য কৈবর্তস অব কাপাহুয়া অ্যান্ড নাকাপাহুয়া ভিলেজ অব লখিমপুর ডিস্ট্রিক্ট, আসাম" (২০১৫) নামক গবেষণাগ্রন্থে কৈবর্ত জাতিবর্ণকে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করেছেন।[৪৪] আসামে কৈবর্তদের বৃত্তি এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানে কী কী পরিবর্তন এসেছে তা এই গবেষণার মূল বিষয়।

ভনিতাশ্রী কলিতা তাঁর "এ স্টাডি অন অক্যুপেশনাল চেঞ্জ অ্যাম্যাঙ্গ দ্য কৈবর্তস অ্যান্ড বানিয়াস অব বার্পিতা টাউন, আসাম" (২০১৫) নামক গবেষণাগ্রন্থে আসামে কৈবর্ত এবং বানিয়া জাতিবর্ণের বৃত্তি পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৪৫] এখানে জেলে কৈবর্ত জাতিবর্ণের পেশাগত জঙ্গমতা নিয়ে আলোচনা লক্ষ করা যায়।

[৪২] Rakesh Kumar, "Social Mobility among Backward Castes in Western U.P.: A Sociological Study" (PhD Dissertation, CH. Charan Singh University, Meerat, 2002).

[৪৩] Utpal Deka, "Economic Life Reflected in the Folklore of the Kaibarta Community of Undivided Kamrup District of Assam" (PhD Dissertation, Gauhati University, 2013).

[৪৪] Gitali Borah, "Continuity and Changes in Economy among the Kaibartas of Kapahua and Nakapahua village in Lakhimpur District, Assam" (PhD Dissertation, Gauhati University, 2015).

[৪৫] Bhanitasri Kalita, "A Study on Occupational Change among the Kaibartas and Banias of Barpeta Town, Assam" (PhD Dissertation, University of Gauhati, 2015).

দীপন দাস তাঁর "পলিটিকস অব মবিলাইজেশন অ্যামাঙ্গ দ্য সিডিউল কাস্টস ইন আসাম" (২০১৫) নামক গবেষণাগ্রন্থে আসামের তফসিলি জাতিবর্ণগুলোর রাজনৈতিক জঙ্গমতা নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন।[৪৬] এই গবেষণায় তিনি তফসিলি সংগঠনগুলোর উৎপত্তি, বিবরণ, নির্বাচনে তফসিলিদের অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তফসিলি জাতিগুলোর দাবি আদায়ে তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক সংসদে বিভিন্ন সমস্যা উত্থাপনের বিষয়ে গঠনমূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে – যা বর্তমান গবেষণার সঙ্গে দূরবর্তী সম্পর্কে সম্পর্কিত।

প্রসেনজিৎ বিশ্বাস তাঁর "স্যোসাল মবিলিটি অ্যান্ড দ্য ডাইনামিকস অব কাস্ট; দি মাহিষ্যস অব সাউথ-ওয়েস্টার্ন বেঙ্গল (১৯০১-১৯৩১)" (২০১৬) নামক গবেষণাগ্রন্থে দেখিয়েছেন জাতিবর্ণ প্রথা কিভাবে সামাজিক জঙ্গমতাকে প্রভাবিত করে।[৪৭] তিনি আলোচনা করেছেন, কিভাবে জেলে কৈবর্তদের থেকে আলাদা হয়ে চাষি কৈবর্ত জাতিবর্ণ মাহিষ্য নাম গ্রহণ করে স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছে। এছাড়া তিনি পর্যালোচনা করেছেন কিভাবে মাহিষ্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান তাদেরকে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সহায়তা করেছে। যদিও ঔপনিবেশিক বৈষম্য নীতির প্রসঙ্গে মাহিষ্যদের মনোভাবের সাথে অন্যান্য জাতিবর্ণ যেমন নমঃশূদ্র বা রাজবংশীদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিলো। এ রকম নানা কারণে মাহিষ্যদের জঙ্গমতা ঘটেছে। কিন্তু জাতিবর্ণ প্রথার জন্য সমাজে মাহিষ্যদের পূর্বপরিচয় বদলের প্রচেষ্টা তাদের সামাজিক জঙ্গমতাকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। গবেষণাটির এমন বহু তথ্য চাষি কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে।

মোঃ চিরাজুল হক "এ স্যোসিও-কালচারাল স্টাডি অব দ্য কৈবর্ত কমিউনিটি অব নলবাড়ি ডিস্ট্রিক্ট উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু ফিস লোর অ্যান্ড ফিশিং প্রাকটিসেজ" (২০১৭) নামক গবেষণা গ্রন্থে লোকাচার এবং লোকসাহিত্যের মাধ্যমে আসামের নলবাড়ি জেলার জেলে কৈবর্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক এবং বিশেষ করে জেলেদের মৎস্যশিকারের ধরন নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন।[৪৮]

---

[৪৬] Deepon Das, "Politics of Mobilization among the Scheduled Castes in Assam" (PhD Dissertation, Dibrugarh University, Assam, 2015).

[৪৭] Prasenjit Biswas, "Social Mobility and the Dynamics of Caste; The Mahishyas of South-Western Bengal (1901-1931)" (PhD Dissertation, University of Calcutta, 2016).

[৪৮] Md Chirajul Haque, "A Socio-cultural Study of the Kaibartta Community of Nalbari District with Special Reference to Fish Lore And Fishing

কৈবর্ত ও মাহিষ্য সম্প্রদায়ের ইতিহাস বিষয়ক বেশ কিছু গ্রন্থ পাওয়া যায়। এর মধ্যে সত্যরঞ্জন বিশ্বাস রচিত 'মাহিষ্য আন্দোলনের ইতিহাস' (১৯৮৯) গ্রন্থটিতে মাহিষ্য জাতির সামাজিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো।[৪৯] ১৮৯০-৯১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট মাহিষ্য আন্দোলনের কারণ এবং আন্দোলনের ফলাফল স্বরূপ ১৯০১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে চাষি কৈবর্তের পরিবর্তে মাহিষ্য নাম অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯১১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে মাহিষ্য ও জালিক কৈবর্তের উৎপত্তির ভিন্নতা ও সামাজিক পার্থক্য সরকারিভাবে স্বীকৃত হয়। গ্রন্থটিতে পরিশিষ্টে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের নিকট 'মাহিষ্য' নামের আবেদনপত্র, কলকাতা সংস্কৃত কলেজ ব্যবস্থা চিঠি আদমশুমারি কমিটি ও বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির চিঠিপত্রের কপি সংযুক্ত রয়েছে যা প্রামাণ্য দলিল হিসেবে রয়েছে। তবে মাহিষ্য জাতি কিভাবে সংস্কৃতায়িত হয়েছে তা এখানে অনুপস্থিত। এছাড়া কৈবর্ত জাতিবর্ণ নিয়ে শিশুতোষ সামন্ত 'সমাধির অন্তরালে মহতের নিদ্রাভঙ্গ' (২০১৩) নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এখানে লেখক নিজেকে কৈবর্ত অপেক্ষা মাহিষ্য পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন।[৫০] তাঁর ধারণা, বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে শাস্ত্রগুলো ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য দেয়, যা পরস্পরবিরোধী।[৫১] তিনি কৈবর্ত ও মাহিষ্য বিষয়ক আলোচনাতে বহু হিন্দু শাস্ত্র ব্যবহার করেছেন এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন কৃষিজীবী কৈবর্তরা খাঁটি মাহিষ্য।

চাষি কৈবর্তদের নিয়ে গোপালচন্দ্র সরকার 'মাহিষ্য নামোদ্ধারের ইতিবৃত্ত' (১৯২৮) গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি মাহিষ্য আন্দোলনের প্রামাণ্য দলিল। গোপালচন্দ্র দেখিয়েছেন, বিভিন্ন সংহিতা, পুরাণ ও প্রাচীন বাংলা গ্রন্থসমূহের বহু যুক্তি প্রমাণ করে, চাষি কৈবর্ত ও মাহিষ্য একই জাতির ভিন্ন নাম। প্রাচীন কালে মৎস্যজীবীদের সংজ্ঞা ছিল ধীবর, কৈবর্ত নয়। প্রাচীন শাস্ত্রগুলোতে কৈবর্তের উৎপত্তি সংক্রান্ত তথ্যগুলো একটার সাথে আরেকটা খুব বেশি মেলে না। তিনি বলেছেন প্রাচীন এসব শাস্ত্রের প্রভাবে কৈবর্তের একটা অংশ নিজেদের মৎস্যজীবী বলে পরিচয় দেয়। এখান থেকে চাষি কৈবর্ত ও জেলে কৈবর্ত দুটি শ্রেণির উদ্ভব হয়। যাদের কর্ম ও পেশা পৃথক। ১৮৯০-৯১ এর আদমশুমারি রিপোর্টে চাষি কৈবর্তরা মাহিষ্য নামের জন্য আবেদন

Practices" (PhD Thesis, University of Science and Technology, Meghalaya, 2017).

[৪৯] সত্যরঞ্জন বিশ্বাস, *মাহিষ্য আন্দোলনের ইতিহাস*, পৃ. ৭।

[৫০] শিশুতোষ সামন্ত, *সমাধির অন্তরালে মহতের নিদ্রাভঙ্গ* (কলকাতাঃ উষা প্রেস, ২০১৩) পৃ. ৫।

[৫১] তদেব, পৃ. ১২।

করলেও তা বাস্তবায়িত হয় না। ১৯০১ সালে মাহিষ্য আন্দোলনের ফলাফলস্বরূপ 'মাহিষ্য' হালিয়া কৈবর্তের প্রতিশব্দ বলে লিখিত হয়।

এসব গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও গবেষণাপত্রে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়নের যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা এই ধরনের গবেষণা করতে গবেষককে উৎসাহিত করে।

৫. প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা ও লক্ষ্য

স্বাভাবিকভাবেই গবেষণাটিতে কিছু জিজ্ঞাসার উদয় হয়েছে। প্রথমত, কৈবর্ত জাতির স্বতন্ত্র কৌম পরিচয়ের কোনো দালিলিক সাক্ষ্য পাওয়া কি সম্ভব? ধ্রুপদি সাহিত্যে এরা কিভাবে চিত্রিত? এসব সাহিত্যে কি এমন কোনো ইঙ্গিত থাকতে পারে, যাতে মনে হয়, বিশেষ কোনো সংস্কৃতায়নের ফলে কৈবর্ত কৌমটি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি গ্রহণ করতে বাধ্য বা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো? ১৮৭২ সালে আদমশুমারি রিপোর্টে সর্বপ্রথম কৈবর্ত সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা নির্দেশিত হয়। তখন মাহিষ্য এবং কৈবর্তকে এক ধরে নিয়ে জনগণনা করা হয়েছিলো। জনগণনার প্রতিবেদনে এমন কোনো নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছিলো কি, যা থেকে কৈবর্তদের মধ্যকার বৃহত্তর একটি অংশ নিজেদের আলাদা পরিচয় দিতে উৎসাহিত হয়? নাকি সেটাও সংস্কৃতায়নের নতুন এক মাত্রা? কৈবর্ত জাতিবর্ণের মধ্যে আত্মমর্যাদার প্রশ্নটি ঠিক কখন থেকে শুরু হলো, সেটাও একটা জরুরি প্রশ্ন? কৈবর্ত জাতির আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের এই সংস্কৃতায়নের সম্পর্ক কতোটা? কৈবর্ত জাতির সামাজিক মর্যাদা লাভের এসব আন্দোলনের প্রেক্ষিত ও পরিণাম কী? প্রাসঙ্গিক আন্দোলনের ফলে মাহিষ্যদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হয়েছে, নাকি পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে, সে ব্যাপারে সংস্কৃতায়নের ব্যাখ্যা কী? এসব বহু প্রশ্নের জবাব গবেষণাটিতে অনুসন্ধান করা হয়েছে। এসব প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা থেকে গবেষণাটির সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করা যায়।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম জাতিবর্ণ কৈবর্তের সংস্কৃতায়নের ইতিহাস রচনা করা এই গবেষণার মূল লক্ষ্য। গবেষণার বিশেষ লক্ষ্যসমূহ হলো –

(ক) কৈবর্ত জাতিবর্ণের আত্মপরিচয় সন্ধান করা;

(খ) কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির আন্দোলন ও পরিণতি সম্পর্কে জানা;

(গ) কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কারের পরিবর্তনসমূহ অনুসন্ধান করা; এবং

(ঘ) কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামাজিক জঙ্গমতা পর্যবেক্ষণ করা।

৬. গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণার যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই গবেষণায় একাধিক গবেষণা-পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে ঐতিহাসিক পদ্ধতিই এই গবেষণার কেন্দ্রীয় পদ্ধতি। এখানে একদিকে যেমন ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে স্বীকৃত নানা ধরনের প্রাথমিক ও সহায়ক উপকরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমন কৈবর্ত জাতিবর্ণের সমকালীন বাস্তবতা ও সামাজিক জঙ্গমতা উদ্ধারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার, কেস স্টাডি, দলীয় আলোচনা, এমনকি, সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৫.১ গবেষণার এলাকা

বাংলাদেশের কৈবর্ত জনগোষ্ঠী এই গবেষণার মূল আলোচ্য। তবে ঐতিহ্যিক ও ভূরাজনৈতিক কারণে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে বসবাসরত কৈবর্ত জনগোষ্ঠীকেও এ গবেষণায় সহায়ক আলোচ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। যেসব এলাকায় কৈবর্ত জাতিবর্ণের লোক অধিক পরিমাণে বসবাস করে, সেসব এলাকা বর্তমান গবেষণার মূল এলাকা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। অর্থাৎ কৈবর্ত অধ্যুষিত বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহী, রংপুর, পাবনা, দিনাজপুর, সিলেট, খুলনা, যশোর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম এখানে মূল এলাকা হিসেবে গণ্য। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও জলপাইগুড়ি জেলা এই গবেষণার সহযোগী এলাকা হিসেবে পরিগণিত। একইভাবে আসামের কাছাড়, গোয়ালপাড়া, লখিমপুর, নওগাঁও, শিবসাগর জেলাও বর্তমান গবেষণায় সহযোগী এলাকা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৭.২ প্রাথমিক উপকরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ

কৈবর্ত জাতিবর্ণের আত্মপরিচয়, মর্যাদা ও সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ের অতীত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে এই গবেষণায় হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থাদি, ১৮৭২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত আদমশুমারি রিপোর্ট, গেজেটিয়ার এবং সরকারি প্রতিবেদন প্রভৃতি উৎস থেকে প্রাথমিক উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া মাহিষ্য আন্দোলন সংক্রান্ত তথ্যের জন্য কৈবর্ত নেতৃবৃন্দের লিখিত

প্রচারপত্র, ব্যবস্থাপত্র, বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, যেমন – পেয়ারি মোহন দাসের *The Mahishyas*, প্রকাশচন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'বৃহৎ মাহিষ্যকারিকা', শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধির 'জাতিতত্ত্ব', ধর্মানন্দ মহাভারতীর 'মাহিষ্য-সিদ্ধান্ত', গোপালচন্দ্র সরকারের 'মাহিষ্য নামোদ্ধারের ইতিবৃত্ত', সত্যরঞ্জন বিশ্বাসের 'মাহিষ্য আন্দোলনের ইতিহাস' প্রভৃতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

নির্ধারিত ও চিহ্নিত এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কৈবর্ত ও জাতিবর্ণের নেতৃস্থানীয় বয়স্ক ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ পুরোহিত, জাতিবর্ণ বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ শতাধিক ব্যক্তির নিকট থেকে কৈবর্তদের পরিচয়, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পেশা, শিক্ষা, সংস্কার, স্থানান্তর গমন, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। শহর ও গ্রামের সামাজিক জঙ্গমতায় কোনো পার্থক্য রয়েছে কিনা এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পেশা ও ভিন্ন ভিন্ন বয়সের কৈবর্ত ব্যক্তি এবং তাদের ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নিয়ে আলাদাভাবে ৭টি দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, সিলেট বিভাগের সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রভৃতি জেলা থেকে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। যেসব জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চট্টগ্রাম শহরের ডিসি হিল আবাসিক এলাকা এবং উত্তর পতেঙ্গার জেলেপল্লী। উত্তর পতেঙ্গার জেলেপল্লীর বিভিন্ন বয়সী নারী-পুরুষ সমন্বয়ে গঠিত জেলে কৈবর্তের একটি দলের নিকট থেকে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।[৫২] এ সময়ে জেলে কৈবর্তদের পুরোহিতদের নিকট থেকেও পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া গেছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার হরিণবেড় গ্রামে জেলে কৈবর্তদের নিকট থেকে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে প্রচুর তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।[৫৩] একই এলাকা থেকে কেস স্টাডির মাধ্যমেও

---

[৫২] গবেষক কর্তৃক আয়োজিত দলীয় আলোচনা (১)। অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখঃ ১৩.০৮.২০১৯, স্থানঃ জেলেপল্লী, চট্টগ্রাম। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকৃত ব্যক্তিদের নামঃ ১. রবিশংকর জলদাস (৫১), ২. সুনীতা জলদাস (৫০), ৩. তারাশংকর জলদাস (৪৬), ৪. কাঞ্চনবালা দাস (৪০),৫. সন্তোষ কুমার দাস (৪৪), ৬. হরিপদ দাস (৬০), ৭. সুশান্ত দাস (৭০)।

[৫৩] গবেষক কর্তৃক আয়োজিত দলীয় আলোচনা (২)। তারিখঃ ২৮.০৫.২০১৯, স্থানঃ হরিণবেড় গ্রাম, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকৃত ব্যক্তিদের নামঃ ১. রমাকান্ত দাস (১০১), ২. হেমন্ত চন্দ্র দাস (৭০), ৩. গিরিশ চন্দ্র দাস (৭২), ৪. হীরালাল দাস (৭৫), ৫. নিত্য দাস (৪২), ৬. ছন্দ কুমার দাস

তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, রংপুর, লালমনিরহাট প্রভৃতি জেলার কৈবর্ত ও মাহিষ্য জাতিবর্ণের লোকেরাও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রচুর তথ্য সরবরাহ করেছেন।[৫৪]

সিলেট সদরের হালদারপাড়ায় জেলে কৈবর্তদের নিকট থেকে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে বহু তথ্য পাওয়া গেছে।[৫৫] এই এলাকার পাটনি কৈবর্ত জাতিবর্ণের ব্যক্তিদের কাছ থেকেও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া সিলেট শহরের সুরমা নদীর কাছে কিন ব্রীজ আবাসিক এলাকা, মণিপুরি রাজবাড়ি এলাকা এবং জেলে পাড়া থেকে কৈবর্ত জাতিবর্ণের বহু সদস্যের সঙ্গে ব্যক্তিপর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

নওগাঁ জেলার আত্রাই, রানীনগর, বদলগাছি, সাপাহার, মান্দা উপজেলা থেকে মাহিষ্য, গুড়ি কৈবর্ত এবং মালো কৈবর্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে কয়েকটি দলীয় আলোচনা এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।[৫৬] এছাড়া নাটোরের সিংড়া উপজেলায় মালো কৈবর্ত জাতিবর্ণের কাছ থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।[৫৭]

---

(৩০), ৭. নগেন্দ্র চন্দ্র দাস (৭৫), ৮. উত্তম কুমার দাস (৪৮), ৯. রতন কুমার দাস (৩৫), ১০. অনিমেষ চন্দ্র দাস (৩৭)।

[৫৪] বিভিন্ন এলাকা থেকে যাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ১. স্বপন রায় (৫০), শিক্ষক, বরিশাল সদর, বরিশাল; ২. সমীর চন্দ্র রায় (৫৯), অবসরপ্রাপ্ত টিএনটি কর্মকর্তা, লেবুখালী, পটুয়াখালী; ৩. রণবীর চন্দ্র নায়েক (৪৪), উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মুন্সীপাড়া, রংপুর; ৪. পরেশ দাস (৬০), মৎস্যব্যবসায়ী, তালুক হরিদাস, আদিতমারী, লালমনিরহাট।

[৫৫] গবেষক কর্তৃক আয়োজিত দলীয় আলোচনা (৩)। অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ: ২৩.০৫.২০১৯, স্থান: হালদার পাড়া, সিলেট। দলীয় আলোচনায় যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের নাম: ১. পরেশ দাস (৭৭), ২. প্রেমতোষ দাস (৬২), ৩. রবীন্দ্র কুমার দাস (৭০), ৪. চাঁনসোনা দাস (৬০), ৫. শ্রীকান্ত দাস (৬৫), ৬. শিরীষ চন্দ্র দাস (৫৫)।

[৫৬] নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার সাহেবগঞ্জে গবেষক কর্তৃক আয়োজিত দলীয় আলোচনা (৪)। তারিখ: ২৩.০৭.২০১৯। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকৃত ব্যক্তিদের নাম: ১. শিপ্রা সরকার (৩৭), ২. বিমল চন্দ্র সরকার (৬০), ৩. ফণীন্দ্র নাথ সরকার (৫৭), ৪. মিনা রানী মণ্ডল (৭২), ৫. বেবী রানী রায় (৫৯), ৬. অর্চনা রানী মণ্ডল (৩৮), ৭. গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস (৫০); আত্রাই উপজেলার আমরুল কসবা গ্রামে গবেষক কর্তৃক আয়োজিত দলীয় আলোচনা (৫)। তারিখ: ২৪.০৭.২০১৯। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকৃত ব্যক্তিদের নাম: ১. সুবালা দাস (৮০), ২. নন্দন কুমার দাস (৬৬), ৩. লক্ষ্মী রানী দাস (৫৫), ৪. আনন্দ কুমার দাস (৬০), ৫. বিভা রানী দাস (৫০), ৬. নিত্য দাস (৩৫), ৭. মিনু রানী দাস (২৮), ৮. নমিতা রানী দাস (৩১), ৯. সুশান্ত কুমার প্রামাণিক (৪৫), ১০. রেখা রানী প্রামাণিক (৩২)।

[৫৭] নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলা সদরে গবেষক কর্তৃক আয়োজিত দলীয় আলোচনা (৬)। তারিখ: ২৩.০৭.২০১৯। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকৃত ব্যক্তিদের নাম: ১. রণজিৎ সরকার (৬২), বিমল দাস (৫৫), ৩. দিনেশ চন্দ্র প্রামাণিক (৬০), ৪. নরেশ সরকার (৬১), ৫. সুনীল প্রামাণিক (৫৪), ৬. প্রশান্ত সরকার (৫২),

ভূমিকা

কৈবর্ত ও মাহিষ্য নামানুসারে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বেশকিছু গ্রামের নাম রয়েছে। গবেষণার স্বার্থে বাংলাদেশে এরকম নামের কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলার কৈবর্তগ্রাম এবং কৈবর্তখণ্ড গ্রামের কথা। সাপাহারে কৈবর্ত রাজা দিব্বকের নামানুসারে একটি বৃহৎ দিঘি রয়েছে, এর নাম দিবর দিঘি। এই দিবর দিঘি এখনও বাংলায় কৈবর্ত রাজ্যশাসনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত এই ঐতিহাসিক দিঘিও ভ্রমণ করা হয়েছে।

কৈবর্ত জাতিবর্ণের একটি শাখা তুঁতে কৈবর্তের খোঁজে গবেষককে রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, যশোর, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলা ভ্রমণ করতে হয়। অভিন্ন লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের অধীনে সারা বাংলাদেশের রেশম চাষিদের তালিকা সংগ্রহ করে যোগাযোগ করতে হয়েছে। উক্ত তালিকার সিংহভাগ মুসলমান রেশম চাষি। কিছু আদিবাসী রেশম চাষিও পাওয়া যায়। হিন্দু রেশমচাষি যাদের পাওয়া গেছে তারা বেশিরভাগ শৌখিন চাষি, বংশানুক্রমিক তুঁতে কৈবর্ত নয়। বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের রেশম চাষি ও স্থানীয়দের মতে, তুঁতে কৈবর্তরা বাংলাদেশ থেকে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে, বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় অভিবাসিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আর একটি বিষয় ধারণা করা যায়, অতীতের তুঁতে কৈবর্তদের মধ্যে যারা স্থানান্তরিত হয়নি তারা পেশা ও পদবি পরিবর্তনের মাধ্যমে অন্য জাতিবর্ণের সঙ্গে মিশে গেছে। উদাহরণ হিসেবে রাজশাহী শহরের সপুরা এলাকার রেশম শিল্পের সাথে জড়িত কয়েকজন হিন্দু শ্রমিকের প্রসঙ্গ তোলা যায়। এদের পূর্বপুরুষদের পদবি দেখে মনে হয় এরা কৈবর্ত জাতিবর্ণের। কিন্তু বর্তমানে তারা নিজেদেরকে কায়স্থ পরিচয় দেয়। অনেকে মাহিষ্য পরিচয়ও দেয়। মোটামুটি তুঁতে কৈবর্ত পরিচয় তারা পুরোপুরি বিস্মৃত হয়েছে।

গবেষণার প্রাথমিক উপকরণ সংগ্রহের লক্ষ্যে গবেষককে পশ্চিমবঙ্গের কৈবর্ত অধ্যুষিত অঞ্চল যেমন, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় গিয়ে কৈবর্ত জাতিবর্ণ সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলা সদর এবং জলঙ্গী থানার বিভিন্ন গ্রামে বসবাসকৃত কৈবর্ত জাতিবর্ণের ব্যক্তিদের নিকট থেকে সাক্ষাৎকার, কেস স্টাডি এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গবেষণার অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

---

৭. পরেশ চন্দ্র প্রামাণিক (৫৬), ৮. পরিতোষ প্রামাণিক (৫০), ৯. নারায়ণ চন্দ্র দাস (৪৮), ১০. প্রভাস চন্দ্র প্রামাণিক (৬২)।

১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি কলকাতার ফুলবাগানে অবস্থিত। এই সমিতির সম্পাদক ও সদস্যদের নিকট থেকে সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে মাহিষ্য আন্দোলন ও মাহিষ্য সংস্কার সংক্রান্ত বহু তথ্য পাওয়া গিয়েছে, যা গবেষণাটিকে তথ্যসমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া কলকাতা শহরের অনেক স্থান থেকে চাষি কৈবর্ত তথা মাহিষ্য জাতিবর্ণের ব্যক্তিদের নিকট থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য বোলপুর শান্তিনিকেতন ভ্রমণ করা হয়েছে।

মেদিনীপুরের দীঘা থেকেও প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকে প্রাচীন তম্রলিপ্ত রাজবাড়ি পরিদর্শন করা হয়েছে। কৈবর্তরা এই রাজবংশটিকে নিজেদের ঐতিহ্য ও গর্বের প্রতীক বলে মনে করে। একসময়ে পুরো মেদিনীপুর অঞ্চল এই রাজপরিবারের সদস্যরা পরিচালনা করতেন। বর্তমানে তাদের জমিদারি বিলুপ্ত। এই রাজপরিবারের সর্বশেষ বংশধরের সাক্ষাৎকারের গ্রহণের মধ্য দিয়ে কৈবর্ত জাতিবর্ণের পূর্বের অনেক ইতিহাস উন্মোচিত হয়েছে, যা গবেষণায় কাজে লেগেছে।

৫.৩ সহায়ক উপকরণ

প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও সমকালীন বাংলা সাহিত্য, বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, বর্তমান গবেষণা সম্পৃক্ত বিভিন্ন বইপত্র, পুস্তিকা, জার্নাল, সাময়িকী, স্মারকপত্র, পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, কৈবর্ত জাতিবর্ণ সম্পর্কিত উপন্যাসসমূহ, কৈবর্ত ও মাহিষ্য জাতিবর্ণের উপরে লিখিত গ্রন্থ, বিভিন্ন সময়ের পত্রপত্রিকা, ইতিহাস হেরিটেজ ও আর্কাইভ, বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, এবং ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত লিখিত ও মুদ্রিত তথ্যাদি, প্রভৃতি সহায়ক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫.৪ তথ্য বিশ্লেষণ

এই গবেষণায় উভয় উৎস থেকে লব্ধ তথ্যাদি থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য প্রধানত পাঠ-বিশ্লেষণ কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক ও সহায়ক উপকরণসমূহ থেকে ইনডেক্স কার্ড-এর মাধ্যমে তথ্য সংক্ষেপণ ও শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। গবেষণার লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে

কার্যসমূহ বিষয়ভিত্তিক, কালানুক্রমিক প্রভৃতি ক্রমে সাজিয়ে তুলনামূলক ও পারস্পরিক পর্যালোচনা করে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ক্রস-চেকিং করা হয়েছে।

৫.৫ গবেষণা-শৈলী

সহজ ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গি বিবেচনায় প্রমিত বাংলা ভাষায় অভিসন্দর্ভটি রচনা করা হলো। অভিসন্দর্ভটিতে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য নির্দেশের জন্য শিকাগো শৈলী অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক টীকা ও তথ্যনির্দেশ সংখ্যানুক্রমে পাদটীকায় সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়া এই গবেষণার মাধ্যমে কোনো জাতিবর্ণের কোনো সদস্য যাতে হেয় প্রতিপন্ন না হন, সেজন্য অভিসন্দর্ভের ভাষা-ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

৫.৬ গবেষণার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা

কৈবর্ত সম্প্রদায়ের সংস্কৃতায়নের ইতিহাস উদ্ধার করা এ গবেষণার মূল এলাকা। তবে প্রসঙ্গক্রমে সমকালীন অন্যান্য জাতিবর্ণ সম্পর্কেও কমবেশি আলোচনা করতে হয়েছে। সেসব আলোচনায় দেখা গেছে নমঃশূদ্র, রাজবংশী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিবর্ণের সঙ্গে কৈবর্ত জাতিবর্ণের বিকাশের ইতিহাস মোটামুটি সমান্তরাল। ঐসব জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়নের ইতিহাসও তাই কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়নের ইতিহাসের অনুরূপ হওয়া সম্ভব।

এ কাজের সবচেয়ে বড়ো সীমাবদ্ধতা হলো উপকরণের অভাব। প্রাচীন কালের গ্রন্থাদিতে কৈবর্ত সম্পর্কে যেসব উল্লেখ পাওয়া যায় তার অধিকাংশই কল্পনানির্ভর। সরকারি দলিলপত্র ও ঐতিহাসিকদের গ্রন্থ থেকে সংস্কৃতায়নের সূত্র ধরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে। এ জনগোষ্ঠীর প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্যও অপ্রতুল। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আসাম, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডে অসংখ্য কৈবর্ত বাস করে। এর মধ্যে আসাম, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডে সরোজমিনে গিয়ে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি। এছাড়া স্থানান্তর গমনের কারণে পৃথিবীর অনেক দেশেই কৈবর্ত জাতিবর্ণের লোকজন বসবাস করে। তাদের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি। এটাও এই গবেষণার একটি বড়ো সীমাবদ্ধতা। কৈবর্ত পরিচয়ে সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পায় এই আশঙ্কায় অনেক কৈবর্ত নিজেদের

পরিচয় বদলে ফেলেছেন বলে তাদের কাছ থেকেও সাক্ষ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের শেষ পর্যায়ে বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি এলাকার ক্ষেত্রসমীক্ষা অসম্পূর্ণ রাখতে বাধ্য হয়েছি। তবে এসব অসম্পূর্ণতা মূল ধারণায় বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলবে, এমন মনে হয় না।

৭. উপসংহার

কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া ও সামগ্রিক পরিবর্তনের ইতিহাস এই অভিসন্দর্ভে আলোচিত হয়েছে। অভিসন্দর্ভটিকে মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার জ্ঞান-অবকাশ, লক্ষ্য, পদ্ধতি এবং গবেষণার বিষয় ও কাঠামো সম্পর্কে ধারণা দান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কৈবর্ত জাতিবর্ণের আত্মপরিচয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কৈবর্ত জাতিবর্ণের আত্মপরিচয় অনুসন্ধান করা হয়েছে। প্রথমত, প্রাচীন কালের কৈবর্ত এবং বর্তমান বাংলাভাষী অঞ্চলের কৈবর্ত অভিন্ন কিনা। দ্বিতীয়ত, যাদের কৈবর্ত বলা হচ্ছে তারা কি পরিচয় ধারণ করছে বা করতে অস্বীকার করছে তা আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয়ত, বর্তমানে যারা কৈবর্ত হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে, তাদের আত্মপরিচয় খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। এ বিষয়গুলো অনুসন্ধান করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের হিন্দু শাস্ত্র এবং ঐতিহাসিক উৎস থেকে। এছাড়া ব্রিটিশ শাসন আমলের বেশ কয়েকটি আদমশুমারি রিপোর্ট, প্রাসঙ্গিক নথিপত্র ও গ্রন্থ থেকে। এসব উৎস বিশ্লেষণ করে কৈবর্ত জাতিবর্ণের আত্মপরিচয় আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়ন: মর্যাদা প্রসঙ্গ। কৈবর্ত জাতিবর্ণের মধ্যে আত্মমর্যাদার প্রশ্নটি কখন থেকে শুরু হয়েছে তা সন্ধান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অন্য কোনো জাতিবর্ণের দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়েছিলো কিনা এবং কৈবর্ত জাতিবর্ণের আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সঙ্গে সংস্কৃতায়নের সম্পর্ক নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামাজিক মর্যাদা লাভের এসব আন্দোলনের প্রেক্ষিত ও পরিণাম অনুসন্ধান করা হয়েছে। চাষি কৈবর্তদের পাশাপাশি জেলে কৈবর্তদের সামাজিক মর্যাদা ও সংস্কৃতায়নের মিল বা পার্থক্য অনুসন্ধান করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়ে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়ন: সংস্কার প্রসঙ্গ নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। হিন্দু ধর্ম সংস্কারের উৎস বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র। কোন কোন বর্ণ কী কী উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করবে

শাস্ত্রে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। বর্ণগত পার্থক্যের সাথে সাথে তাদের সংস্কারের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কৈবর্ত জাতিবর্ণের ক্ষেত্রে শাস্ত্রে বর্ণিত সংস্কারের সাথে বর্তমানে প্রচলিত সংস্কারের কতটুকু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। কৈবর্ত প্রচলিত এবং পরিবর্তিত সংস্কার অনুসন্ধানের জন্য বেদ, মনুসংহিতাসহ বিভিন্ন সংহিতা এবং প্রয়োজনীয় ধর্মশাস্ত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি সমকালীন সংস্কার সম্পর্কে জানার জন্য মাঠপর্যায়ে কৈবর্ত জাতিবর্ণের বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়ন ও জঙ্গমতার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে কৈবর্ত জাতিবর্ণের অবস্থান, কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়নের সাথে জাতিবর্ণটির জনমিতি ও জঙ্গমতার সম্পর্ক, শিক্ষা ও অর্থনীতির সাথে কৈবর্তদের পরিচয়ের প্রত্যাবর্তনের যোগসূত্র প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে। বিশেষ করে চাষি কৈবর্ত তথা মাহিষ্য এবং জেলে কৈবর্তের মধ্যে আত্মপরিচয়গত, পেশাগত, স্থানান্তরগত, ধর্মবিশ্বাসগত জঙ্গমতার প্রকৃতি নির্ণয় করা এ অধ্যায়ের আলোচ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়টি হলো উপসংহার। এখানে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহের বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তসমূহ একত্র করে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং গবেষণার ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে। কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়ন যেভাবে হয়েছে, অন্যান্য বাঙালি জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়াও এর অনুরূপ হওয়া সম্ভব। প্রসঙ্গত অভিন্ন সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন নমঃশূদ্র, রাজবংশী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিবর্ণের কথা স্মরণীয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কৈবর্ত জাতিবর্ণের আত্মপরিচয়

১. ভূমিকা

কৈবর্ত অভিধাটি অত্যন্ত প্রাচীন। প্রাচীন কালের কৈবর্ত এবং বর্তমান বাংলাভাষী অঞ্চলের কৈবর্ত অভিন্ন কিনা, সেটা যেমন একটা প্রশ্ন; আবার যাদের কৈবর্ত বলা হচ্ছে তারা কিভাবে এই পরিচয় ধারণ করে আছে অথবা ধারণ করতে অস্বীকার করছে, সেটাও একটা প্রশ্ন। বর্তমানে যারা কৈবর্ত হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে, কিভাবে তাদের আত্মপরিচয় গঠিত হয়েছে, সেটি এই অধ্যায়ের আলোচ্য।

কৈবর্ত জাতিবর্ণের অতীত সম্পর্কে অনুমান করা যায় বিভিন্ন ধরনের হিন্দু শাস্ত্র থেকে এবং নিকট অতীত সম্পর্কে জানা যায় ব্রিটিশ শাসন আমলের বেশ কয়েকটি আদমশুমারি রিপোর্ট ও গ্রন্থ থেকে। এইসব শাস্ত্রগ্রন্থ ও শুমারি রিপোর্টে বিভিন্ন জাতিবর্ণকে বর্ণনার ক্ষেত্রে অস্পৃশ্য, দলিত, নিম্নশ্রেণি, উপজাতি প্রভৃতি অভিধা ব্যবহার করা হয়েছে, যা কখনও কখনও অসম্মানজনক এবং অনেক সময়ে অমানবিক মানব-সম্পর্ককে মনে করিয়ে দেয়।[১] এগুলো থেকে কৈবর্ত জাতিবর্ণের অতীত অবস্থা সম্পূর্ণভাবে বোঝা না গেলেও, এর মধ্য থেকে এমন কিছু উপাদান পাওয়া যায়, যার উপর ভিত্তি করে কৈবর্ত জাতিবর্ণের আত্মপরিচয়ের বহু দিক উন্মোচন করা সম্ভব। বিভিন্ন সহায়ক ও মৌখিক উপকরণের সাহায্যে কৈবর্ত জাতিবর্ণের আত্মপরিচয় ও পরম্পরা সম্পর্কে একাধিক মত গড়ে উঠেছে, সেগুলোও বিবেচ্য।

২. হিন্দুশাস্ত্রে কৈবর্ত

হিন্দু শাস্ত্রগুলোতে বিভিন্ন জাতিবর্ণের উৎপত্তি সংক্রান্ত যেসব তথ্য রয়েছে তা কখনো কখনো অস্পষ্ট এবং অনেক সময়ে যুক্তির সঙ্গে মেলে না। এসব তথ্য থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো ধারণা তৈরি

---

[১] Arundhuti Roy, “The Doctor and the Saint,” in B.R. Ambedkar, *Annihilation of Caste* (New Delhi: Navayana Publishing, 2014), p. 20.

করা কঠিন। তা সত্ত্বেও কৈবর্ত জাতিবর্ণের উৎস আলোচনায় এগুলোর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কেননা আর কোনো উৎস থেকে কৈবর্ত জাতিবর্ণ সম্পর্কিত এতটা প্রাচীন তথ্য পাওয়া যায় না।

হিন্দু শাস্ত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ হলো বেদ। বেদের চারটি ভাগ রয়েছে, যথাঃ ঋক, সাম, যজু এবং অথর্ব। ঋগ্বেদের কোথাও 'কৈবর্ত' শব্দের উল্লেখ নেই। তবে ঋগ্বেদের দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ মণ্ডলে 'কেবট' নামে একটি শব্দ পাওয়া যায় (সূক্ত ৫৪)।[২] 'কেবট' শব্দের অর্থ জলাশয়, গর্ত বা কূপ। ধারণা করা হয়, কেবট নামে একটি প্রাচীন জাতি ছিলো এবং জলে জীবিকা অন্বেষণের জন্য যারা যেত, তাদেরই কেবট বলা হতো।[৩] এরাই পরবর্তীকালে কৈবর্ত নামে পরিচিতি পেয়েছে বলে অনেকের ধারণা।[৪]

যজুর্বেদ সংহিতার অপর নাম বাজসনেয়ী সংহিতা। এই সংহিতা শুক্ল যজুর্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ এই দুই ভাগে বিভক্ত। কৃষ্ণ যজুর্বেদ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (অধ্যায় ৩০, শ্লোক ১৬) সর্বপ্রথম 'কৈবর্ত' শব্দটির প্রয়োগ পাওয়া যায়।[৫] এখানে বলা হয়েছে কৈবর্ত জাতিবর্ণের পেশা ছিলো জলাশয় কেন্দ্রিক। এই সংহিতায় জলাশয় কেন্দ্রিক আরও কয়েকটি জাতির উল্লেখ দেখা যায় যথা; ধীবর, মৎস্যজীবী, মার্গার প্রভৃতি।[৬]

যজুর্বেদে আরও উল্লেখ আছে পুষ্করিণী (পুকুর), পল্বল (জলাশয়), তড়াগ (দিঘি) প্রভৃতির উপরে কয়েকটি জাতি নির্ভরশীল ছিলো। এদের একটি সাধারণ নাম ছিলো 'পুঞ্জিষ্ঠ' বা 'পৌঞ্জিষ্ঠ'।[৭]

---

[২] "মাকির্নেশন্মাকীং রিষন্নাকীং সংশারি কেবটে," অনুবাদ: হে পূষা! আমাদের গোধন যেন নষ্ট না হয়। এ যেন ব্যাঘ্রাদি দ্বারা নিহত না হয়। কূপপাত দ্বারা যেন বিনষ্ট না হয়। *ঋগ্বেদ সংহিতা*, রমেশ চন্দ্র দত্ত অনূদিত (কলকাতাঃ হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৬), পৃ. ৬৮।

[৩] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, "কৈবর্ত জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস," সমর পাল সংকলিত, *কৈবর্ত জাগরণ* (ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১২), পৃ. ২৯।

[৪] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, "কেবট-জাতি," সমর পাল সংকলিত, *কৈবর্ত জাগরণ*, পৃ. ৩৫।

[৫] "সরোভ্যো ধৈবরমুপস্থাবরাভ্যো দাশং বৈশন্তাভ্যো বৈন্দং নডবলাভ্যঃ শৌষ্কলং পারায় মার্গারমবারায় কৈবর্তং তীর্থেভ্য আন্দং বিষমেভ্য মৈনালং স্বনেভ্যঃ পর্ণকং গুহাভ্যঃ কিরাতং সানুভ্য জম্ভকং পর্বতেভ্যঃ কিম্পূরুষম।" অনুবাদ: সরোবরের উদ্দেশ্যে ধীবরকে, উপস্থাবরার উদ্দেশ্যে দাতাকে, বৈশন্তার উদ্দেশ্যে নিষাদপুত্রকে, নডবালের উদ্দেশ্যে মৎস্যজীবীকে, পারের উদ্দেশ্যে মার্গারকে, অবারের উদ্দেশ্যে কৈবর্তকে, তীর্থের উদ্দেশ্যে বন্ধনকর্তাকে, বিষমের উদ্দেশ্যে মৎস্যজীবীর পুত্রকে, স্বনের উদ্দেশ্যে ভিল্লকে, গুহার উদ্দেশ্যে কিরাতকে, সানুর উদ্দেশ্যে হিংসককে এবং পর্বতের উদ্দেশ্যে কিংপুরুষদের নিযুক্ত করা হয়েছে। *যজুর্বেদ সংহিতা*, বিজনবিহারী গোস্বামী অনূদিত (কলকাতাঃ হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৭), পৃ. ২২০।

[৬] তদেব।

[৭] তদেব, পৃ. ২১৮।

এভাবে যজুর্বেদ অনুযায়ী জলাশয় কেন্দ্রিক জাতিগুলোর মধ্যে ধৈবর, দাস, শৌষ্কল, কৈবর্ত, মার্গার, আন্দ, মৈনাল ও পর্ণক প্রভৃতি গোষ্ঠীর নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে যারা সরোবরের দুই দিকে দল বেঁধে মাছ ধরতো, তাদের নাম ছিলো 'ধৈবর'; জলাশয়ে বড়শি দিয়ে যারা মাছ ধরতো, তাদের 'দাশ' বলা হতো; গাছের নিচের জলে বিন্দুজাল দিয়ে মাছ ধরে যারা জীবিকা নির্বাহ করতো, তারা 'বৈন্দ'; শুষ্কল নামক বড়শি যাদের জীবিকার উপায়, তাঁরা 'শৌষ্কল' বলে পরিচিত হতো; দিঘির একদিক থেকে মাছ টেনে নিয়ে অপর পাড়ে জড় করে যারা মাছ ধরতো, তারা 'কৈবর্ত' নামে অভিহিত হতো; জলের ভেতর হাত দিয়ে যাদের মাছ ধরা কাজ, তারা 'মার্গার'; ঘাটে শঙ্কু বেঁধে যারা মাছ ধরতো, তাদের নাম 'আন্দ'; জাল নিয়ে যেখানে-সেখানে মাছ ধরা যাদের জীবিকা, তাদের বলা হতো 'মৈনাল', বিষাক্ত পাতা জলের উপর ফেলে যারা মাছ ধরতো, তাদের নাম ছিলো 'পর্ণক'।

বৈদিক শাস্ত্রে জাতিবর্ণগুলোর বর্ণনায় স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, উঁচু-নিচু ধারণা পাওয়া যায় না। এ বিষয়টা থেকে ধারণা করা যায়, বৈদিক যুগে বিভিন্ন জাতিবর্ণের মধ্যে বর্তমানের মতো শ্রেণিভেদ ছিলো না। ঐতিহাসিকদের মতে, সপ্তদশ শতকে বল্লাল সেনের আমলে হিন্দু জাতিগুলোর মধ্যে বর্ণভেদ, শ্রেণিভেদ, উচুঁতা-নিচুতার ধারণা প্রবেশ করে এবং চর্চিত হতে থাকে। সেন আমলেই অধিকাংশ প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ পুনরায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণে কৈবর্তদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু রামায়ণের বাংলা অনুবাদে কখনো কখনো কৈবর্তদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন রাজশেখর বসুর 'বাল্মীকি-রামায়ণে' (অযোধ্যাকাণ্ড, ৮৪:৮) দেখা যায় যে, কৈবর্ত দলপতি বলবান দাশের পাঁচশত নৌকা ছিলো। অযোধ্যার রাজা দশরথের দ্বিতীয় পুত্র ভরত বনবাসী বড়ো ভাই রামকে পিতার মৃত্যুসংবাদ দিতে বনে যান। সে সময়ে রাম রাজা গুহকের আশ্রয়ে ছিলেন। গুহক ভেবেছিলেন ভরত রামকে হত্যা করার জন্য বনে এসেছেন। ভরত বনের ভেতর গঙ্গা নদীর তীরে পৌঁছালে রাজা গুহক যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে পাঁচশত নৌকায় কৈবর্ত যুবকদের সতর্ক থাকতে বলেছিলেন।[৮]

[৮] রাজশেখর বসু, *বাল্মীকি-রামায়ণ* (কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৯৪৭), পৃ. ১১২। রাজশেখর বসু তাঁর অনুবাদে নিষাদরাজের নাম গুহক লিখেছেন। কিন্তু মূল রামায়ণে নিষাদরাজের নাম গুহ। রাজশেখর তাঁর অনুবাদে কৈবর্ত যুবকদের উল্লেখ করেছেন। এটা ঠিক নয়। বাস্তবে রামায়ণের কাহিনিতে যুদ্ধসাজে সজ্জিত শত শত যুবকের উল্লেখ আছে।

কিন্তু সংস্কৃত রামায়ণে (অযোধ্যাকাণ্ড ৪:৯১:১০) দেখা যায়, নিষাদরাজ গুহ পাঁচশত নৌকার প্রত্যেক নৌকায় 'উদ্যতশরাসনধারী' সুসজ্জিত শত শত যুবা পুরুষকে অবস্থান করার আদেশ করেছিলেন।[৯]

সংস্কৃত ভাষায় রচিত মূল মহাভারতেও কৈবর্ত বা ধীবর জাতিবর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে আদিপর্বে সত্যবতী পরাশর মুনির কাছে নিজেকে নৌজীবী দাশের কন্যা হিসেবে পরিচয় দিতে দেখা যায়।[১০]

মহাভারতের বাংলা অনুবাদে নৌজীবীদের অনেকে কৈবর্ত আবার অনেকে ধীবর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কাশীরাম অনূদিত মহাভারতে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে কৈবর্ত সন্তান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী কৈবর্তকন্যা মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর গর্ভে এবং পরাশর মুনির ঔরসে তাঁর জন্ম হয়।[১১] অনূদিত মহাভারতে কৈবর্ত রাজারও উল্লেখ আছে। কিন্তু সংস্কৃত মহাভারতে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সরাসরি কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। সেখানে শুধু 'দাশ'-রাজার উল্লেখ রয়েছে।[১২]

কৈবর্ত বা কৈবর্তক শব্দটিকে কাণ্ডারী বা ভবকাণ্ডারী অর্থেও ব্যবহার করা হয়। যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার গীতাধ্যান নামক অংশে কল্পনা করা হয়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ রূপ নদীতে কেশব অর্থাৎ কৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষে কৈবর্তকের অর্থাৎ কাণ্ডারীর তথা ভবকাণ্ডারীর কাজ করেছেন।[১৩]

---

[৯] "নৌশতানাঞ্চ পঞ্চানামেকৈকস্যাং শতং শতম্। সন্নদ্ধানাং সদা যূনাং তিষ্ঠন্ত্বদ্যতধন্বিনাম্॥" রামায়ণম্, অযোধ্যাকাণ্ড ৪:৯১:১০। [অমরেশ্বর ঠাকুর অনূদিত, *রামায়ণম্*, ৪র্থ খণ্ড (কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৩১), পৃ. ১৬৩৭।] প্রাবন্ধিক সমর পাল তাঁর "কৈবর্ত জাতির উৎসসন্ধান" প্রবন্ধে নিষাদরাজ গুহকে কৈবর্তরাজ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, সমর পাল সংকলিত, *কৈবর্ত জাগরণ* (ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১২), পৃ. ১২৪। একই গ্রন্থে বিভিন্ন প্রাবন্ধিক রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ৮৪:৮ অংশে কৈবর্তদের উল্লেখ রয়েছে বলে দাবি করেছেন, যার সঙ্গে উল্লিখিত বিশ্ববাণী প্রকাশিত সংস্কৃত রামায়ণের মিল নেই।

[১০] "অনপত্যস্য দাশস্য সুতা তৎপ্রিয়কাম্যয়া। সহস্রজনসম্পন্না নৌর্ময়া বাহ্যতে দ্বিজ ॥ *মহাভারত*, আদিপর্ব ৫৮: ৮৭। [হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ অনূদিত, *মহাভারতম্*, ২য় খণ্ড (কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৩৮), পৃ. ৬৮৬]।

[১১] *মহাভারত*, কাশীরাম দাস অনূদিত (কলকাতা: অক্ষয় লাইব্রেরি, ১৯৮৬), পৃ. ১০০।

[১২] পূর্বের ১০ নং টীকা দ্রষ্টব্য। তবে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তাঁর একাধিক প্রবন্ধে সংস্কৃত মহাভারতের একাধিক শ্লোক উদ্ধৃত করে জানান যে, মহাভারতে কৈবর্ত জাতিবর্ণের উল্লেখ রয়েছে। যেমন "শ্রমেণ মহতা যুক্তাঃ কৈবর্তা মৎস্যজীবিন।" মহাভারত, ৫১:৫। উদ্ধৃত, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, "কেবট-জাতি," কৈবর্ত জাগরণ, পৃ. ৩৮।

[১৩] "অশ্বত্থামাবিকর্ণঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্তিনী। সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্তকে কেশবে॥" *শ্রীমদ্ভগবদগীতা*, জগদীশ চন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত (পুনর্মুদ্রণ; কলকাতা: প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, ২০১২)।

মনুসংহিতায় চতুর্বর্ণ ছাড়াও অনেক সংকর জাতির উল্লেখ রয়েছে। কোন জাতিবর্ণের উৎপত্তি কিভাবে, তাঁদের পেশা কী, সমাজে কার অবস্থান কোথায় প্রভৃতি বিষয় এখানে স্থান পেয়েছে। সংকর জাতিগুলোকে এখানে সম্মানের চোখে দেখা হয়নি। মনুসংহিতার দুই জায়গায় কৈবর্ত শব্দের উল্লেখ রয়েছে। প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ৮ অধ্যায়ের ২৬০ শ্লোকে, 'কৈবর্ত' শব্দটিকে অনুলোমজ জাতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় উল্লেখ পাওয়া যায় ১০ অধ্যায়ের ৩৪ শ্লোকে, 'কৈবর্ত' শব্দটিকে প্রতিলোমজ জাতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৪] এখানে বলা আছে নিষাদ পিতা এবং অয়োগব মাতার সন্তানের নাম মার্গব বা দাশ; এরা নৌকর্মজীবী। আর্যাবর্তের অধিবাসীরা এদের কৈবর্ত জাতি বলতো। উল্লেখ্য নিষাদ হলো ব্রাহ্মণ পিতা ও শূদ্র মাতার সন্তান এবং অয়োগব হলো শূদ্র পিতা ও বৈশ্যা মাতার সন্তান। এখানে 'কৈবর্ত' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ না ধরে অনুলোম-প্রতিলোম ভেদে এবং স্থান ও কর্মভেদে করা হয়েছে।

কৈবর্ত সম্পর্কে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের আলোচনার পূর্বে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সম্পর্কে কিছু বিষয় আলোকপাত করা প্রয়োজন। ভারতের দাক্ষিণাত্যে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের নাম ব্রহ্মকৈবর্তপুরাণ হিসেবে প্রচলিত।[১৫] দুই জায়গায় পুরাণটির দুই রকম নামের পেছনে দুটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রথমত, পুরাণে ব্রহ্মের বিবর্ত অর্থাৎ রূপান্তর বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এটাই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়। দ্বিতীয়ত, দাক্ষিণাত্যে ব্রহ্মকৈবর্তপুরাণ নামের কারণ হিসেবে দেখানো হয়, কৈবর্ত শব্দের অর্থ দাস। ব্রহ্ম অর্থাৎ কৃষ্ণের দাসত্ব লাভের জন্য এই পুরাণ রচিত। আর একটি ব্যাখ্যা এ রকম, কৃষ্ণ হলেন কৈবর্ত (নৌকর্ণধার), সংসার সমুদ্রে তিনি খেলা করছেন, তিনি ভবপারের কর্ণধার।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ড অংশে ৯৬-১০৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বৈশ্য মাতা ও ক্ষত্রিয় পিতা থেকে যে জাতির উৎপত্তি হয়েছে তার নাম কৈবর্ত।[১৬]

হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণাদির বর্ণনায় কৃষিজীবী ও নৌজীবী জাতিবর্ণগুলোর প্রতি এক ধরনের অবহেলা ও ঘৃণার ভাব দেখতে পাওয়া যায়।[১৭] ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাজবংশী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ও কৈবর্ত

---

[১৪] "নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্মজীবিনম্। কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ ॥," *মনুসংহিতা*, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত (কলকাতা: অরুণোদয় ঘোষ, ১৮৬৬), পৃ. ৩২৪।

[১৫] ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ রচনা করেছেন বেদব্যাস, বর্তমানের কৈবর্ত জাতিবর্ণ নিজেদের এই ব্যাসের বশংধর বলে দাবি করেন, মহাভারতেও ব্যাস কৈবর্তকন্যার সন্তান বলে স্বীকৃত। "নব সংস্করণের ভূমিকা" *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*, পঞ্চানন তর্করত্ন অনূদিত ও সম্পাদিত (কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৮৫)।

[১৬] তদেব, পৃ. ২৬।

জাতিবর্ণের কথা উল্লেখ থাকলেও বৃহদ্ধর্মপুরাণে এসব জাতিবর্ণের উল্লেখ নেই। এই পুরাণে বর্ণিত ৫০টি সঙ্কর জাতিবর্ণের নাম রয়েছে, এগুলো হলোঃ ব্রাহ্মণ, করণ বা কায়স্থ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, মাগধ, তন্ত্রবায়, গান্ধিক, বণিক, নাপিত, গোপ, কর্মকার, তৈলিক, কুম্ভকার, কংসকার, শাংখিক, দাস, বারজীবী, মোদক, মালাকার, সূত বা পতিত ব্রাহ্মণ, রাজপুত্র, তাম্বলী, স্বর্ণকার, সুবর্ণ বণিক, তক্ষণ, রঞ্জক, আভীর, তৈলকার, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শাবাক, শেখর, জালিক, মল্ল, চর্মকার, মলেগ্রাহী, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড়, তক্ষ, ঘট্টজীবী, ডোলাবাহী, পুক্কশ, পুলিন্দ, খস, খর, কম্বোজ, যবন, সুহ্ম এবং শবর।[১৮]

এর মধ্যে সরাসরি কৃষিপেশার সঙ্গে যুক্ত কোনো জাতিবর্ণ নেই। বাঙালিদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটি বৈশিষ্ট্য হলো, 'মাছে-ভাতে বাঙালি'। অথচ বাঙালিদের ভাত যোগান দেয় যেসব জাতিবর্ণ তাদের কথা এখানে উপেক্ষিত। কৃষিজীবী কৈবর্ত জাতিবর্ণের আলোচনা না থাকলেও মৎস্যজীবী দুইটি জাতি যথা ধীবর, জালিকদের বর্ণনা বৃহদ্ধর্মপুরাণে রয়েছে।[১৯]

পূর্বে উল্লিখিত বর্ণনা থেকে ধারণা করা যায়, প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে কৈবর্ত জাতির উৎপত্তি বর্ণ সংকর হিসেবে এবং প্রাচীন জনজাতি হিসেবে ধীবর, মৎস্যজীবী ও কৈবর্ত অভিন্ন। মনুসংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থে কৈবর্ত জাতিবর্ণ শূদ্র এবং অস্পৃশ্য হিসেবে বিবেচিত হতো। প্রাচীন এসব শাস্ত্রে উৎপত্তিগত এবং বৃত্তিগত উভয় দিক থেকেই কৈবর্তরা সম্মান ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিলো।

৩. ইতিহাসে কৈবর্ত

কৈবর্ত জাতিবর্ণ সম্পর্কে জানার অন্যতম উৎস হচ্ছে সন্ধ্যাকর নন্দীর বিখ্যাত কাব্য রামচরিতম্। এ কাব্যের প্রধান বিষয় হলো পাল শাসনামলে কৈবর্ত রাজা কর্তৃক বরেন্দ্র জয় এবং রামপাল কর্তৃক তা পুনরুদ্ধার। যদিও রামপালের গুণকীর্তন করাটাই এ কাব্যের মূল উদ্দেশ্য ছিলো।

---

[১৭] স্বরোচিষ সরকার সম্পা., *বাঙালি জাতিবর্ণের উৎস সন্ধান: নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কৈবর্ত, রাজবংশী* (ঢাকা: মাদার্স পাবলিকেশন্স, ২০১৯), পৃ. ১০।

[১৮] তদেব; *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*, পঞ্চানন তর্করত্ন অনূদিত ও সম্পাদিত (কলকাতা: বঙ্গবাসী স্টীম মেশিন প্রেস, ১৮৯৪), পৃ. ২৩৬-৩৭।

[১৯] *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*, পঞ্চানন তর্করত্ন অনূদিত ও সম্পাদিত (কলকাতা: বঙ্গবাসী স্টীম মেশিন প্রেস, ১৮৯৪), পৃ. ২৩৬।

পালরাজা দ্বিতীয় মহীপালের (আনু. ১০৭০-১০৭৫ খ্রি.) রাজত্বকালে কৈবর্ত বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এ বিদ্রোহের ফলে দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যু ঘটে এবং কৈবর্ত-প্রধান দিব্যর হাতে বরেন্দ্রের (উত্তর বাংলা) অধিকার চলে আসে।[২০]

দ্বিতীয় মহীপাল তাঁর দুই ভাই শূরপাল ও রামপালকে কারারুদ্ধ করেছিলেন।[২১] মহীপাল সন্দেহ পোষণ করেন যে, রামপাল রাজক্ষমতা দখল করে নিতে পারেন। অবশ্য একজন সক্ষম কনিষ্ঠ ভ্রাতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে সৃষ্ট উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সংকটের সম্ভাবনাকেও এক্ষেত্রে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুতরাং রামপালকে কারারুদ্ধ করার বিষয়ে সন্ধ্যাকর নন্দীর বর্ণনায় যদি কোনো সত্যতা থেকেও থাকে তবে তা হয়তো রামপাল এবং দ্বিতীয় মহীপালের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতেরই পরিণতি। সম্ভবত এরই ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে বরেন্দ্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।[২২]

বরেন্দ্র বিদ্রোহের কারণ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করা কঠিন। বরেন্দ্র বিদ্রোহ ছিলো দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে দিব্য এবং কৈবর্ত সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, মাছ ধরা পেশার বিরুদ্ধচারণকারী বৌদ্ধ শাসকগণের অধীনে কৈবর্তরা বেশ কষ্টে দিনাতিপাত করছিলো। বিদ্রোহীগণ ছিলেন রামপালের সমর্থক এমন ধারণাও প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু এরূপ ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ বিদ্রোহের ফলে বরেন্দ্রের পতন ঘটে এবং রামপাল এর থেকে কোনোভাবে লাভবান হননি।

'রামচরিত' কাব্যগ্রন্থে বরেন্দ্র বিদ্রোহ বর্ণিত হয়েছে 'ধর্ম্মবিপ্লবম্ অনীকম্‌লক্ষ্মীকম্' হিসেবে। এ গ্রন্থে সন্ধ্যাকর নন্দী দেখিয়েছেন, কিভাবে রামপাল অশুভ বিদ্রোহী দিব্যকে প্রতিহত করেন। তিনি দিব্য সহ যে সমস্ত কৈবর্ত বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে 'অলক্ষ্মীকম্ ধর্ম্মবিপ্লবম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। রামচরিতম্-এর ১/৩১ নং শ্লোকের টীকায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে মহীপাল তার জীবন হারান। বলা হয়ে থাকে যে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ষড়্‌গুণে গুণান্বিত তাঁর মন্ত্রীর

---

[২০] R. C. Majumdar et al. ed., *The Ramacaritam* (Rajshahi: The Varendra Research Museum, 1939).

[২১] সুকুমার সেন, *বঙ্গভূমিকা* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯), পৃ. ৮২।

[২২] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব* (৩য় সং; কলকাতা: দে'জ, ২০০০), পৃ. ২২৮; প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য, Ichhamuddin Sarkar, "Kaivarta Rebellion of Varendri: Exploring A New Dimension," *Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, volume 39, 2016, p. 9.

পরামর্শ উপেক্ষা করে মহীপাল একটি অসম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ঐক্যবদ্ধ অসংখ্য সামন্ত প্রধানের ('মিলিতানন্তসামন্তচক্র') বিপুল সংখ্যক সৈন্যের সমাবেশ দেখে মহীপালের সৈন্যগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারান।[২৩] রামচরিত কাব্যের আলোচ্য অংশ থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, মহীপালের বিরোধীরা ছিলো সামন্ত প্রধানদের একটি 'চক্র'। রামচরিতম্-এর ১/৩৮ নং শ্লোক থেকে জানা যায় দিব্য মহীপালের অধীনে উচ্চ রাজকার্যে নিয়োজিত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে মহীপালের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে বরেন্দ্র অধিকার করেন। একই শ্লোকে দিব্যকে 'উপধিব্রতী' বলা হয়েছে এবং টীকাকার উপধিব্রতীর ব্যাখা করেছেন 'অবশ্যকর্তব্য পালন করার ভানকারী' (অবশ্যকর্তব্যতয়া আরব্ধম্ কর্ম্মব্রতম্ ছদ্মনি ব্রতী) হিসেবে। এই ব্যাখ্যায় যে ইঙ্গিত রয়েছে তাতে মনে হয় যে, দিব্য রাজকর্মচারী হিসেবে বরেন্দ্র অধিকার করেছিলেন এই ভান করে যে, কর্তব্যবশে তিনি রাজার পক্ষেই বরেন্দ্র অধিকার করেছেন।[২৪] কিন্তু পরে তার স্বাধীনতা ঘোষণায় বিদ্রোহকারী সামন্তচক্রের সাথে তাঁর যে গোপন সম্পর্ক ছিলো তা প্রকাশ পায়। মহীপালের রাজত্বকালের শেষ সময় পর্যন্ত দিব্য ছিলেন রাজার পক্ষে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তিনি বরেন্দ্রের অধিকার গ্রহণ করেন। ক্ষমতার রাজনীতির এই জটিল খেলা স্বভাবতই সন্ধ্যাকর নন্দীর কাছে 'কুৎসিত' ও 'নিন্দনীয়' বলে মনে হয়েছে এবং এ ঘটনাকেই তিনি 'ধর্মবিপ্লব' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

দ্বিতীয় মহীপাল সামন্তদের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিলেন। বিদ্রোহের শেষ পর্যায়ে যেহেতু বরেন্দ্রের পতন ঘটে, সেহেতু মনে হয় সামন্তগণ উত্তর বাংলা অধিকার করেছিলেন। সে যুগে সামন্তদের বিদ্রোহ মোটেই কোনো অসম্ভব ঘটনা নয়। সার্বভৌম রাজশক্তি এবং সামন্তদের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ভর করতো মূলত উভয়ের তুলনামূলক শক্তির ওপর। একজন সামন্ত ততক্ষণই তাঁর অধিরাজের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করতেন যতক্ষণ তিনি (অধিরাজ) শক্তিশালী থাকতেন। সাম্রাজ্যে দুর্বলতার চিহ্ন দেখা দেওয়া মাত্র সামন্তগণ আনুগত্য অস্বীকার করতেন।[২৫]

বরেন্দ্র বিদ্রোহকে কেবল কৈবর্তদের বিদ্রোহ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা চলে না; বরং এটি ছিলো উত্তর বাংলার কয়েকজন শক্তিশালী সামন্তপ্রধান কর্তৃক দুর্বল পাল রাজাকে সরিয়ে দেওয়ার

---

[২৩] তদেব।

[২৪] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস: প্রাচীন যুগ*, প্রথম খণ্ড (৯ম সং; কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮), পৃ. ৮৬।

[২৫] তদেব।

একটি উদ্যোগ। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব এবং মহীপাল কর্তৃক দুই ভাইকে কারারুদ্ধ করার ঘটনা খুব সম্ভবত পালদের দুর্বলতারই ইঙ্গিত প্রদান করে এবং বিদ্রোহী সামন্তগণ দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে একটি চক্র গড়ে তোলেন। কৈবর্ত সম্প্রদায়ের প্রধান এবং রাজকীয় কর্মচারী দিব্য খুব সম্ভবত এই চক্র গড়ে তুলতে সহায়তা করেন এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাঁর পূর্বসম্বন্ধের বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যখন দিব্য বরেন্দ্রে স্বাধীন রাজত্বের সূচনা করেন।

দিব্যর ভ্রাতুষ্পুত্র কৈবর্তরাজ ভীমের জনপ্রিয়তা, দক্ষতা, উদারতা দেখে পাল রাজা রামপাল ভীতসন্ত্রস্ত হয়েছিলেন। আরও ভূমি হারানোর ভয়ে তিনি প্রতিবেশী ও সামান্তরাজাদের অপরিমিত অর্থ ও ভূমি দান করেছিলেন এবং কৈবর্ত রাজা ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তারা সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছিলেন। সম্মিলিত সৈন্যের সাথে ভীমের নবগঠিত রাষ্ট্রের পেরে ওঠা অনেকটা অসম্ভব ছিলো। গঙ্গার উত্তর তীরে যুদ্ধ করতে গিয়ে জীবিত অবস্থায় ভীম বন্দিত্ব বরণ করেন। ভীমের অগণিত রাজকোষ পাল সেনারা লুণ্ঠন করে। কৈবর্ত বিদ্রোহ দমনে রামপাল অন্যান্য সামন্ত রাজাদের সাহায্য পেয়েছিলেন একথা সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে উল্লেখ আছে।

ভীম বন্দি হওয়ার পর ভীমের অন্যতম সুহৃদ, বিশ্বস্ত হরি পরাজিত সৈনিকদের একত্র করেন এবং রামপালের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধে লড়ার অঙ্গীকার করেন। হরির নেতৃত্বে যখন সেনারা যুদ্ধ জয়ের দ্বারপ্রান্তে তখন রামপাল তার স্বর্ণকলস উজাড় করে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের বশীভূত করতে সক্ষম হন। এর মাধ্যমে বরেন্দ্রীর স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ার স্বপ্ন চিরদিনের জন্য নিঃশেষিত হয় এবং বরেন্দ্র পুনরায় পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কৈবর্তেরা যেন আর কখনো রুখে দাঁড়াতে না পারে সে জন্য তারা কৈবর্ত নেতাদের কঠোর শাস্তি প্রদান করে। ভীমের পরিবারকে সকলের সামনে হত্যা করা হয় এবং পরবর্তী কালে ভীমকেও হত্যা করা হয়। পাল রাজারা এই বিদ্রোহ দমনে চরম নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছিলেন।[২৬]

সন্ধ্যাকরনন্দী রামচরিতে কৈবর্তদের নিন্দা করলেও তাদের পেশা বা সামাজিক বৃত্তি নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। হতে পারে সমাজে তাদের বৃত্তি বা পেশা কোনোটাই নিন্দনীয় ছিলো না। একাদশ দ্বাদশ শতকে কৈবর্তরা বাংলাদেশে কেবট নামে পরিচিত ছিলো এবং কৈবর্তদের কেউ

---

[২৬] অরূপ চন্দ্র সম্পাদিত, *বাংলায় হাজার বছরের কৃষক বিদ্রোহ ও মুর্শিদাবাদ* (বহরমপুর: বাসভূমি প্রকাশন, ২০১৪), পৃ. ৭৩।

কেউ সাহিত্যচর্চাও করতেন। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' কাব্যসংকলনে কৈবর্ত কবি পপীপ রচিত সুন্দর একটি গঙ্গাস্তব রয়েছে। এক্ষেত্রে নীহাররঞ্জন রায়ের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য –

> একাদশ দ্বাদশ শতকেও কৈবর্তরা বাংলাদেশে কেবট বলিয়া পরিচিত হইতেন এবং তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ কেহ কেহ সংস্কৃতিচর্চা করিতেন, কাব্যও রচনা করিতেন, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির ভক্ত অনুরাগী ছিলেন। 'সদুক্তি কর্ণামৃত' নামক কাব্যসংকলন গ্রন্থে (১২০৬) কেবট্ট পপীপ অর্থাৎ কেওট বা কৈবর্ত কবি পপীপ রচিত গঙ্গাস্তবের একটি পদ আছে। পদটি বিনয়-মধুর, সুন্দর![২৭]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম" নামক একটি প্রবন্ধে কৈবর্ত জাতিবর্ণের কথা একাধিকবার উল্লেখ আছে। তাঁর মতে, প্রাচীন বাংলাদেশে দ্রাবিড়, মগধ প্রভৃতি জাতির বসবাস ছিলো। এছাড়া উত্তরবঙ্গে কিরাত, পৌণ্ড্র এবং কৈবর্ত এই তিনটি জাতিবর্ণ ছিলো। বেদ রচয়িতা আর্যরা এই তিন জাতিকে দস্যু বলে বর্ণনা করতো। অর্থাৎ তাদেরকে আর্যদের শত্রু মনে করা হতো। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, কৈবর্তরা উত্তরবঙ্গে খুব শক্তিশালী ছিলো। বল্লালসেন কৈবর্তদেরকে ভাগ করে একটি অংশকে উত্তরবঙ্গে রাখেন এবং আর একটি অংশকে ওড়িশার সীমানায় বসবাস করতে দেন।[২৮] এই দুই জায়গায় এখনো কৈবর্ত জাতিবর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। আদমশুমারি রিপোর্টেও এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, বৌদ্ধদের যতগুলো ধর্মকর্ম আছে তার মধ্যে যেগুলিকে অত্যন্ত সহজ মনে করা হয় এবং সবার আগে পালন করা হয়, সেগুলোকে আদিকর্ম বলা হয়। ত্রিশরণ গমন এই আদিকর্মগুলোর মধ্যে আদি। এরপর লৌকিক ও লোকোত্তর সিদ্ধির চেষ্টা করার নিয়ম। রত্নত্রয়ের শরণ নিলেই যেহেতু বৌদ্ধ হওয়া যেতো এবং কোনো পুরোহিতের প্রয়োজন হতো না, সেহেতু খুব সহজেই জেলে, মালো, কৈবর্তরা বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করতে পেরেছিলো।[২৯]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ধারণা, বাংলায় যে সকল জাতি বাস করতো – কিরাত, পৌণ্ড্র, কৈবর্ত, বঙ্গ, বগধ সকলেই বৌদ্ধ হয়েছিলো। তবে পশুহত্যা যাদের ব্যবসা ও জীবিকা তাদেরকে বৌদ্ধরা দীক্ষা দিতেন না। যারা এই পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশা গ্রহণ করতো তারা বৌদ্ধদের দীক্ষা পেতো।

---

[২৭] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালি হিন্দুর বর্ণভেদ* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৪৭), পৃ. ৫২।

[২৮] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *বৌদ্ধধর্ম* (ঢাকা: নবযুগ, ২০১১), পৃ. ১১-১২।

[২৯] তদেব।

সম্ভবত এজন্যই বাংলায় হেলে কৈবর্ত এবং জেলে কৈবর্ত এই দুটি জাতিবর্ণের সৃষ্টি হয়েছিলো।[৩০] তাঁর ধারণা অনুযায়ী কৈবর্তদের একটা অংশ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা পেয়েছিলো আর একটি অংশ দীক্ষা পায়নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন, দীক্ষা না পেলেও কৈবর্তরা যে বৌদ্ধ ছিলো না, তেমনটা নয়। শিক্ষা-দীক্ষা না পেলেও শুধুমাত্র 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,' 'ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি,' 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' বললেই কেউ বৌদ্ধ হতে পারতো। তাই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কৈবর্তদের শিক্ষা-দীক্ষা না দিয়েও তাদের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন।[৩১]

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং ষোড়শ শতাব্দীর শুরুর দিকে আসামের বরদোয়া জেলায় সতী রাধিকা (শান্তি) নামে একজন কৈবর্ত নারী নেতৃত্বের কথা জানা যায়।[৩২] তিনি ছিলেন আসামের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা শঙ্করদেবের শিষ্যা। শঙ্করদেবের সময়ে আসামের বরদোয়াতে ব্রহ্মপুত্র নদীর জল টেম্পরাণী নদীতে প্রবেশ করলে ঐ এলাকায় বেশ সমস্যার সৃষ্টি করে। বরদোয়া এলাকা এবং সেখানকার মানুষকে রক্ষা করার জন্য শঙ্করদেব একটি বাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টেম্পরাণী নদীর প্রবেশমুখে বাঁধ নির্মাণে তিনি নেতৃত্ব দান করেন। প্রকৌশল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তিনি বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করেন। সতী রাধিকা এই বাঁধ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

সতী রাধিকা এবং তাঁর স্বামী পূর্ণনন্দা আতাই কিভাবে শঙ্করদেবের সাথে যুক্ত হলেন তা নিয়ে একটি গল্প প্রচলিত রয়েছে। গল্পটি এরকম, সতী রাধিকা বরদোয়ায় এই বাঁধ নির্মাণে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম স্বেচ্ছাসেবী, যিনি এই প্রবহমান নদীতে প্রথম মাটি ঢালেন। কিন্তু বাঁধ নির্মাণের প্রথম উদ্যোগটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এতে সবাই হতাশ হয়ে পড়ে এবং নির্মাণ কাজ ছেড়ে চলে যায়। দ্বিতীয়বার উদ্যোগ নেওয়া হলে রাধিকাই প্রথম নারী যিনি শঙ্করদেবের নির্দেশনা পালন করেন। শঙ্করের দ্বিতীয় প্রচেষ্টার কথা জেনে রাধিকা তাঁর জেলে স্বামীর সাথে একটি নৌকায় করে সেখানে যান এবং কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। রাধিকা নদীতে মাটি ফেলা শুরু করলে অন্যান্যরা এগিয়ে আসেন এবং এই কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যান। সাধারণ জনগণ যাদের শঙ্করদেবের

---

[৩০] তদেব।

[৩১] তদেব।

[৩২] পূর্ণলাল দাস, *সতী রাধিকা* (যোরহাট: চিন্তামযী মেধি, ১৯৩৩), পৃ. ২৫-৩৭; সুতরাম দাস, *সতী রাধিকা: এগরকি আদর্শ নারীর জীবনী আরু কৈবর্ত-কথা* (গৌহাটি: জনজাতীয় গবেষণা সংস্থা সঞ্চালকালয়, ১৯৮৮)। [গ্রন্থদুটি অহমিয়া ভাষায় রচিত]

প্রকৌশল জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা ছিলো না তারা এই মহান নারীর মাটি ফেলাকেই বাঁধ নির্মাণের সফলতা হিসেবে মনে করে। এরপর থেকে চারিদিকে রাধিকার কৃতিত্ব ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাবাসীর বিশ্বাস রাধিকার সতীত্বের জোরেই মাটি দিয়ে খরস্রোতা নদীর প্রবাহ বন্ধ হয়েছে। এই ঘটনার পর থেকেই টেম্পরাণী নদী রাধিকার নামানুসারে শান্তি নদী হিসেবে পরিচিত হয়। সতী রাধিকার নামে বৃহত্তর বরদোয়ার পূর্বাংশে শান্তি নদীর পাশে একটি মন্দির রয়েছে। এই মন্দির আসামের কৈবর্ত জাতিবর্ণের প্রতিনিধিত্বকারী দম্পতি সতী রাধিকা ও পূর্ণনন্দা আতাইয়ের কথা প্রত্যেককে স্মরণ করিয়ে দেয়।[৩৩]

বিভিন্ন ঐতিহাসিক উৎস থেকে কৈবর্ত জনজাতির ৫টি রাজবংশের কথা জানা যায়।[৩৪] এগুলো হলো, তমলুক, বালিসিতা, তুর্কা, সুজামুতা, এবং কুতুবপুর রাজবংশ। এগুলোর অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরে অবস্থিত। বালিসিতা, তুর্কা রাজবংশ সম্পর্কে তেমন বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। সুজামুতা রাজপরিবারের কোনো বংশধর বর্তমানে বেঁচে নেই এবং এই রাজপরিবারটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তমলুক এবং কুতুবপুর রাজবংশ বিলুপ্ত হয়নি কিন্তু রাজপরিবারের আগের সেই প্রাচুর্য আর নেই।

পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে কৈবর্ত রাজাদের ভগ্নপ্রায় একটি প্রাচীন রাজবাড়ি রয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে, বর্তমান তমলুক অঞ্চলই প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগরী।[৩৫] প্রাচীনকালে বাংলায় যে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য ছিলো, তার মধ্যে অন্যতম এই তাম্রলিপ্ত। এখানে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছে তাম্রলিপ্ত রাজবংশ। এ রাজবংশের বর্তমান বংশধরেরা নিজেদের মাহিষ্য বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। তাম্রলিপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ময়ূরধ্বজ।[৩৬] তাঁর পুত্র তাম্রধ্বজ তমলুক রাজবাড়ি ও নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের সময়কাল সম্পর্কে তেমন বিস্তারিত জানা যায় না। তবে এ রাজবংশের ৪২তম বংশধর ভাস্কর ভূঞ্যা রায় সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যুকাল ১৪০৪ খ্রিস্টাব্দ। তাম্রলিপ্ত রাজবংশের রাজত্ব ১৯৪২ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো, সে সময়ে এ রাজবংশের ৬১তম বংশধর ছিলেন রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ।[৩৭]

---

[৩৩] তদেব।

[৩৪] Pyari Mohan Das, *The Mahishyas* (Kolkata: The Buckland Press, 1909), p. 9.

[৩৫] R. C. Majumder, *History of Ancient Bengal* (1971) p. 345.

[৩৬] দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়, *তাম্রলিপ্তের রাজকাহিনী* (তমলুক: ইউনিক প্রিন্টার্স, ২০০৩), পৃ. ৬৪।

[৩৭] তদেব, পৃ. ৬৫-৬৭।

তমলুক রাজপরিবারের অনেক রাজা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। রাজপরিবারের অনেক নারীও প্রকাশ্যে ব্রিটিশদের বিরোধিতা করেছেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তমলুক রাজপরিবারের অবদানের জন্য চাষি কৈবর্ত জনগোষ্ঠীর লোকজন এখনও গর্ব বোধ করেন। এমন একজন সাহসী রানি কৃষ্ণপ্রিয়া। ১৭৭০ সালে রানি কৃষ্ণপ্রিয়া রাজপরিবারের দত্তক সন্তান আনন্দনারায়ণের সাথে জমিজমা সংক্রান্ত এক বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। এর সাথে দুর্গাপূজার স্থান নিয়ে পুনরায় বিবাদ হলে সংকট আরও চরমে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি নিয়ে মামলা করা হয়। রানি কৃষ্ণপ্রিয়া আনন্দনারায়ণের কাছে মামলায় হেরে যান। মামলায় প্রাপ্ত অধিকার কার্যকর করার জন্য আনন্দনারায়ণের পক্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একদল সৈন্য পাঠায়। রানি কৃষ্ণপ্রিয়া এতে বাধা দেন। ফলে ১৭৮১ সালে মতান্তরে ১৭৮২ সালে কোম্পানির সৈন্যদের সাথে রানির লোকজনের সংঘর্ষ হয়। রানি পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন। বিবাদের বিষয়টি পারিবারিক হলেও কৈবর্ত জনগণ মনে করেন এ ঘটনাটি ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সেই সময়ে একজন কৈবর্ত নারী তৎকালীন গভর্নরের আদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস দেখিয়েছিলেন। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে রানি কৃষ্ণপ্রিয়া মেদিনীপুরের জনগণের মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। পরবর্তী কালে পশ্চিম মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের রানি শিরোমণি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংঘটিত চুয়াড় বিদ্রোহে অনুরূপ সাহসিকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দেন।

কৈবর্ত জাতির বিশ্বাস তাদের জাতি পরিচয়কে যাঁরা মহিমান্বিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে রানি রাসমণির নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তাদের মতে, রানি রাসমণি তাদের আত্মপরিচয়কে শুধু গৌরবান্বিত করেননি, সেই সাথে সমাজে কৈবর্ত জাতির পরিচয়কে এক নতুন মাত্রা দান করেছিলেন। হিন্দু সমাজের বহু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সমাজ-সংস্কার ও মানবতার সেবায় তাঁর অবদান অসামান্য।[৩৮] ভগিনী নিবেদিতা তাঁর একটি গ্রন্থে রানি রাসমণির অবদানের কথা লিখতে গিয়ে লিখেছেন, রাসমণির দক্ষিণেশ্বর মন্দির ছাড়া রামকৃষ্ণ হতো না, রামকৃষ্ণ ছাড়া বিবেকানন্দ হতো না আর বিবেকানন্দ ছাড়া কোনো পাশ্চাত্য মিশনও হতো না।[৩৯]

---

[৩৮] দুলালকৃষ্ণ দাস, *যুগজননী রানি রাসমণি* (কলকাতা: একুশশতক, ২০১৪), পৃ. ৭১।

[৩৯] Nivedita, *The Master I Saw Him* (London and New York: Longmans green and co., 1910), p. 355.

কৈবর্ত জাতিবর্ণের আরও যাঁরা রাজনৈতিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বীরেন্দ্র শাসমল, বসন্তকুমার বিশ্বাস, মাতঙ্গিনী হাজরা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এই ব্যক্তিদের মধ্য দিয়ে কৈবর্ত জাতিবর্ণের আত্মপরিচয়ের গৌরব বৃদ্ধি পায়।

৪. সরকারি দলিলপত্র ও ব্রিটিশদের লেখায় কৈবর্ত

কৈবর্ত জাতিবর্ণের আত্মপরিচয় সন্ধানে সরকারি দলিলপত্রগুলোর মধ্যে বিভিন্ন সালের আদমশুমারি রিপোর্ট, গেজেটিয়ার, প্রতিবেদন এবং ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের লেখা কিছু গ্রন্থ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এগুলো থেকে কৈবর্ত জাতিবর্ণের নিকট অতীত সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের লেখায় কৈবর্ত প্রসঙ্গটি সর্বপ্রথম মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায় জেমস টেইলরের ‘স্কেচ অব দি টপোগ্রাফি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স অব ঢাকা’ (১৮৪০) গ্রন্থটিতে। এখানে কৈবর্ত জাতিবর্ণকে দুটি ভাগে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি অংশ চাষা কৈবর্ত নামে পরিচিত যারা কৃষিজীবী বা রায়ত এবং আরেকটি অংশ জালিয়া কৈবর্ত বা জেলে, ঢাকা ও এর আশেপাশের এলাকায় এরা শ্রেষ্ঠ নাবিক বা নৌকার মাঝি হিসেবে পরিচিত।[৪০]

হার্বার্ট রিজলি রচিত *The Tribes and Castes of Bengal* (1851) কৈবর্ত জাতির উৎপত্তি সন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। তবে বিভিন্ন জাতিবর্ণ সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যগুলোর সঠিকতা যাচাই করা হয়নি। ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের মন্তব্যই এখানে পাওয়া যায়।

রিজলির বইটিতে কৈবর্ত জাতিবর্ণ সম্পর্কে প্রায় নয় পৃষ্ঠার বর্ণনা রয়েছে। তাঁর মতে কৈবর্ত হলো বাংলার কেওটদের একটা উপবর্ণ। কৈবর্ত-দাস, চাষি-দাস, হালিয়া-দাস, পরাশর-দাস, ধীবর এগুলো সমার্থক এবং এটি বাংলার সবচেয়ে বড়ো মৎস্যজীবী ও কৃষিজীবী জাতি, এদের পদমর্যাদা নবশাখের নিচে এবং ব্রাহ্মণরা যে নয়টি জাতের জল গ্রহণ করে এরা তাদের মধ্যে

[৪০] “The Kaibortos are divided into two distinct classes of Chasa Kaibortos, ploughmen or ryotts, and Jalwah Kaibortos or fishermen. The latter are considered the best boatmen in this part of the country.” James Taylor, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca* (Kolkata: G. H. Huttmann Millitary Orphan Press, 1840), p. 234.

একটি। দৈহিক গঠনের দিক থেকে কৈবর্তরা দ্রাবিড়দের উত্তরসূরি, তবে খানিকটা আর্য রক্তের মিশ্রণ রয়েছে।[৪১]

রিজলির বর্ণনার সাথে জেমস ওয়াইজের বর্ণনায় বেশ মিল রয়েছে, কৈবর্তরা বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন অধিবাসী এবং নেতৃত্বের অবস্থানে ছিলেন। অনেক শতাব্দী পূর্বে মেদিনীপুর জেলাতে তম্রলিপ্ত বা তমলুক, বলিসিতা, সুজামুতা, তুর্কা এবং কুতুবপুর নামে পাঁচটি আলাদা রাজত্ব তাঁদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিলো। নিঃসন্দেহে দেশের এই অংশটি প্রাচীন এই অধিবাসীদের আদিনিবাস ছিলো।[৪২]

কৈবর্ত শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করতে গিয়ে রিজলি প্রচলিত বেশ কিছু মতামত বিবেচনা করেছেন। রিজলির মতে, 'ক' অর্থ জল এবং 'বর্ত' অর্থ জীবিকা। এর দ্বারা জলাবৃত দেশ বা উপকূল বোঝানো হতে পারে। যেমন সুপ্রাচীন বঙ্গ। এক্ষেত্রে অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন কৈবর্ত কোনো জাতির নাম নয়, এটি স্থানের নাম ছিলো। তাই সে দেশের বসবাসকারী মানুষদের চলতি রীতি অনুযায়ী তাদেরকে কৈবর্ত নামে অভিহিত করা হয়েছে।

রিজলি বলেন, আদি সংস্কৃতে জল অর্থে 'ক' এর ব্যবহার প্রায় ছিলো না বললেই চলে। বরং এর উৎপত্তি হলো কিম্বর্তের বিকৃত রূপ 'কিবর্ত' থেকে যার অর্থ নিম্ন বা অধঃপতিত পেশাধারী ব্যক্তি। তিনি আরও বলেন মনুসংহিতা ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কৈবর্ত জাতিবর্ণের উৎপত্তি সংক্রান্ত বর্ণনা রয়েছে।

এইচ এইচ রিজলির আলোচনায় কৈবর্ত ও কেওট দুটি আলাদা শাখার উৎপত্তি নিয়ে বেশ কয়েকটি লৌকিক গল্পের উল্লেখ করেছেন, যথা –

গল্প ১. বাংলায় কেওট নামে একটি শক্তিশালী জাতি বাস করত, বল্লাল সেন যাদের সৎশূদ্রে উন্নীত করেছিলেন এই শর্তে যে, তারা তাদের পূর্বের মৎস্য পেশা ত্যাগ করবেন। কনৌজ ব্রাহ্মণরা তাদের এই পদোন্নতি মেনে নিতে পারেননি, তাই ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণরা তাঁদের পুরোহিত নিযুক্ত হয়।

[৪১] H. H. Risley, *Tribes and Castes of Bengal* (Kolkata: Firma Mukhopadhyay, 1891), p. 375.

[৪২] James Wise, *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal* (London: Harrison and Sons, 1883), p. 299.

গল্প ২. পরাশর মুনি ও মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর সন্তান ব্যাস। বাংলাদেশের কৈবর্তরা ব্যাসের বংশধর বলে নিজেদের দাবি করে। তথাকথিত উঁচু জাতগুলো যারা কৈবর্তদের হাতে জল গ্রহণ করে তারা কৈবর্ত ব্রাহ্মণদের থেকে জল গ্রহণ করে না, এমনকি কৈবর্তরাও তাদের নিজেদের ব্রাহ্মণদের রান্না করা খাবার খায় না।

গল্প ৩. কৈবর্তরা বল্লাল সেনকে বড়ো ধরনের সেবা করায় বল্লাল সেন খুশি হয়ে তাদের পুরস্কৃত করতে চাইলেন। তারা রাজার কাছে দাবি করেন যে, স্থানীয় ব্রাহ্মণরা যেন তাদের পৌরোহিত্য করে। কিন্তু ব্রাহ্মণরা তাদের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করলে রাজা তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখতে কথা দেন, পরদিন সকালে তিনি প্রথম যে ব্যক্তিকে দেখবেন তাকেই কৈবর্ত জাতিবর্ণের ব্রাহ্মণ হিসেবে নিযুক্ত করবেন। পরদিন সকালে রাজা প্রথম দেখেন যে, তার ঝাড়ুদার উঠোন ঝাড়ু দিচ্ছে। কৈবর্তরা যা চেয়েছিলো তা না হলেও রাজার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য ঝাড়ুদারদের তাদের পৌরোহিত্যের এই পবিত্র দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং মন্ত্রী কর্তৃক পাঠানো হয়।[৪৩]

কৈবর্ত জাতিবর্ণকে অবমাননার জন্য এসব কাহিনী রচিত হয়ে থাকবে।

১৮৭৫ সালে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার কর্তৃক জাতি ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক 'এ স্টাটিসটিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।[৪৪] গ্রন্থটিতে কৈবর্ত জাতি সম্বন্ধে অনেক ইতিবাচক তথ্য পাওয়া যায়। কৈবর্ত সম্বন্ধে সেখানে বলা আছে, কৈবর্তরা যে এ দেশের আদিবাসী ছিলো সে বিষয়ে সামান্য সন্দেহ রয়েছে, কৌম অর্থেই হয়তো এটা বলা হয়েছে। মহাভারতসহ প্রাচীন অনেক হিন্দু শাস্ত্রে তাদের উল্লেখ আছে। হান্টারের মতে, কৈবর্তরা সর্বদাই নিজেদের উচ্চ সামাজিক অবস্থানের দাবি করে এবং পরশুরাম এ জাতিবর্ণটির একটা বৃহৎ অংশকে মালাবার উপকূলে ব্রাহ্মণ তৈরি করে পাঠিয়ে দেন। মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেব নিজেকে কৈবর্ত মাতার সন্তান হিসেবে পরিচয় দেন এবং একজন কৈবর্ত রাজার আনুকূল্য লাভের জন্য কৈবর্ত জাতিবর্ণের কয়েকজন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ তৈরি করে তাদেরই (বাকি কৈবর্তদের) পুরোহিত হিসেবে নিয়োগ করেন। তারা এখনও কৈবর্ত ব্রাহ্মণ হিসেবে পরিচিত এবং হুগলি জেলায় এদের সংখ্যা অনেক।

হান্টারের বর্ণনায় আরও পাওয়া যায়, পশ্চিম বাংলার সমতলে যারা বসবাস করে এরা কৈবর্ত নাম নিয়ে হিন্দুদের ধর্ম, প্রথা, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি গ্রহণ করেছে। তবে কিছু কিছু কৈবর্ত

[৪৩] H. H. Risley, *Tribes and Castes of Bengal*. p. 377.

[৪৪] W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol.1 (London: 1875), p. 63-64.

ভূঁইয়া নাম নিয়ে আলাদা উপজাতি হিসেবে বসবাস করছে। মেদিনীপুর জেলার তমলুক রাজাও একজন কৈবর্ত। তাঁর ধারণা, চব্বিশ পরগনা জেলার কৈবর্তরা হুগলি জেলার পশ্চিম থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে।

হান্টার কৈবর্ত জাতিবর্ণকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেন।[৪৫] যেমন, প্রথম অবস্থানে রয়েছে উত্তর রাঢ়ী বা চাষি কৈবর্ত – এরা কৃষিজীবী; দ্বিতীয়ত, পূর্বদেশি কৈবর্ত, কৃষিজীবী; তৃতীয়ত, তুঁতে বা দক্ষিণ রাঢ়ী কৈবর্ত যারা রেশম পোকা লালন-পালন এবং চাষ করে; চতুর্থত, সিউলি এবং সর্বশেষ মালো বা জেলে, এরা মৎস্যজীবী ও নৌজীবী।[৪৬] হান্টার মনে করেন, প্রথম দুই শ্রেণি সমাজে সম্মানিত এবং ব্রাহ্মণরা এদের থেকে জল গ্রহণ করে বাকি তিনটি শ্রেণির অবস্থান সমাজে সম্মানিত নয়। বর্তমান কালে মালোরা নিজেদের আলাদা জাতি হিসেবে দাবি করে।[৪৭]

নামের সাথে কৈবর্ত শব্দ থাকায় জেলে কৈবর্ত ও চাষি কৈবর্তরা সমাজে একই জাতি বলে বিবেচিত হতো। যেটা চাষি কৈবর্তরা সম্মানজনক মনে করতো না। জেলেদের থেকে নিজেদের পৃথক করার জন্য তারা নিজেদের দাস, পরাশর দাস, হালিক দাস, মাহিষ্য দাস ইত্যাদি নাম গ্রহণ করে।[৪৮]

সরকারি দলিলপত্রগুলোর মধ্যে কৈবর্ত জাতিবর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৭২ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে কৈবর্ত জাতিবর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠ।[৪৯] এ রিপোর্টে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সমার্থক হিসেবে চাষা দাস ও জালিয়া উল্লেখ রয়েছে।

মধ্য বাংলা ও মালদহতে কৈবর্তরা চাষি কৈবর্ত ও জালিয়া কৈবর্ত এই দুই ভাগে বিভক্ত। কৃষিকাজের সাথে নিয়োজিত চাষি কৈবর্ত এবং মাছ শিকারে নিয়োজিতরা জালিয়া বা জেলে কৈবর্ত এরা সাধারণত কৈবর্ত নামে পরিচিত। এদের মধ্যে বিয়ের প্রচলন রয়েছে, তবে সেক্ষেত্রে জেলে কৈবর্তরা তাঁদেরকে অর্থ প্রদান করে। ঢাকাতে এই বিভাজন লক্ষ করা যায় না তবে তুঁতে কৈবর্ত

[৪৫] Ibid.

[৪৬] Ibid.

[৪৭] Ibid.

[৪৮] গোপালচন্দ্র সরকার, *মাহিষ্য নামোদ্ধারের ইতিবৃত্ত* (কলকাতা:

[৪৯] *Report on the Census of Bengal 1872* (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1872), p. CXIX.

নামে আর একটি জাতি রয়েছে যারা রেশম চাষ করে। কৈবর্তদের মতো কৈবর্ত ব্রাহ্মণরা দুই ভাগে বিভক্ত, যথা: উত্তর রাঢ়ী এবং দক্ষিণ রাঢ়ী, এদের পেশা মৎস্যশিকার করা।[৫০]

চাষি কৈবর্তগণই যে মাহিষ্য নামধেয়, তা এলএলএস ওম্যালী দেখিয়েছেন। এলএলএস ও'ম্যালী তাঁর 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ার: যশোর ১৯১২' গ্রন্থে কৈবর্ত জাতির বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে, ১৯১২ সালে যশোরে কৈবর্তদের মধ্যে ৩৬১৯৫ জন চাষি কৈবর্ত এবং ৪১২৪ জন জালিয়া বা জেলে কৈবর্ত এবং ৩৮৩৩ জন অনির্ধারিত কৈবর্ত অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে সাধারণভাবে কৈবর্ত বলা হয়। চাষি কৈবর্তদের পেশা হলো কৃষিকাজ, যারা জেলে কৈবর্তদের থেকে সামাজিক মর্যাদায় উঁচু অবস্থানে রয়েছে। জেলে কৈবর্তদের পেশা মৎস্য শিকার করা। সাম্প্রতিক কালে কৈবর্তরা মাহিষ্য নামে পরিচিত।[৫১] তিনি মুর্শিদাবাদে মাহিষ্য জাতির তৎকালীন সংখ্যা বিষয়ে তাঁর বেঙ্গল ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ার, মুর্শিদাবাদ (১৯১৪) গ্রন্থেও চাষি কৈবর্ত বা মাহিষ্য শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

এলএলএস ও'ম্যালী তাঁর 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ার: রাজশাহী ১৯১৬' গ্রন্থে কৈবর্ত জাতির বর্ণনা দিয়েছেন । কৈবর্ত জাতির নিয়ন্ত্রক হিসেবে প্রামাণিক বা প্রধানরা থাকেন। কৈবর্তরা হালিক ও জালিক এই দুটি ভাগে বিভক্ত। বর্তমানে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রামাণিক ও প্রধান পদবি ব্যবহৃত হয়; বিশেষ করে রাজশাহী এবং নওগাঁ জেলায় এই পদবির সংখ্যাধিক্য রয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনামলে দেখা যাচ্ছে, সমাজে কৈবর্তদের অবস্থা সম্মানজনক নয় বরং কখনো কখনো কৈবর্ত বা কেওট শব্দটি গালিবাচকতায় ব্যবহার করা হচ্ছে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য কৃষিজীবী কৈবর্ত অংশটি মাহিষ্য নাম গ্রহণ করে। যদিও তাদের মাহিষ্য নামটি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অনেক আন্দোলন করতে হয়েছে। এ নিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

৫. আদমশুমারি রিপোর্টে কৈবর্ত

১৮৭২ থেকে শুরু করে ১৮৯১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে জাতিবর্ণের রেকর্ডে কৈবর্ত বলতে শুধু কৃষিজীবী জাতিবর্ণকে বোঝানো হয়েছে। রেকর্ড অনুযায়ী মৎস্যজীবীরা অন্য নামে অর্থাৎ জালিয়া,

---

[৫০] Ibid.

[৫১] O'Malley, L.S.S. Bengal District Gazetteers: Jassore (Kalkata: Bengal Secretariat Book Depot, 1912) pp. 52-53.

কেওট নামে পরিচিত ছিলো। বর্তমানে জেলে কৈবর্তরা শুধু কৈবর্ত নামে পরিচিত। এর সমার্থক আরও কিছু শব্দ রয়েছে, এগুলো হলো ধীবর, জালিয়া, জেলে, জালওয়া, জুলুয়া, ঝালো, মালো, মালা, মালুয়া, মাছুয়া, কেওট, কুলীনগুড়ি।[৫২] চাষি কৈবর্তের সমার্থক শব্দগুলো হলো চাষা, হেলে, হালিয়া, এবং মাহিষ্য।[৫৩] যদিও বর্তমান সময়ে কৈবর্ত, কেওট, জালিয়া, জেলে কৈবর্ত প্রভৃতি সমার্থক হিসেবে ধরা হয় এবং মাহিষ্য, হেলে বা হালিয়া কৈবর্ত, চাষা বা চাষা কৈবর্তকে এক হিসেবে ধরা হয়। বর্তমানের ন্যায় বিভাজন না থাকলেও শুমারি রিপোর্টগুলোতেও কৈবর্ত, চাষা, হালিয়া, জালিয়া, কেওট, দাস প্রভৃতি নামে আলাদা আলাদা অন্তর্ভুক্তি পাওয়া যায়। তাই কৈবর্তের সাথে সাথে চাষা, কেওট, জালিয়া, দাস, মাহিষ্য অন্তর্ভুক্তি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং কিভাবে, কখন থেকে ও কোথায় কোথায় এই ভাগগুলো কৈবর্তের সাথে অভিন্ন হয়ে গেলো অথবা কৈবর্ত কবে জেলে হলো তা পরবর্তী আলোচনায় আলোকপাত করা হয়েছে।

হাবার্ট রিজলির 'ট্রাইবস্ এণ্ড কাস্টস্ অব বেঙ্গল' গ্রন্থে কৈবর্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে – কৈবর্ত-দাস, চাষি-দাস, হালিয়া-দাস, পরাশর-দাস, ধীবর এগুলো সমার্থক এবং এটি বাংলার সবচেয়ে বড়ো মৎস্যজীবী ও কৃষিজীবী জাতি।[৫৪] আদমশুমারি রিপোর্টে রিজলির এই ধারণাটির প্রভাব খুব স্পষ্ট।

১৮৭২ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলার মোট জনসংখ্যা ছিলো ৬,২৭,২৫,৫৪৫ জন, এর মধ্যে হিন্দু ৩,৯৯,৯৬,৫৭৫ জন, যা বাংলার মোট জনসংখ্যার ৬৩.৭৬%, মুসলমান ১,৯৫,৫৯,২৫২ জন বা ৩১.১৯%, খ্রিস্টান ৯১,০৬৩ জন বা ০.১৪%, বৌদ্ধ ৮০,৬০৭ জন বা ০.১২%, এবং আদিবাসী ২৩,৩৯,৫৪১ জন বা ৩.৭২%।[৫৫]

---

[৫২] মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য সম্পা., *মালদহ চর্চা* (মালদহ: বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা, ২০১১), পৃ. ১৩০।

[৫৩] *Census of India 1901,* vol. VI (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1902), p. 223.

[৫৪] H. H. Risley, *Tribes and Castes of Bengal*, p. 375.

[৫৫] *Census of India 1881,* vol. I, part II (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1883), p. 73. ১৮৭২ থেকে ১৯৪১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, সেখানে যোগফল সংক্রান্ত ভুলের পাশাপাশি নানা ধরনের তথ্য বিভ্রান্তি রয়েছে। বিশেষত জাতিবর্ণগুলোর সর্বমোট জনসংখ্যার সাথে জেলাভিত্তিক/বিভাগভিত্তিক জনসংখ্যা যোগ করলে অনেকক্ষেত্রে মিল পাওয়া যায় না। যেমন, ১৯০১ সালে মেদিনীপুর জেলার চাষি কৈবর্ত (পুরুষ) এবং জেলে কৈবর্তের (পুরুষ) যোগফলের সঙ্গে সর্বমোট কৈবর্ত (পুরুষ) জনসংখ্যার গরমিল লক্ষ করা যায়। শুধু তাই নয়, শুমারি রিপোর্টে প্রদত্ত তথ্যগুলোর মধ্যে কখনো কখনো পরস্পরবিরোধী মন্তব্য বা স্ববিরোধ লক্ষ করা যায়। এসব দুর্বলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের জাতিবর্ণ সংক্রান্ত আলোচনায়

১৮৭২ সালের এই শুমারি রিপোর্টে বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংখ্যা ২০,৬৪,৩৯৪ জন।[৫৬] একই রিপোর্টে কৈবর্ত জাতির একটি প্রতিশব্দ ছিলো 'চাষা'। শব্দটি দিয়ে একটি পেশা বোঝালেও কৃষিজীবী কৈবর্তরা নিজেদের এই নামে পরিচয় দিতো এবং এর মাধ্যমে তারা নিজেদের জেলে কৈবর্তদের থেকে আলাদা করতো।[৫৭] এই রিপোর্টে কৈবর্তের আর একটি প্রতিশব্দ 'কেওট'। এই শব্দ দিয়ে জেলে বা জালিয়া কৈবর্তদের বোঝানো হতো।[৫৮]

১৮৭২ সালের আদমশুমারি পরিসংখ্যান থেকে কৈবর্তদের জনসংখ্যা মোটামুটি নিম্নরূপ: পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে চাষি কৈবর্তদের সংখ্যা ১১,০৮১, বর্ধমানে ৫৬,৭০২, বাঁকুড়াতে ১২,৬৪৪, মেদিনীপুরে ৬,৯২,১৪০, ২৪ পরগনায় ১,৮৩,৪৮৬, নদীয়াতে ১১,৪,৮৫৭, মুর্শিদাবাদে ১,০২,৫১৭, জলপাইগুড়িতে ২,৯৭০, পুরুলিয়ায় ৫৬,৩৫১, হুগলি (হাওড়া) ২,৮৮,৬২০, মালদাতে ২৭,৫৬৬ জন। এছাড়া আসামের কাছাড়ে ১,১১২, নওগাঁও-এ ১৩,৭৩৭, বিহারে ৬০,৬৪২, ঝাড়খণ্ডের ছোট নাগপুরে ৪,৩৭৪ জন কৈবর্ত এবং ওড়িশাতে ৪,৮৩,৪৯৩ জন চাষা। বাংলাদেশের সিলেটে ১,২৮,৫২৩, কুমিল্লায় ৫৩,৮৬৬, ফরিদপুরে ১৩,৫৪৯, বরিশালে ২৯,৩৪১, ময়মনসিংহে ৭৭,৭৯৮, চট্টগ্রামে ৩৬০২, নোয়াখালীতে ২,০২৬,০৩, যশোরে ৪৪,০০১, দিনাজপুরে ৩৮,৩০১, রাজশাহীতে ৬০,৪৪০, রংপুরে ৩৫,৩৯৬, বগুড়াতে ১৪,৮৩৩, পাবনায় ১৯,২৩৩, ঢাকায় ৩২,৩১৭ জন।[৫৯]

১৮৮১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে বাংলার মোট জনসংখ্যা ৬,৯৫,৩৬,৮৬১ জন,[৬০] এর মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা ৪,৫৪,৫২,৮০৬ যা মোট সংখ্যার ৬৫.৩৫%, মুসলমানদের সংখ্যা ২,১৭,০৪,৭২৪ জন যা মোট সংখ্যার ৩১.২১%, খ্রিস্টানদের সংখ্যা ১,২৮,১৫৩ জন যা মোট সংখ্যার ০.১৮%, বৌদ্ধদের সংখ্যা ১,৫৫,৮০৯ জন যা মোট সংখ্যার ০.২২%।[৬১] হিন্দুদের কৃষিজীবী অংশের মধ্যে কৈবর্তদের মোট সংখ্যা ২১,০০৩,৭৯ জন বা ৪.৬২%, এছাড়া চাষাদের

আদমশুমারির রিপোর্টগুলোর কোনো বিকল্প নেই। জনসংখ্যার যোগফল সংক্রান্ত একটি ত্রুটির জন্য দ্রষ্টব্য: *Census of India 1901,* vol. VIA, part II (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1902), p. 222.

[৫৬] *Report on the Census of Bengal 1872,* p. CXIX.

[৫৭] Ibid., p. 174.

[৫৮] Ibid., p. 174-177.

[৫৯] Ibid.

[৬০] *Census of India 1881* vol. I, part II (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1883), p. 43.

[৬১] Ibid., p. 73.

সংখ্যা ৫,৮৪,০৬১ জন বা ১.২৯%, জেলের সংখ্যা ৩,৮১,৫৪০ জন বা ০.৮৪% এবং কেওটদের সংখ্যা ২,৫৪,৮৭৮ জন বা ০.৫৬%।[৬২]

১৮৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে চাষি কৈবর্তদের সংখ্যা ৯,১২৯, বর্ধমানে ৫৬,৭২০, বাঁকুড়াতে ২৫,২৫০, মেদিনীপুরে ৭,৫৩,৪৩৫, ২৪ পরগনায় ১,৭৯,৭৫৮, হাওড়াতে ১,৫৫,৬৩৩, নদীয়াতে ১,২৬,০৬৩, মুর্শিদাবাদে ১,০০,৩৩৫, জলপাইগুড়িতে ৫,৮৩৮, পুরুলিয়ায় ৪৬,২৩১, মালদাতে ২৩,৫৫৬ জন। বাংলাদেশের ফরিদপুরে ২৬,০১০, বরিশালে ১৮,০০০, ময়মনসিংহে ৯৬,২১৭, চট্টগ্রামে ৪,৬৪২, কুমিল্লায় ৫০,১০৩, নোয়াখালীতে ১৬,১৫১, যশোরে ৩২,৫০৫, দিনাজপুরে ৩৭,৭৮৫, রাজশাহীতে ৬৩,১৩৪, রংপুরে ৩০,৬১২, বগুড়াতে ১৫,৫৬৬, পাবনায় ২৩,৩৯৬, ঢাকায় ৪০,৪২২ জন।[৬৩]

১৮৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী কৈবর্তদের সংখ্যা ২২,২৪,৭৮১ জন, এদের মধ্যে পুরুষ ১১,০৯,৮২৬, মহিলা ১১,১৪,৯৩৩ জন, নমঃশূদ্রের (দ্বিতীয় সর্বোচ্চ) সংখ্যা ১৭,৮১,৩৮৫ জন। এছাড়া চাষাদের সংখ্যা ৪,৬৮,৫০৯ জন, কেওটদের সংখ্যা ৩,১১,৮৫৬, জেলেদের সংখ্যা ৩,৯৫,৭৭৭ জন।[৬৪] অর্থাৎ চাষা, কেওট ও জেলে বাদ দিয়েও কৈবর্তদের সংখ্যা এখানে সর্বোচ্চ।

এইসব প্রতিবেদনে একটি পরিসংখ্যান বেশ গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কৈবর্তদের শতকরা হার। এতে এই সম্প্রদায়ের বসবাসের ভৌগোলিক অবস্থানও অনেকটা উপলব্ধি করা যায়।

বিভাগ অনুযায়ী প্রতি ১০০ জনে অর্থাৎ শতকরা হিসেবে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংখ্যা এই প্রতিবেদনে বর্ধমানে ৫৩.২০%, প্রেসিডেন্সি বিভাগে ২২.১১%, রাজশাহীতে ৮.৪০%, ঢাকাতে ৮.৪১%, চট্টগ্রামে ৩.৩৭%, পাটনাতে ০.০১%, ভাগলপুরে ৩.৭৪%, ওড়িশাতে ০.২৮%, ছোট নাগপুরে ০.২৮%, সামন্ত রাজ্যগুলোতে ০.১৪% জন।

জালিয়া বা জেলেদের শতকরা হারও প্রতিবেদনে আলাদাভাবে দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যায় বর্ধমানে ১৩.০৪%, প্রেসিডেন্সি বিভাগে ২৩.৮৯%, রাজশাহীতে ২২.০৪%, ঢাকাতে

---

[৬২] Ibid., p. 143.

[৬৩] H. H. Risley, *Tribes and Castes of Bengal*, p. 382.

[৬৪] The Lower Provinces of Bengal, Bihar and Orissa, *Census of India 1891*, vol. I, part I (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1893), pp. 2-14.

২৯.৬৬%, চট্টগ্রামে ৯.৫৫%, পাটনাতে ০.০২% ভাগলপুরে ০.৭৩%, ওড়িশাতে ০.০৩%, ছোট নাগপুরে ০.৮১%, সামন্ত রাজ্যগুলোতে ০.৬৯%।

একইভাবে এই প্রতিবেদনে কেওটদের শতকরা হার দেওয়া হয়েছে এভাবেঃ বর্ধমানে ১.৮২%, প্রেসিডেন্সি বিভাগে ০.১৪%, রাজশাহীতে ০.১১%, ঢাকাতে ০%, চট্টগ্রামে ০.১৪%, পাটনাতে ২১.৪৪%, ভাগলপুরে ২২.৮২%, ওড়িশাতে ৩৮.২৩%, ছোট নাগপুরে ১.৩০%, সামন্ত রাজ্যগুলোতে ১৩.৯৪%। এছাড়া চাষাদের শতকরা হার বর্ধমানে ০.০৬%, প্রেসিডেন্সি বিভাগে ০.৫১%, রাজশাহীতে ০.১৯%, ঢাকাতে ০.০২%, চট্টগ্রামে ০.১৭%, পাটনাতে ০%, ভাগলপুরে ১.২৫%, ওড়িশাতে ৭০.২৩%, ছোট নাগপুরে ০.১৩%, সামন্ত রাজ্যগুলোতে ২৭.৪০%।[৬৫]

১৮৯১ সালে আসামের আদমশুমারি অনুযায়ী কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংখ্যা ৬৭,৩২৪ জন, কেওট জাতিবর্ণের সংখ্যা ৯১,১২৯ জন, হালিয়া দাস ১,৪৩,৫৩৬ জন।[৬৬]

বাংলার বাইরে বিশেষ করে আসামে সবচেয়ে বড়ো জাতিবর্ণের নাম কলিতা। কলিতা জাতিবর্ণ ব্রহ্মপুত্রের তীরে বসবাস করে। কলিতা জাতিবর্ণও কৃষিজীবী এবং জেলে এ দুটি ভাগে বিভক্ত। কলিতাদের মতো কেওটদেরও প্রধান দুটি ভাগঃ হালিয়া (কৃষিজীবী) ও জালিয়া (মৎস্যজীবী) কেওট। কৃষিজীবী কেওটরা আসামের সব জায়গায় প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে।[৬৭]

তৎকালীন আসামের সিলেট, গোয়ালপাড়া, কাছাড়, কামরূপে অধিকাংশই মৎস্যজীবী কেওটেরা বসবাস করতো। ধারণা করা হয়, এ জেলাগুলোতে যারা রয়েছে তারা সম্ভবত বাংলা থেকে আসা অভিবাসী। কৃষিজীবী ও জেলে ছাড়াও কেওটদের অনেক উপবর্ণ রয়েছে। কামরূপে ৫৫৭ জন মালি কেওট এবং কিছু তেলি কেওট। নওগাঁও ও শিবসাগরে কুমার কেওট, দারাং ও শিবসাগরে ধোপা কেওট তবে এরা কেওটের সত্যিকার উপবর্ণ কিনা এ নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। তেজপুরে অহোম রাজার নিযুক্ত ধোপাদের সত্যিকার কেওট মনে করা হয়। মঙ্গলদই এলাকার সাধারণ ধোপারা ভুলবশত নিজেদের কেওট বলে থাকে। নওগাঁওয়ে কেওটদের বলা হয় সরু কেওট, একই জেলায় এদের একটা উপবর্ণ উত্তরী, যারা কৃষিজীবী।[৬৮]

---

[৬৫] Ibid., p. 136.

[৬৬] Ibid., p. 202.

[৬৭] Ibid., p. 208.

[৬৮] Ibid.

১৮৮১ থেকে ১৮৯১ সালের মধ্যে প্রায় সব জেলাতেই কেওটদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কামরূপের অনেক কেওট নিজেদের কৈবর্ত হিসেবে নাম লিখিয়েছে। কামরূপে ১৮৮১ সালে কেওটের সংখ্যা ছিলো ৫৩,২০৩ জন, ১৮৯১ সালে ৩২,২৩৯ জন। নওগাঁও জেলায় ১৮৮১ সালে ১৭,৮৯৬ জন, ১৮৯১ সালে ২০,৫৫৩ জন, এভাবে পুরো আসামে ১৮৮১ সালে কেওটদের সংখ্যা ছিলো ১,০৪, ২৭৫ জন এবং ১৮৯১ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯১,২২৯ জন। কেওটদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং বিধবা বিবাহ অনুমোদিত হলেও তখন এর চর্চা ছিলো না বলে জানা যায়।[৬৯] সিলেটে ১৮৮১ সালে এদের সংখ্যা ছিলো ১০,২৮৫ জন, ১৮৯১ সালে এ সংখ্যা ১,৪০,৯৯০ জন।[৭০]

১৮৯১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে বাংলার হিন্দু জাতিবর্ণগুলোর সামাজিক মর্যাদাক্রমের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়।[৭১] সেখানে ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে জাতিবর্ণগুলোর পর্যায়ক্রমে যে স্থান নির্দেশিত হয়, তা শুধু চাষি কৈবর্ত নয় সুবর্ণবণিক, যোগী এবং নবশাখ জাতিবর্ণের গুরুতর অসন্তোষের কারণ হয়। ঐ তালিকায় হালিক, জালিক এবং কৈবর্ত নামধারী সবাইকে একশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো এবং তাদের স্থান দেওয়া হয় সদ্গোপদের পরে। এ তালিকা থেকে চাষি কৈবর্ত জাতিবর্ণের শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ সচেতন হয় এবং মাহিষ্য নাম গ্রহণ ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করে।[৭২]

১৯০১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এর পরপরই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ ও দেশভাগের ঘটনা ঘটে, এর ফলে তৎকালীন ভারতের ভৌগোলিক এলাকা পুনর্বিন্যস্ত হয়। ১৯০১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার আরেকটি কারণ হলো বিভিন্ন জাতিবর্ণের নতুন পরিচয় তৈরি হওয়া। অর্থাৎ ১৮৯১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট প্রকাশিত হলে বিভিন্ন জাতিবর্ণের মধ্যে যে আন্দোলন শুরু হয় তা পুরোপুরি

---

[৬৯] Ibid.

[৭০] Ibid.

[৭১] "১. ব্রাহ্মণ, ২. কায়স্থ, ৩. বৈদ্য, ৪. বাড়ুই, ৫. তাম্বুলি, ৬. তেলি, ৭. কুমার, ৮. কামার, ৯. সঙ্করি, ১০. নাপিত, ১১. গন্ধবণিক, ১২. সদগোপ, ১৩. কাঁসারি, ১৪. মালাকার, ১৫. ময়রা, ১৬. তাঁতি, ১৭. কৈবর্ত, ১৮. গোপ (গোয়ালা), ১৯. সুবর্ণবণিক, ২০. বৈষ্ণব, ২১. কলু, ২২. ধোপা, ২৩. সুঁরি, ২৪. বাগদি, ২৫. ঢুলি, ২৬. জেলে, ২৭. তিয়র, ২৮. কয়রা, ২৯. হাড়ি, ৩০. চণ্ডাল, ৩১. মুচি।" *Report on the Census of the District of Hawrah* (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1893), p. 16.

[৭২] গোপালচন্দ্র সরকার, *মাহিষ্য-নামোদ্ধারের ইতিবৃত্ত* (কলকাতা: বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি, ১৯৯৭), পৃ. ৫।

সফল না হলেও কিঞ্চিৎ সফল হয় এবং তাদের আলাদা পরিচয় তৈরি হয়। যেমন – গোয়ালা থেকে সদ্গোপ, কৈবর্ত থেকে চাষি কৈবর্ত (মাহিষ্য) প্রভৃতি।

১৯০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলার মোট জনসংখ্যা ছিলো ৭,৮৪,৯৩,৪১০ জন, এদের মধ্যে হিন্দু ৪,৯৬,৮৭,৩৬২ জন, আবার হিন্দুদের মধ্যে কৈবর্তদের সংখ্যা ২৪,৮৪,৬৫৫ জন। এর মধ্যে চাষি কৈবর্তের সংখ্যা ১৯,৫৯,৫০৩ জন এবং জেলে কৈবর্তের সংখ্যা ২,৬৬,৫৪৯।[৭৩]

চাষি কৈবর্তরা নিজেদের জেলে কৈবর্তদের থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা বলে দাবি করে। যদিও তাদের সম্পর্কে সাধারণ ধারণা এই যে এ দুটি জাতিবর্ণ একই জাতিবর্ণ থেকে উদ্ভূত। মর্যাদার জন্য কৈবর্তদের এ লড়াইটা ব্রিটিশ কর্মকর্তারা সন্দেহের চোখে দেখে। রিপোর্টে দেখানো হয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এবং কৈবর্ত জাতিবর্ণ কৃষি এবং মৎস্য এ দুটি পেশায় বিভক্ত।[৭৪] রিজলির মতে, কৈবর্ত, কোচ, বাগদি, বাওরি এগুলো অনার্য জাতিবর্ণ এবং এদের মধ্যে কৈবর্তরা বল্লাল সেনের আনুকূল্য পেয়েছে। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, হিন্দুধর্মের চার বর্ণের মধ্যে সবাই নিজেদের দেখতে চায়, যেমন – কায়স্থরা ক্ষত্রিয় হতে চায়, শূদ্ররা বৈশ্য হতে চায় ইত্যাদি।[৭৫]

১৯০১ সালে বর্ধমান বিভাগের সর্বমোট কৈবর্তদের সংখ্যা ১৩,৩৩,৪৮৬ জন, এদের মধ্যে চাষি কৈবর্ত ১১,৮২,৬০৭ জন, জেলে কৈবর্ত ৫৬,৯৮৪ জন। বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত জেলাগুলো হলো বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া। বর্ধমান বিভাগের মেদিনীপুর জেলায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কৈবর্ত জাতিবর্ণের বসবাস। মেদিনীপুরে সর্বমোট কৈবর্ত ৮,৮৩,৪৯৪ জন, এর মধ্যে চাষি কৈবর্ত ৭,৯২,৭৩২ জন এবং জেলে কৈবর্ত ৩৪,৪৬৮ জন। এদের সংখ্যা গত দশকের তুলনায় ১১% বেড়েছে। কৈবর্তদের সংখ্যা কখনও বেড়ে যাওয়া আবার কখনও কমে যাওয়ার মূল কারণ হলো একেকটি এলাকায় এর একেক নামে অন্তর্ভুক্তি। যেমন কেওট বা চাষা যখন আলাদাভাবে দেখানো হয় তখন কৈবর্তদের সংখ্যা কমে যায়। ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে মালদার ২৬,০০০ হাওলাদার চাষিকে শুধু চাষি হিসেবে দেখানো হয়েছে। অবশ্য

---

[৭৩] *Census of India 1901,* vol. VIA, part II (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1903), p. 222.

[৭৪] *Census of India 1901* (Kolkata: Secretariat Press, 1903), p. 353.

[৭৫] Ibid., pp. 360-369.

১৮৯১ সালে এরকম অন্তর্ভুক্তি হয়নি, যে অংশটা নিয়ে সন্দেহ ছিলো তাদেরও কৈবর্ত হিসেবে ধরা হয়।[৭৬]

বর্ধমান বিভাগ ছাড়াও প্রেসিডেন্সি, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ভাগলপুর, ওড়িশা, ছোট নাগপুর বিভাগ ও সামন্ত রাজ্যসমূহে চাষি ও জেলে কৈবর্তদের বসবাস রয়েছে। ঢাকা বিভাগে সর্বমোট কৈবর্ত ২,৩৯,৮৭১ জন। ঢাকা বিভাগে চাষি কৈবর্তের থেকে জেলে কৈবর্তের সংখ্যা বেশি। ওড়িশা, এবং বিহারে কেওট সংখ্যায় প্রায় ৩,৭২,০০০ জন। এদের মধ্যে বাংলার কৈবর্তদের সাথে যাদের যোগাযোগ ছিলো তারা কৈবর্ত হয়েছে, এদের সংখ্যা প্রায় ৩.৬৮%। বাকি অংশটি যারা কেওট উপবর্ণ হিসেবে পরিচিত, তারা কেওট নামে আলাদা জাতিবর্ণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বিভিন্ন জাতিবর্ণ সম্পর্কে আদমশুমারি কর্তৃপক্ষের জনমিতিক তথ্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলেও জাতিবর্ণগুলোর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে, তা নিঃসন্দেহে সঠিক ও প্রশ্নহীন তা বলা যায় না। এক্ষেত্রে বাঙালি হিন্দুরা যারা তথাকথিত উচ্চ শ্রেণি তাদের প্রচলিত মতামত শুমারি কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বেশ মজার কিছু তথ্য সামনে এসেছে, যেমন, নবশাখের নিচের জাতিবর্ণগুলোর জন্য যে ব্রাহ্মণ নির্ধারিত তারা অধঃপতিত, তথাকথিত উচ্চবর্ণগুলো তাদের নিকট থেকে জল গ্রহণ করে না। চার বর্ণের নিচে এদের অবস্থান। ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ যারা কৈবর্তদের পৌরোহিত্য করে তারাও অধস্তন! প্রতিবেদনে এমন হাস্যকর তথ্যও পাওয়া যায়।[৭৭] এ রিপোর্টেই আরেকটি জায়গায় রয়েছে, চার বর্ণের চতুর্থ বর্ণ হলো চাষি কৈবর্ত ও গোয়ালা, এরা জল আচরণীয় কিন্তু এদের ব্রাহ্মণরা নয়। চাষি কৈবর্তরা নিজেদের মাহিষ্য বলে উচ্চ স্থানে দাবি করে। জেলে কৈবর্তরা তাদের থেকে আলাদা, চাষিরা এদের থেকে জল গ্রহণ করে না।[৭৮] অর্থাৎ এক দশক আগেও যারা একই জাতিবর্ণ ছিলো অর্থাৎ কৈবর্ত (চাষি ও জেলে), এক দশক পরে সেই চাষিরাই জেলেদের অস্পৃশ্য করে দিলো।

১৯১১ সালে মাহিষ্য জাতিবর্ণ তাদের আন্দোলনে সফলতা লাভ করে। চাষি কৈবর্তরা মাহিষ্য পরিচয় অর্জনের নেপথ্যে বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সময়ে মাহিষ্য ছাড়াও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, রাজবংশী প্রভৃতি জাতিবর্ণ অন্যান্য জাতিবর্ণ থেকে তাদের পৃথক

[৭৬] *Census of India 1901,* vol. VI (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1903), p. 391.

[৭৭] *Census of India 1901* (Kolkata: Secretariat Press, 1903), p. 369.

[৭৮] Ibid., p. 371.

জাতিসত্তার পরিচয় লাভ করে। ১৯১১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক প্রমাণ রয়েছে, সেটি হলো রেজুলেশন ৩৪৩৫।[৭৯] রেজুলেশনটিতে জাতিবর্ণগুলোর এ ধরনের উত্তরণকে খুব ভালো চোখে দেখা হয়নি, জাতিবর্ণগুলো সম্পর্কে শব্দ চয়ন দেখে অন্তত তাই মনে হয়। যেমন বলা হয়েছে, নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির প্রবণতা থেকে তাদের শিক্ষার মান প্রতিফলিত হয়। তাই কৈবর্ত, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র এবং রাজবংশীরা উন্নতি করতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়েরা এক্ষেত্রে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।[৮০] বাংলায় জাতিবর্ণে এ ধরনের প্রবেশ গ্রহণযোগ্য ছিলো না। কোনো অবহেলিত গোষ্ঠী এই চার বর্ণে প্রবেশ করতে চাইলে তাদের পূর্ব গোষ্ঠীগত নামেই প্রবেশ করতে হতো। প্রতিবেদকগণের মতে, আদমশুমারি রিপোর্টে মর্যাদার ভিত্তিতে কোনো শ্রেণিবিন্যাস ছিলো না, তাই তাঁরা মনে করেন শ্রেণি নির্ধারণগত যে সংকট ছিলো তা সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু একেবারেই নতুন নামে পরিচিত হওয়াটা তাদের কাছে ব্যতিক্রম বিষয় ছিলো। বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অনুমতিক্রমে এবং অন্য কোনো জাতিবর্ণ যদি এই নাম ব্যবহার না করে তার ভিত্তিতেই শুমারি কর্তৃপক্ষ তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছিলো।[৮১]

১৯১১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলায় মোট জনসংখ্যা ৪,৬৩,০৫,৬৪২ জন, এদের মধ্যে হিন্দু ২,০৯,৪৫,৩৭৯ জন। কৈবর্তদের সংখ্যা ২৫ লক্ষেরও বেশি, এই শুমারি রিপোর্টে তিন ধরনের কৈবর্তের বর্ণনা পাওয়া যায়, মাহিষ্য, জেলে কৈবর্ত এবং অন্যান্য কৈবর্ত। প্রথম দুটি জাতিবর্ণের সংখ্যা ২,৭১,০০০, অন্যান্য কৈবর্তের সংখ্যা ১,৭৫,০০০ জন। ১৯১১ সালের তথ্যানুযায়ী, কৈবর্ত জাতিবর্ণের মোট সংখ্যার ৫ ভাগের ৪ ভাগ মাহিষ্য, ৮ ভাগের ১ ভাগ জেলে কৈবর্ত। মেদিনীপুর জেলায় সবথেকে বেশি সংখ্যক কৈবর্ত ও মাহিষ্য বসবাস করে। মেদিনীপুর, হাওড়া ও ২৪ পরগনা এই তিন জেলায় কৈবর্ত জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি লোক বাস করে।[৮২]

---

[৭৯] "L.S.S. O'Malley, Superintendent of Census Operations, Bengal, issued a Resulation ordered by Governor in Council H.E. Samman. Resolution on the Report on the Census of Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim, 1911, General Department. Kolkata, 14th July 1913, Resulation no. 3435." "Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim," *Census of India 1911,* vol. V, part I (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1913), pp. 1-6.

[৮০] Ibid., p. 3.

[৮১] Ibid., p. 4.

[৮২] Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim, *Census of India 1911,* vol. V, part I, p. 511.

বাংলায় মাহিষ্য এবং জেলে কৈবর্তদের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিলো তা কলকাতার একটি পরিসংখ্যান থেকে অনুমান করা যেতে পারে। ১৯১১ সালে কলকাতায় মাহিষ্য ছিলো ৩১,৯৬১ জন। এদের মধ্যে শিক্ষিত ছিলো ৭,২২৪ জন, অশিক্ষিত ২৪,৭৩৭ জন। জেলে কৈবর্ত সর্বমোট ছিলো ৩,৮০০ জন, এদের মধ্যে শিক্ষিত মাত্র ৫২১ জন, অশিক্ষিত ৩,২৭৯ জন। সে সময়ে সর্বোচ্চ শিক্ষিতের হার ছিলো ব্রাহ্মণদের মধ্যে অর্থাৎ ১,০৭,০৯৯ জনের মধ্যে শিক্ষিত ৬১,২৭৬ জন এবং অশিক্ষিত ৪৬,৮২৩ জন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের তো বটেই মাহিষ্যদের থেকেও অনেক অনগ্রসর ছিলো এই জেলে কৈবর্তরা।[৮৩] বিহার ও ওড়িশাতে জেলে কৈবর্তদের কেওট বলা হয়।[৮৪] তবে মাহিষ্য ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের থেকে পিছিয়ে থাকলেও ১৯০১ সালের তুলনায় এগিয়ে ছিলো।[৮৫]

১৯১১ সালের আসাম রিপোর্টে কৈবর্ত জাতিবর্ণকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমত কৈবর্ত, দ্বিতীয়ত চাষি কৈবর্ত বা মাহিষ্য এবং তৃতীয়ত জেলে কৈবর্ত।[৮৬] মাহিষ্য এবং জেলে কৈবর্তের অধিকাংশই সিলেটে বসবাস করে।[৮৭]

চাষি কৈবর্তদের মাহিষ্য পরিচয় গ্রহণ করার ব্যাপারে শুমারি কর্তৃপক্ষ যে মন্তব্য করেছে তা অত্যন্ত শ্রুতিকটু। কোনো প্রতিবেদনেই সুবিন্যস্ত কোনো মন্তব্য নেই, তথ্যগুলো যত্রতত্র ছড়ানো, অগোছালো এবং কখনও কখনও পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, আবার স্ববিরোধী বক্তব্যও রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, ১৯১১ সালের আসাম রিপোর্টে বলা হয়েছে – কিছু কিছু সমস্যা তৈরি হয় যখন কেউ স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের উঁচু জাতিবর্ণ হিসেবে বর্ণনা করে এবং নতুন নাম দাবি করে। বাংলার চাষি কৈবর্তরা নিজেদের মাহিষ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, কিন্তু মাহিষ্য একটা নতুন নাম হওয়ায় অনেকে এতে বিভ্রান্ত হয়েছে। আবার সিলেটের বৃহৎ একটা দাস সম্প্রদায় এই নতুন নাম

[৮৩] City of Kolkata, *Census of India 1911,* vol. VI, part II-Tables (Kolkata: Bengal Secretariat Book Dopot, 1913), p. 26.

[৮৪] Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim, *Census of India 1911,* vol. V, part I (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1913), p. 233.

[৮৫] Ibid., p. 360.

[৮৬] Assam, *Census of India 1911,* vol. III, part I (Shillong: Assam Secretariat Printing Office, 1912), p. 124.

[৮৭] Ibid.

গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। ১৯০১ সালে নদীয়াল নামে পরিচিতি জাতিবর্ণ কৈবর্ত নামে নিজেদের পরিবর্তিত করেছে।[৮৮]

ঝাড়খণ্ডে কেওটরা কৈবর্তের একটা উপবর্ণ, ধীরে ধীরে এরা সাধারণ হিন্দুদের সাথে মিশে যায়। কামরূপে কেওট ও কৈবর্ত অভিন্ন। নদীয়ালরা কৈবর্ত নাম গ্রহণ করে কিন্তু কেওটরা করে না। শুধু সুরমা উপত্যকায় কৈবর্তদের দুটি ভাগ: চাষি এবং জেলে। বাংলায় হালিয়া দাসরাই প্রথমে মাহিষ্য নাম গ্রহণ করে। জাতিবর্ণটির দাবির ভিত্তিতে সিলেট সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, সমস্ত হালিয়া দাসরা মাহিষ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, চট্টগ্রাম ও সিলেট বাছাইয়ে বাদ পড়ে যায়। তবে পরবর্তী আদমশুমারিতে মাহিষ্য নামে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়।[৮৯]

১৯২১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী চাষি কৈবর্ত অর্থাৎ মাহিষ্যের সংখ্যা ২২,১০,৬৮৪ জন, জেলে কৈবর্ত বা আদি কৈবর্তের সংখ্যা ৩,৮৪,০৪৯ জন।[৯০] মজার বিষয় হলো মাহিষ্যরা নতুন পরিচিতি পেলেও ১৯২১ সালের আদমশুমারিতেও কর্তৃপক্ষ ভুলতে পারছেন না যে, মাহিষ্যরা পূর্বে চাষি কৈবর্ত ছিলেন। এ প্রতিবেদনে জাতিবর্ণের আলোচনায় চাষি কৈবর্ত (মাহিষ্য) শিরোনামে বলা হয়, চাষি কৈবর্ত এবং জেলে কৈবর্ত সম্পূর্ণ আলাদা এবং এদের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব চরম। সাবেক এই কৈবর্তদের প্রস্থান তুলনামূলকভাবে নতুন হলেও দাবি করছেন তাদের উৎপত্তি একেবারেই ভিন্ন উৎস থেকে এবং জেলেদের তুলনায় তারা উত্তম সামাজিক অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করেছে। নমঃশূদ্র (২০,০৬,২৫৯) এবং রাজবংশীদের (১৭,২৭,১১১) ছাড়িয়ে মাহিষ্যরা (২২,১০,৬৮৪) বাংলার সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিবর্ণ।[৯১]

---

[৮৮] Ibid., p. 116.

[৮৯] Ibid., p. 131.

[৯০] " The split between the Chasi Kaibarttas and Jalia Kaibarttas is now complete and the jealousy between the two is very great. The former now claim to be of totally different origin, though this is a comparatively new departure, and they certainly have established themsalves in a somewhat better social position than the latter. In numbers, 22,10,684, the Chasi Kaibarttas or Mahisyas are the largest Hindu caste in Bengal". Bengal, *Census of India 1921,* vol. V, part I (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1923), pp. 354-355.

[৯১] Ibid.

১৯৩১ এবং ১৯৪১ সালের শুমারির তথ্যও মাহিষ্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে সমর্থন করে। ১৯৩১ সালে বাংলাদেশে অন্যান্য হিন্দুদের মধ্যে মাহিষ্যদের সংখ্যা ছিলো ২৩,৮১,২৬৬ জন, নমঃশূদ্র ২০,৯৪,৯৫৭ জন, রাজবংশী ১৮,০৬,৩৯০ জন, কায়স্থ ১৫,৫৮,৪৭৫ জন এবং ব্রাহ্মণদের সংখ্যা ছিলো ১৪,৪৭,৬৯১ জন।[৯২]

১৯৪১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টেও অন্যান্য জাতিবর্ণের সাথে মাহিষ্য এবং কৈবর্ত জাতিবর্ণের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়।[৯৩] কিন্তু রহস্যজনকভাবে কৈবর্ত জনসংখ্যা এখানে হ্রাস পায়। যেখানে ১৯৩১ সালে মাহিষ্যদের সংখ্যা প্রায় ২৪ লক্ষ, সেখান দশ বছর পরেও তাদের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ হ্রাস পেয়ে হয় ১৮,৫২,৫১২ জন ।[৯৪]

বিভিন্ন ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ারে কৈবর্ত জাতিবর্ণের উল্লেখ রয়েছে। তবে সেগুলো মূলত আদমশুমারির তথ্যের উপর নির্ভর করেই লিখিত হয়েছে। গেজেটিয়ারগুলো থেকে সাধারণভাবে যে ধারণা পাওয়া যায় – কৈবর্ত জাতিবর্ণটি ভারত, ওড়িশা ও বাংলার কোনো কোনো স্থানে কেবট নামে পরিচিত। অযোধ্যা ও বিহারের কৈবর্তরা প্রায় সকলেই চাষি। ফৌজাবাদের মধ্যভাগ ও পূর্বাঞ্চলে কৈবর্তরা থাকে। তারা সকলেই চাষি। গোরখপুরের হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে কৈবর্তদের সংখ্যা অধিক এবং অধিকাংশই চাষি কৈবর্ত।[৯৫] মধ্যপ্রদেশের কৈবর্তরা মহানদী নামক নদী ও তার শাখা নদীতে এখনো মাছ ধরে। ওড়িষার সমুদ্রতীর ও পশ্চাদ্বর্তী নিম্নভূমিতে পূর্বে নৌকর্মজীবী ও মৎস্যজীবী কৈবর্তরা বাস করতো। পুরীতে কৈবর্তের বসবাস রয়েছে।[৯৬] সম্বলপুর, সোনপুর ও আসামেও কৈবর্তরা বসবাস করছে। কেবট ও কৈবর্ত জাতি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, কেবটেরা কৈবর্তদের তাদের চেয়ে ছোটো মনে করে। কালক্রমে তারা নিজেদের পৃথক জাতি হিসেবে পরিচয় দেয়।

---

[৯২] *Census of India 1931,* vol. V, part II (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1933), pp. 226-239.

[৯৩] বি আর আম্বেদকারের 'এনিহিলেশন অব কাস্ট' গ্রন্থের ভূমিকায় অরুন্ধতী রায়ের 'দ্য ডক্টর এন্ড দ্য সেইন্ট' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রয়েছে। সেখানে অরুন্ধতি একটি ভুল তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ১৯৩১ সালের পরের শুমারি রিপোর্টগুলোতে আলাদাভাবে জাতিবর্ণগুলোর বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। Arundhuti Roy, "The Doctor and the Saint," in B.R. Ambedkar, *Annihilation of Caste*, p. 28.

[৯৪] *Census of India 1941,* vol. IV, (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1942), pp. 6-10.

[৯৫] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, "কেবট-জাতি," সমর পাল সংকলিত, *কৈবর্ত জাগরণ*, পৃ. ৪২।

[৯৬] তদেব, পৃ. ৪০।

ইতিহাস এবং ব্রিটিশ উপনিবেশের বিভিন্ন দলিলপত্র পর্যালোচনা করে কৈবর্ত জাতিবর্ণ সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায়, তা হলোঃ প্রাচীন বাংলার বরেন্দ্র ও মেদিনীপুরে যে জনজাতিটি এক সময়ে রাজ্যশাসন করেছে, সেই জনজাতিটি যখন জাতিবর্ণে পরিণত হলো অর্থাৎ তাদের হিন্দুকরণ সম্পন্ন হলো, ঠিক তখনই তারা ব্রাহ্মণ্যবাদী ধারণার উচ্চ-নীচ সামাজিক মর্যাদার আওতায় এসে পড়লো।

ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা-দীক্ষায় সবচেয়ে এগিয়ে ছিলো ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ শ্রেণি। এজন্য তৎকালীন বাংলার সমাজ, সংস্কার, রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয় জানার জন্য ব্রিটিশরা নির্ভরশীল ছিলো এই তিনটি শ্রেণির উপর। এর ফলে এদের দৃষ্টিভঙ্গিই ব্রিটিশদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণত হয়। তাই প্রাচীন বাংলার এক সময়ের রাজারা ব্রিটিশদের চোখে হয়ে গেলো শূদ্র এবং তথাকথিত নিচু জাত। চাষি কৈবর্তদের শিক্ষিত অংশটি আন্দোলনের মাধ্যমে যখন মাহিষ্য পরিচয় অর্জন করলো, তখন তা ব্রিটিশদের কাছে প্রায় অগ্রহণযোগ্য একটা সমস্যা সৃষ্টি করলো। শেষ পর্যন্ত নতুন পরিচয়ের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলেও বিভিন্ন জাতিবর্ণের মর্যাদা বৃদ্ধির আন্দোলনকে ব্রিটিশরা যে ভালো চোখে দেখেনি তার প্রমাণ ব্রিটিশদের লিখিত গ্রন্থ এবং শুমারি রিপোর্টে বিভিন্ন জাতিবর্ণ সম্পর্কে তাদের নেতিবাচক মনোভাব। আদমশুমারি রিপোর্টগুলো থেকে কৈবর্ত জাতিবর্ণের উপর সুনির্দিষ্ট কোনো ধারণা না পেলেও এগুলো গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, এর থেকেই এই জাতিবর্ণের জনমিতি ও জঙ্গমতা সম্পর্কে সাধারণভাবে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

৬. সহায়ক গ্রন্থে কৈবর্ত

উনিশ-বিশ শতকে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের ইতিহাস গ্রন্থে কৈবর্ত জাতিবর্ণের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। এছাড়া উনিশ-বিশ শতকের বিভিন্ন অভিধান, ব্যাকরণ, বিশ্বকোষ প্রভৃতি বইয়েও কৈবর্ত জাতিবর্ণ সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়, যা জাতিবর্ণটি সম্পর্কে সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের মনোভাব প্রতিফলিত হয়। এ ধরনের বইগুলোতে কৈবর্ত সম্পর্কে যে মনোভাব প্রতিফলিত একে একে সেগুলোর সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।

বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ইতিহাস-গ্রন্থ নীহাররঞ্জন রায়ের ‘বাঙ্গালীর ইতিহাসঃ আদিপর্ব’ (১৯৪৯)। এই গ্রন্থটিতে কৈবর্ত জাতিবর্ণ সম্পর্কে বিশেষ বর্ণনা রয়েছে। কৈবর্ত সম্পর্কে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনাটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ

> পাল আমলে কৈবর্তদের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। বরেন্দ্রী কৈবর্তনায়ক দিব্য বা দিব্বোক পালরাষ্ট্রের অন্যতম সামন্ত কর্মচারী ছিলেন বলিয়া মনে হয়; অনন্তসামন্তচক্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও পালরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহপরায়ণ হইয়া রাজা দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করেন এবং বরেন্দ্রী কাড়িয়া লইয়া সেখানে কৈবর্তাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। বরেন্দ্রী কিছুদিনের জন্য দিব্য, রুদোক ও ভীম এই তিন কৈবর্ত রাজার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলো। এই ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, সমসাময়িক উত্তরবঙ্গ সমাজে কৈবর্তদের সামাজিক প্রভাব ও আধিপত্য, জনবল ও পরাক্রম যথেষ্ট ছিলো। বিষ্ণুপুরাণে কৈবর্তদের বলা হইয়াছে অব্রাহ্মণ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও সংস্কৃতি বহির্ভূত। মনুস্মৃতিতে নিষাদ পিতা ও অয়োগব মাতা হইতে জাত সন্তানকে বলা হইয়াছে মার্গব বা দাস। ইহাদের অন্য নাম কৈবর্ত। মনু বলিতেছেন ইহাদের উপজীবিকা নৌকার মাঝিগিরি। এই দুইটি প্রাচীন সাক্ষ্য হইতে বুঝা যাইতেছে, কৈবর্তরা কোনও আর্যপূর্ব কোম বা গোষ্ঠী ছিলেন, এবং তাঁহারা ক্রমে আর্যসমাজের নিম্নস্তরে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। ... ঐ সময়েও কৈবর্তদের সঙ্গে মাহিষ্যদের যোগাযোগের কোনও সাক্ষ্য উপস্থিত নাই এবং মাহিষ্য বলিয়া কৈবর্তদের কোনও দাবিও নাই, স্বীকৃতিও নাই। পরবর্তী পর্বে দাবি ও স্বীকৃতি পাওয়া যাইবে।[৯৭]

নীহাররঞ্জন রায় পাল পর্বের পরে কৈবর্ত-মাহিষ্য শিরোনামে একটি আলোচনায় দেখিয়েছেন ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ব্যাখ্যা থেকেই সমাজে কৈবর্ত ও মাহিষ্যদের এক ও অভিন্ন বলে স্বীকার করা হয়। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে পূর্ববঙ্গের হালিক দাস, পরাশর দাস এবং হুগলি, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের চাষি কৈবর্তরা নিজেদের মাহিষ্য বলে পরিচয় দেয়। আবার সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকার মৎস্যজীবী ধীবর ও জালিকরা নিজেদের কৈবর্ত বলে পরিচয় দেয়। তবে কালক্রমে কৈবর্তদের দুটি ভাগ রচিত হয় একটি প্রাচীন কালের মতো মৎস্যজীবী থেকে যায় আর একটা অংশ কৃষিবৃত্তি নিয়ে মাহিষ্য নামে পরিচিতি পায়।[৯৮]

বল্লাল সেনের শাসনামলে কৈবর্ত জাতিবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এ প্রসঙ্গে প্রচলিত একটি মন্তব্য এ রকম যে, বল্লাল সেন যোগী ও সুবর্ণ বণিকদের প্রতি

---

[৯৭] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব*, পৃ. ২২৮-২২৯।

[৯৮] তদেব, পৃ. ২৫০। নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষেও কৈবর্ত জতিবর্ণকে হালিক ও জালিক শিরোনামে বর্ণসংকর জাতি হিসেবে দেখানো হয়েছে। নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পা., *বিশ্বকোষ* (দিল্লী: বি আর পাবলিশিং কর্পোরেশন, ১৯৮৮), পৃ. ৪৯৫।

ক্রোধান্বিত হয়ে সমাজে তাদের অবস্থান অসৎ শূদ্র পর্যায়ে নামিয়ে দেন এবং কৈবর্ত, মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকারদের সৎশূদ্রে উন্নীত করেন।[৯৯]

১২২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বল্লালচরিত' গ্রন্থটি পূর্বখণ্ড এবং উত্তরখণ্ড এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে – এছাড়া একটি পরিশিষ্ট রয়েছে। পূর্বখণ্ডে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কুলীন ও অকুলীনদের কুলবিহিত কাজের নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। উত্তরখণ্ডে সুবর্ণবণিক, যোগী, কৈবর্ত, নাপিত প্রভৃতি সংকর বর্ণের বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।[১০০]

উত্তরখণ্ডে কৈবর্ত জাতির বর্ণনায় বলা হয়েছে, বল্লাল সেনের সময়ে কৈবর্তরা অস্পৃশ্য ছিলো। বল্লাল সেনের সাথে সুবর্ণবণিক ও যোগীদের শত্রুতার কারণে এসব জাতির কাজগুলো করানোর বিকল্প জাতি হিসেবে কৈবর্তদের সমাজে স্পৃশ্য করা হয়। বল্লালচরিত অনুযায়ী, পবিত্রতাসূচক বিভিন্ন চিহ্ন ধারণ করে তারপর তারা ব্রাহ্মণদের কাজের লোক হওয়ার উপযুক্ত হয়ে ওঠে।[১০১]

লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্যের 'স্বম্বন্ধ নির্ণয়' (১৮৭৫) বইয়ে কৈবর্তদের পরিচয় পাওয়া যায়। কৈবর্তরা কৃষিজীবী (দাস) এবং নৌজীবী (নাবিক) এ দুই ভাগে বিভক্ত। যারা কৃষিকাজ করে তারা হেলে কৈবর্ত (দাস) এবং যারা নৌজীবী তারা জেলে (নাবিক) হিসেবে পরিচিত। তাঁর মতে, কৈবর্ত জেলেরা জল আচরণীয় নয়। এদের জেলে বললে প্রচণ্ড রেগে যায় এবং নিজেদের মালো হিসেবে পরিচয় দেয় নমঃশূদ্র জেলেদের থেকে নিজেদের পৃথক করার জন্য।[১০২] রংপুর ও দিনাজপুরে খ্যান নামে একটি জাতি আছে যারা নিজেদের কৈবর্ত বলে পরিচয় দেয় কিন্তু প্রকৃত কৈবর্তরা এর বিরোধিতা করে।[১০৩] ঢাকা ও ময়মনসিংহে কৈবর্তরা পরাশর দাস নামে পরিচিত।[১০৪]

হিতেশরঞ্জন স্যান্যাল "বাংলায় 'জাতি'র উৎপত্তি" নামক একটি প্রবন্ধে তুঁতে কৈবর্ত জাতিবর্ণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মূলত তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলো কিভাবে বাংলার আদিম অধিবাসী বা জনজাতিগুলো হিন্দু জাতিবর্ণে পরিণত হয়েছে। দেশীয় জনজাতিগুলোর বিরোধিতার

---

[৯৯] ভবনাথ সরকার, *নাথধর্ম: সমাজ ও সংস্কৃতি* (২য় সংস্করণ; কলকাতা: গীতা প্রেস, ১৯৯২), পৃ. ৭৯।

[১০০] *বল্লালচরিত*, শশিভূষণ ভট্টাচার্য অনূদিত (কলকাতা: গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র, ১২২১), পৃ. ২২।

[১০১] তদেব, পৃ. ২৭।

[১০২] লালমোহন লিখেছেন 'চণ্ডাল জাতীয় জেলে'। তদেব, পৃ. ১৭৩।

[১০৩] তদেব।

[১০৪] তদেব।

সম্মুখীন হতে হয়েছিলো বাইরে থেকে ভারতে আসা আর্যদের।[১০৫] আর্যরা তাদের পরাজিত করে এবং বশে আনে। বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থে পরাজিত এবং দমিত জনগোষ্ঠীকে দস্যু এবং দাস বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি এবং জাতিগত বৈশিষ্ট্য এই দুই দিক থেকেই জনজাতিগুলো ছিলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্বাভাবিকভাবেই আর্য বিজেতারা এই জনজাতিগুলোকে মানিয়ে নিতে পারেনি। ফলে জনজাতিগুলোকে দস্যু ও দাস নাম দিয়ে একটি পৃথক শ্রেণিতে পরিণত করে তাদের নাম দেওয়া হলো শূদ্র, যা তৈরি করলো চতুর্থ বর্ণ। আর্যদের সেবকে পরিণত হলো এই শূদ্ররা। আর্য-অনার্য মিলিত ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাসে শূদ্রদের স্থান হলো সবার সর্বনিম্নে।

হিতেশরঞ্জন সান্যাল মনে করেন, হিন্দু সমাজের প্রভাব জনজাতিগুলোর উৎপাদন ও বণ্টনের পদ্ধতিগুলোকে পরিবর্তিত করে। পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়ায় জনজাতিগুলো পরিণত হলো হিন্দুসমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের জাতিবর্ণে। এই জনজাতিগুলোর অধিকাংশই হিন্দু জাতিবর্ণ হিসেবে কৃষিকাজ গ্রহণ করলো এবং জাতিবর্ণভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অঙ্গীভূত হলো। যেখানে জাতিবর্ণগুলোর পেশা ছিলো নির্দিষ্ট এবং বণ্টন ব্যবস্থা ছিলো নিয়ন্ত্রিত। রূপান্তরিত জনজাতিগুলোকে হিন্দুসমাজের সাংস্কৃতিক আদর্শ তথা ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈশিষ্ট্যগুলোকে গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলোকে কিছুটা পরিবর্তিত করার একটা প্রবণতা জনজাতিগুলোর মধ্যে দেখা যায়।[১০৬]

হিন্দু জাতিবর্ণে পরিণত হওয়া জনজাতিগুলোর অধিকাংশেরই সাধারণ পেশা হয়ে দাঁড়ায় চাষাবাদ বা কৃষিকাজ। এরা খাদ্য এবং অর্থকরী উভয়প্রকার শস্যই উৎপাদন করতো। কয়েকটি জাতিবর্ণ তুঁত এবং পান চাষে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলো। কৃষক সমাজে এই জাতিবর্ণগুলো বিশিষ্ট জাতিবর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলো। যেমন, পান চাষি বারুইরা অন্য কোনো শস্যের চাষ করে না এবং স্বতন্ত্র একটি জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশের অনেক এলাকায় তুঁত চাষি কৈবর্তগণ তুঁতে কৈবর্ত নামে পরিচিত, যেহেতু তারা তুঁত চাষে বিশেষজ্ঞ।[১০৭] তবে সকল কৃষক জাতিবর্ণগুলোই বাংলার প্রধান ফসল ধান চাষ করতো। হিতেশরঞ্জন সান্যালের মতে, রেশম গুটি চাষ করা তুঁতে কৈবর্তরাও ধান চাষ করতো।

---

[১০৫] হিতেশরঞ্জন সান্যাল, "বাংলায় 'জাতি'র উৎপত্তি," শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত সম্পা. *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ* (দিল্লি: আইসিবিএস, ১৯৯৮), পৃ. ১৯।

[১০৬] তদেব, পৃ. ২৩।

[১০৭] তদেব, পৃ. ২৪।

অতুল সুর নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ পদ্ধতিতে কৈবর্ত জাতির ইতিহাস জানার চেষ্টা করেছেন। যদিও নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে কোনো জাতির অতীত উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। তারপরও জাতিবর্ণগুলোর উৎস সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা যায়। কৈবর্ত জাতিবর্ণের নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ হলো শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক সংখ্যা ৭৭.৫, নাসিকা সূচক সংখ্যা ৭৬.৬ এবং দেহ-দৈর্ঘ্য ১৬২৯ মিলিমিটার।[১০৮] বিরজাশঙ্কর গুহ কর্তৃক গৃহীত পরিমাপ হচ্ছে শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক সংখ্যা ৭০-৮৭, নাসিকা সূচক সংখ্যা ৬৩-১০৩ এবং দেহ-দৈর্ঘ্য ১৪৯০-১৭৭৬ মিলিমিটার। অন্যান্য জাতিবর্ণের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় কৈবর্ত ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের বিস্তৃত-শিরস্কতা অনেক কম, কিন্তু নাক বেশি প্রসারিত এবং দেহ-দৈর্ঘ্য গোয়ালাদের তুলনায় কৈবর্তদের কম, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আরও কম। যদিও রাজবংশীদের নাক কৈবর্তদের সঙ্গে সমানভাবে প্রসারিত তারপরও তাঁরা কৈবর্তদের থেকে দেহ-দৈর্ঘ্যে অনেক খাটো। অতুল সুরের মতে, গোয়ালা, কৈবর্ত ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা একই শ্রেণিভুক্ত।[১০৯]

উনিশ-বিশ শতকে বিভিন্ন শ্রেণির লেখকগণের মনোলোকে জাতপাতের চেতনা খুব প্রবলভাবে বর্তমান থাকতো। তাঁদের চেতনায় শুধু জাতপাতের ধারণাই ছিলো তা নয়, সেই জাতপাতের ধারণায় উঁচুনিচু বা মর্যাদা-অমর্যাদার ভাবও থাকতো। আর সেখানে অবনত মর্যাদাধারীদের প্রতীক হিসেবে কৈবর্তের উল্লেখ থাকতো।

সংস্কৃত অভিধান ‘শব্দকল্পদ্রুম’ (১৮৫৬)-এ কৈবর্ত শব্দটি পাওয়া যায়। এর অর্থ করতে গিয়ে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে স্বনামখ্যাত বর্ণসংকর জাতি, ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান। পরবর্তী কালে দাশ, ধীবর ও জালিক নামে পরিচিত। এই অভিধানে ‘দাশ’ শব্দটির অর্থ করা হয়েছে ধীবর এবং ‘ধীবর’ ও ‘জালিক’ শব্দটির অর্থ করা হয়েছে কৈবর্ত।

রামমোহন রায়ের ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’ (১৮৩৩) গ্রন্থে লিঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে কৈবর্ত শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণ দিতে গিয়ে রামমোহন কৈবর্তের স্ত্রীলিঙ্গ করেছেন কৈবর্তিনী।[১১০] একই উদাহরণ পাওয়া যায় শ্যামাচরণ সরকারের ‘বাঙ্গলা ব্যাকরণ’ (১৮৫৭) বইটিতে।[১১১]

---

[১০৮] অতুল সুর, *বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়* (কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৭), পৃ. ৪৫।

[১০৯] তদেব, পৃ. ৪৯।

[১১০] রামমোহন রায়, *গৌড়ীয় ব্যকরণ* (কলকাতা: হিন্দু কলেজ, ১৮৩৩), পৃ. ১৬।

[১১১] শ্যামাচরণ সরকার, *বাঙ্গলা ব্যকরণ* (কলকাতা: পি. এস. জি রোজারিও, ১৮৫৭), পৃ. ৩০।

নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর বিশ্বকোষে কৈবর্ত জাতিবর্ণের বর্ণনা দিয়েছেন। এখানেও কৈবর্ত জাতিবর্ণকে বর্ণসংকর জাতি হিসেবে দেখানো হয়েছে। এদের প্রধান দুটো শ্রেণি: এক শ্রেণি হালিক ও অন্য শ্রেণি জালিক কৈবর্ত নামে পরিচিত।[১১২]

বাংলা বিশ্বকোষে কৈবর্ত জাতিবর্ণকে একটি সংকর বর্ণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা হয়েছে, পূর্বে কৈবর্তেরা ছিলো অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী। স্মৃতি ও পুরাণের বরাত দিয়ে এখানে বলা হয়, কৈবর্ত ও মাহিষ্যেরা ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান। মাছ ধরা ও বিক্রি করা তাদের পেশা। লেখা হয়, বর্তমানের ন্যায় অতীতেও কৈবর্তেরা হালিক ও জালিক এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিলো।[১১৩]

৭. বাংলা সাহিত্যে কৈবর্ত

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন লেখক কৈবর্ত জাতিবর্ণ সম্পর্কে লিখেছেন। এতে স্থান পেয়েছে কৈবর্তদের পরিচয়, কৈবর্ত সমাজ, সামাজিক অবস্থান এবং জীবনসংগ্রাম। বিভিন্ন সময়ে রচিত এসব সাহিত্যে লেখকগণ কৈবর্ত সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন তা থেকে কৈবর্তদের এক ধরনের আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে কৈবর্ত জনগোষ্ঠী কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, বিশেষভাবে লেখকগণ এই জনগোষ্ঠীকে কতোটা জনজাতি বা জাতিবর্ণ হিসেবে চিত্রিত করেছেন, তাদের আর্থসামাজিক স্বাতন্ত্র্য কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং এই জনগোষ্ঠী কী কী পেশার সঙ্গে জড়িত তা এই অংশের মূল আলোচ্য।

বাংলা সাহিত্যে কৈবর্তদের কখনো প্রাচীন বাংলার আদি জনজাতি হিসেবে, কখনো রাষ্ট্র পরিচালনাকারী শাসক হিসেবে, কখনো শ্রেণিসংগ্রামের দ্বন্দ্বে লিপ্ত শোষিত কৃষক হিসেবে, আবার কখনো সাধারণ জেলে হিসেবে দেখানো হয়েছে।

---

[১১২] নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ (দিল্লী: বি আর পাবলিশিং কর্পোরেশন, ১৯৮৮[১৮৮৬-১৯১১]), পৃ. ৪৯৫।

[১১৩] খান বাহাদুর আবদুল হাকিম সম্পা., *বাংলা বিশ্বকোষ: দ্বিতীয় অধ্যায়* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫), পৃ. ১৭৫।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মধ্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত চণ্ডীমঙ্গলে কৈবর্তের উল্লেখ রয়েছে। তৃতীয় দিবসের নিশা পালার ১৩৬ নম্বর গীতিতে বিভিন্ন জাতির বর্ণনায় পাওয়া যায়, মৎস্য বেচে চষে চাষ, কৈবর্ত, ধীবর, দাস।[১১৪]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মধ্যে উপন্যাসগুলোতেই কৈবর্তদের অধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), মাঝির ছেলে (১৯৬০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সন্দীপন পাঠশালা' (১৯৪৬), অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬), সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' (১৯৫৭), সত্যেন সেনের 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' (১৯৬৯), সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহীন গাঙ' (১৯৮০), মহাশ্বেতা দেবীর 'কৈবর্ত খণ্ড' (১৯৯৪), ঘনশ্যাম চৌধুরীর 'অবগাহন' (২০০০), শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গঙ্গা একটি নদীর নাম' (২০০১), হরিশংকর জলদাসের 'জলপুত্র' (২০০৮), 'দহনকাল' (২০১০), 'মোহনা' (২০১৩), জাকির তালুকদারের 'পিতৃগণ' (২০১১), প্রশান্ত মৃধার 'জল ও জালের তরঙ্গ' (২০১৪), মহী মুহাম্মদের 'ময়নাদ্বীপ' (২০১৪) প্রভৃতি উপন্যাসে কৈবর্তজীবন নানা ভাবে চিত্রিত হয়। উপন্যাসগুলোতে কৈবর্ত চরিত্রই কেন্দ্রীয় চরিত্র। অপ্রধান চরিত্র হিসেবে কৈবর্তদের উল্লেখ রয়েছে যেসব উপন্যাসে সেগুলোর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত' (১৮৮২), অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাশেম' (১৯৪৯) উল্লেখযোগ্য। কৈবর্তদের নিয়ে রচিত ছোটগল্পের সংখ্যাও প্রচুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি ছোটগল্পে অপ্রধান কৈবর্ত চরিত্র রয়েছে। ১৯৫৭ সালে অজ্ঞাতনামা লেখকের 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' নামে একটি ঐতিহাসিক নাটক পাওয়া যায়। এখানে যে কাহিনী পাওয়া যায় তা সত্যেন সেনের 'বিদ্রোহী কৈবর্ত'-এর কাহিনীর অনুরূপ। যদিও রচনাকাল বিচারে তা সত্যেন সেনের উপন্যাসের পূর্ববর্তী।

কৈবর্তদের আর্যপূর্ব একটি জনজাতি বা কৌম হিসেবে চিত্রিত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায় কয়েকটি উপন্যাসে। এগুলোর মধ্যে সত্যেন সেনের 'বিদ্রোহী কৈবর্ত', মহাশ্বেতা দেবীর 'কৈবর্তখণ্ড', এবং জাকির তালুকদারের 'পিতৃগণ' এবং হরিশংকর জলদাসের 'মোহনা' উল্লেখযোগ্য। এসব উপন্যাসের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো সবগুলো উপন্যাসই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত। এগুলোর পটভূমি অভিন্ন এবং প্রধান চরিত্রগুলোও প্রায় অভিন্ন। তবে উপন্যাসের কাহিনী ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্নতা রয়েছে।

---

[১১৪] সুকুমার সেন সম্পা., *চণ্ডীমঙ্গল* (নয়াদিল্লীঃ সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৭৫), পৃ. ৮১।

যুদ্ধে পারদর্শী কৈবর্তদের বর্ণনা দিতে গিয়ে সত্যেন সেন 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' উপন্যাসে কৈবর্তদের যেভাবে চিত্রিত করেন; তাতে মনে হয়, সমকালের একাধিক কৌমের মধ্যে কৈবর্তও একটি কৌম। যেমন –

> দূর অতীতে একদিন যারা এমনি ভীম গর্জনে বনভূমি কাঁপিয়ে শিকারের পিছন পিছন ধাওয়া করতো, প্রতিদ্বন্দ্বী কৌমের উপর রণ উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ত, এরাতো তাদেরই বংশধর। সেই সুদূরের স্মৃতি কি ওদের মধ্যে এতদিন সুপ্ত হয়ে ছিল, আজ হঠাৎ প্রবল নাড়া পেয়ে জেগে উঠেছে।[১১৫]

এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী কৌম শব্দের মধ্যে কৈবর্তদের কৌম পরিচয় লুকিয়ে আছে। একটি কৌম কিভাবে ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়, তার বর্ণনাও এই উপন্যাসে আছে। তাঁর বর্ণনা থেকে মনে হয়, প্রাচীন কালে কৈবর্তরা হিন্দু বা বৌদ্ধ কোনোটাই ছিলো না। উপগুপ্ত চরিত্রের মুখ দিয়ে লেখক বিষয়টি চিত্রিত করেছেন এভাবে –

> বরেন্দ্রীভূমিতে কৈবর্ত ও কোচদের মধ্যে আমরাই প্রথম ধর্মপ্রচার শুরু করি। আমরা প্রথমে কৈবর্তদের দেবতা ও ভ্রান্ত সংস্কারগুলোকে অপসারিত করতে চেষ্টা করতে লাগলাম, চাইলাম ওদের মনকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিতে। আমি মনে করি এইটাই শুদ্ধ পথ। এর পরে এল হিন্দু প্রচারকেরা। তারা কিন্তু আমাদের এই পথ দিয়ে গেল না, ওরা ওদের নিজস্ব পথ ধরল। ওদের যে সমস্ত আদিম দেবদেবী ও ধর্মস্থান ছিল হিন্দু প্রচারকেরা স্বচ্ছন্দে তাদের স্বীকার করে নিয়ে সেইখানেই তাদের বসবার জায়গা করে নিল। তারপর ক্রমে ক্রমে তাদের উপর হিন্দুয়ানীর রং লাগিয়ে নিঃশব্দে আত্মসাৎ করে নিল। দেবদেবীর সঙ্গে সঙ্গে তাদের পূজকরাও দলে দলে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে লাগল।[১১৬]

এখানে দেখা যাচ্ছে কৈবর্ত জনজাতি লৌকিক দেবদেবীর পূজা করতো। এর বদলে হিন্দুরা ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে পৌরাণিক দেবদেবীর পূজা প্রচলন করার মধ্য দিয়ে কৈবর্তদের হিন্দুতে পরিণত করছে। প্রাচীন জনজাতিগুলোর স্বতন্ত্র সংস্কৃতি বোঝাতে গিয়ে লেখক কিছু লৌকিক দেবদেবীর পূজা অনুষ্ঠানের চিত্র উপস্থাপন করেছেন।

মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী সত্যেন সেন তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসকে দেখেছেন শ্রেণিসংগ্রামের নিরিখে। কিভাবে শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি জনজাতি নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে – বিষয়টি দেখানোই হয়তো তার উদ্দেশ্য ছিলো। তাই তিনি কৃষিজীবী কৈবর্তদের উপকরণ

---

[১১৫] সত্যেন সেন, *বিদ্রোহী কৈবর্ত* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৬৯), পৃ. ৫৯।

[১১৬] তদেব, পৃ. ৭২।

হিসেবে বেছে নিয়েছেন এবং পাল রাজাদের মধ্য দিয়ে সুবিধাভোগী শাসক শ্রেণিকে আর কৈবর্তদের মধ্য দিয়ে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত মানুষের সংগ্রামী রূপকে দেখিয়েছেন। নিজেদের ভূমি, ফসল, রীতিনীতি নিয়ে ব্যস্ত সহজ সরল একটি জনজাতিকে যখন বারবার বৈষম্যের শিকার করা হয়, ঠকানো হয়, এক সময়ে যখন তারা জেগে ওঠে তখন তারা হয়ে ওঠে দুর্বার। বিদ্রোহী কৈবর্তের মধ্য দিয়ে লেখক এই শোষিতের সংগ্রামকেই দেখিয়েছেন। জীবন সংগ্রামে লিপ্ত এই জনজাতিটি শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী পাল সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে বরেন্দ্রে স্বাধীন কৈবর্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

আদি জনজাতিগুলোর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ। কৈবর্তরা যে আদি জনজাতি ছিলো মহাশ্বেতা দেবীর 'কৈবর্তখণ্ড' উপন্যাসেও তা চিত্রিত হয়েছে। সরাসরি জনজাতি না বললেও কৈবর্তদের রাজধানী ডমরনগরের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তাতে এই জনগোষ্ঠী জনজাতি বৈশিষ্ট্যই ফুটে ওঠে। রামপালের মাতুল মথনদেব ও কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সেই ধরনের চিত্র পাওয়া যায় –

> – ডমরনগর বিন্যাসে বলুন বা যে সব গ্রাম ধ্বংস করতে করতে এসেছেন সেখানেই বলুন, তন্তুবায়জীবী, কর্মকার, কুম্ভকার, কাংস্যকার, তৈলকার, সূত্রধার এদেরও দেখেছেন।
>
> – হ্যাঁ হ্যাঁ, কাপড়, লোহার জিনিস, হাড়ি-কলস, বাসনপত্র, তেল, কাঠের জিনিস, মানুষের যা যা লাগে!
>
> – ধীবরজালিকরা মৎস্যজীবী, মোদক মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে, তাম্বুলি পান বেচে, শৌণ্ডিক সুরা তৈরি করে, গোয়ালা, নাপিত, ধোপা ইত্যাদি ইত্যাদি, বুঝলেন?
>
> – হ্যাঁ ... বড়ো বড়ো গ্রাম, বা গ্রামমণ্ডলী স্বয়ংসম্পূর্ণ। ঢালাও জল ব্যবস্থা, চাষবাস বারো মাস।[১১৭]

মহাশ্বেতা দেবীর বর্ণিত জনজাতি যে পরবর্তীকালের হালিক ও জালিক কৈবর্ত সেটি এই উপন্যাসের ভূমিকায় স্পষ্টতা পায়। যেমন –

> যে কৈবর্তরা বিদ্রোহের প্রধান শক্তি ছিলেন, তাঁরা হালিক বা চাষি এবং জালিক বা মৎস্যজীবী। এঁরা যদি পরাজিত না হতেন, তাহলে নগর রচনা, জীবনবৃত্ত, শিল্প, সংস্কৃতি সব কিছুর একটি

[১১৭] *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র*, 'কৈবর্তখণ্ড,' (খণ্ড ২১, কলকাতা: দে'জ পাবলিশার্স, ২০১৬), পৃ. ৩১৫-৩১৬।

> একান্ত দেশজ রূপ দেখা যেত ভাবতে ভালো লাগে। যে দেশজ রূপ ক্রমেই ব্যাপ্ত ভাবে বিকশিত হতো, তা হতো বাংলার মাটি থেকে জাত।[১১৮]

কৈবর্তখণ্ডের এই ভূমিকা পড়ে মনে হয় কৈবর্তদের সম্পর্কে মহাশ্বেতা দেবী অতি উচ্চ মনোভাব পোষণ করতেন।

কৈবর্তদের নিয়ে উপন্যাস রচনায় সত্যেন সেন এবং মহাশ্বেতা দেবীর উত্তরাধিকারী বলা যায় জাকির তালুকদারকে। তাঁর উপন্যাস 'পিতৃগণ'। তিনিও কৈবর্তদের জনজাতি হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তাঁর রচনায় দেখা যায় কৈবর্তদের রয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম; গ্রামে রয়েছে চাষের জমি, নানা রকম ফসলের মাঠ, খাল-নদীর মাছ, উৎসব-পার্বণ প্রভৃতি।[১১৯] কৈবর্ত জনজাতির পেশা উল্লেখ করতে গিয়ে তাদের মৎস্যজীবিতা ও কৃষিজীবিতা উল্লেখ। যেমন –

> আমরা এখন নদী সেঁচে মাছ আনি, জঙ্গল টুকে টুকে মধু আনি, কাঠ আনি, শিকার আনি, মাঠ মাঠে মুগ-মসুর-শর্ষে ফলাই। আর ধান ফলাই। কত রকম ধান! ওগরা আছে, শালি ধান আছে, তারপর আছে অঞ্জনলক্ষ্মী, আগুনবান, আন্ধারকুলি, আমপাবন, আমলো, আসতির, ককচি, কনকচূড়, গুজুড়া, গোহোম, কামরঙ, কোটা, খড়কি, কেসুরকেলী, কৈজুড়ী, ছায়ারত্ন, ছিছরা, গুয়াথুপী, গয়াবালি, চন্দনসাল, কোঙরভোগ, জলরাঙ্গি।[১২০]

লেখক কৈবর্ত জনজাতির প্রতিবেশী হিসেবে রাজবংশী (কোচ) এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের (পোদ) বরেন্দ্রের আদি অধিবাসী হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন –

> বাসখুড়ো জানিয়েছিল কৈবর্তদের মতো কোচ আর পোদ-রাও এই মাটির আদি সন্তান। কাজই মাঝির এই আশীর্বাদ আসলে এক ভূমিপুত্রের জন্য আরেক ভূমিপুত্রের শুভকামনা।[১২১]

কৈবর্তদের তিনি কোল, ভিল কোচদের মতো প্রান্তিক বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন, কৈবর্তরা কোল, ভিল ও কোচদের মতো মাটিতে ঘুমায়।[১২২] কৈবর্তরা নানা রকম লোকসংস্কারে বিশ্বাসী, লৌকিক দেব-দেবীর পূজা করে প্রভৃতি। এসব বর্ণনা থেকে মনে হয়, লেখক জাকির তালুকদার

---

[১১৮] তদেব।

[১১৯] জাকির তালুকদার, *পিতৃগণ* (ঢাকা: রোদেলা, ২০১১), পৃ. ৪৫।

[১২০] তদেব, পৃ. ১৯২।

[১২১] তদেব, পৃ. ১৮৫।

[১২২] তদেব, পৃ. ৯৫।

কৈবর্তদের অনেকটা সমকালীন বাংলাদেশের আদিবাসী সাঁওতাল, ওরাউঁ, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর আদলে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসে সর্বপ্রথম জেলে কৈবর্তদের উপস্থাপন করা হয়েছে। 'পদ্মানদীর মাঝি'-তে লেখক বিত্তহীন জেলেদের জীবন ও সমাজবিন্যাসকে উপস্থাপন করেছেন। জেলে পাড়ার ভৌগোলিক বর্ণনার মধ্য দিয়ে সমাজে তাদের অবস্থানের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা তাদের আত্মপরিচয়ের অংশ। বর্ণনা প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন –

> পূর্বদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই। কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথম দেখিলে মনে হয় এ বুঝি তাহাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তারপর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়। স্থানের অভাব এ জগতে নাই। তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই ওদের ওই টুকুই।[১২৩]

জেলে জীবনের চরম বাস্তবতা সামাজিকভাবে হেয় হয়ে থাকা। তাই লেখকের কাছে এই চিত্রটি এ রকম –

> 'দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়। ... গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্র মানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়। বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে কনকন। আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ন। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়। আর দেশী মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ঐ ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।[১২৪]

'পদ্মানদীর মাঝি'তে লেখক জেলে কৈবর্তদের এই বিত্তহীনতাকে স্পষ্ট করতে গিয়ে লেখেন, তারা গরিবের মধ্যে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশি ছোটলোক।[১২৫] আর সেই সাথে জেলে

---

[১২৩] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পদ্মানদীর মাঝি,' *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস* (ঢাকা: অবসর, ১৯৯৫), পৃ. ৩২৯।

[১২৪] তদেব, পৃ. ৩২৯-৩৩০।

[১২৫] তদেব, পৃ. ৩২৯।

কৈবর্তদের চরিত্রের সাথে কতগুলো বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছেন। যেমন, খুব স্বচ্ছন্দে তারা মিথ্যা কথা বলে, চুরি করে, অশ্লীল রসিকতা করে।[১২৬]

কৈবর্ত চরিত্র চিত্রণ বিষয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা আলাদা। অদ্বৈতের কৈবর্ত চরিত্র এ ধরনের হীনতা ও অনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকে না। তাঁর লেখনীতে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতায় বন্দী বঞ্চিত ও বিড়ম্বিত মালোসমাজের চিত্র ফুটে ওঠে।[১২৭] এখানকার কৈবর্তরাও দরিদ্র, কিন্তু তারা চুরি করে না; শোষিত কিন্তু মিথ্যা বলে না। তিতাস যখন শুকিয়ে যায় তখন কৈবর্ত যুবকেরা নানা রকম প্রলোভনে 'বাবু' সংস্কৃতির নষ্ট ফাঁদে পা দেয় বটে, তবে নিজেদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করার প্রয়াসও লক্ষ করা যায়।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসে কৈবর্ত নারীর পরিচয় সবচেয়ে স্পষ্টতা পায়। মানিক যেখানে কপিলার মতো রহস্যময়ী বা মালার মতো ভাগ্যবিড়ম্বিত সাধারণ নারীর চিত্র তুলে ধরেছেন, সেখানে অদ্বৈত কৈবর্ত নারীর যে বিপ্লবী চিত্র আঁকেন, তার মধ্যে গোটা কৈবর্ত সমাজের সংগ্রামী জীবনধারাকে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।[১২৮]

সুবলের স্ত্রীকে উদয়তারা ও তার সঙ্গীরা পেটায়, তাই লজ্জায় অপমানে সে ঘরের ভেতর নিজেকে বন্দি করে রাখে। তাকে দেখার জন্য সবাই ঘরে উঁকি দেয়। একদিন মঙ্গলার বউ তাকে দেখে বলে, ঘর থেকে না বেড়ানোর জন্য পাড়ার শিক্ষিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা তাকে নোংরা অপবাদ দেয়, যা মালোরাও বিশ্বাস করে। কিন্তু সুবলের স্ত্রী দমে যাবার পাত্র নয়। লেখকের বর্ণনায় –

> 'মহনের মা, এই গাঁওয়ের মাইয়া আমি, বিয়া হইছে এই গাঁওয়ে। আমি নি ডরাই বাজাইরা লোকেরে গো।'
>
> মঙ্গলার বউ বলে, 'তুমি মাইয়া মানুষ, তুমি কি করতে পার ভইন।'
>
> আমি সব পারি, আর কিছু না পারি আগুন লাগাইয়া গাঁও জ্বালাইয়া দিতে পারি।'
>
> 'গাঁওয়ের এক ঘরে আগুন লাগলে সহস্রেক ঘর পুড়া যায়। বাজাইরা পাড়া যেমুন পুড়ব মালোপাড়াও পুড়ব। তোমার ঘর পুড়ব, আমার ঘর পুড়ব। তারা যেমুন মরব, আমরাও তো মারা যামু ভইন।'

---

[১২৬] তদেব, ৩২৯, ৩৩১, ৩৪১, ৩৪৩।

[১২৭] অদ্বৈত মল্লবর্মণ, 'তিতাস একটি নদীর নাম,' *অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০০), পৃ. ৪১০।

[১২৮] তদেব, পৃ. ১৩৮।

'অপমানের বাঁচনের থাইক্যা সম্মানের মরণও ভালো দিদি।'[১২৯]

সমস্ত অন্যায়-অত্যাচার, নির্যাতন ও বৈরী শক্তির বিরুদ্ধে জেলে নারীরা কী করতে পারে তার অসাধারণ চিত্র ফুটে উঠেছে অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে। পাশাপাশি এই উপন্যাসের চরিত্রগুলোকেও শ্রেণিসচেতন হিসেবে চিত্রিত করা হয়।

ঘনশ্যাম চৌধুরীর 'অবগাহন' উপন্যাসে মালতী চরিত্রটি কৈবর্ত নারীর পরিচয়কে নতুন মাত্রা দান করে। ভাইয়ের খুন, পিতার বার্ধক্য, নিজের অসহায়তা – সবকিছু মালতীর মধ্যে এক ধরনের পরিবর্তন ঘটায়। সে তার অসহায়ত্বকে জয় করে। এই পরিবর্তন মালতীকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এবং সে ডোমপাড়ার চাঁদাবাজদের ঠেকিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, মানিক, বাঞ্ছারাম প্রভৃতির সাহায্যে তাদেরকে বাজার ছাড়া করে। এককথায় উপন্যাসে মালতী চরিত্রটি আত্মবলে বলীয়ান, স্বাবলম্বী এবং প্রতিবাদী এক জেলে নারীর চিত্র তুলে ধরে।

মালতীর এই চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত মধ্যবিত্ত জেলে নারীর চিত্র পাওয়া যায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গঙ্গা একটি নদীর নাম' উপন্যাসে। লেখকের বর্ণনায় –

> এত বড় জ্যান্ত সংসার। বড় বড় নাতি-নাতনি ঘোরাফেরায় অত বড় উঠোনটা দখল করে রাখে সারাদিন। যুধিষ্ঠির ইলিশের মেজো ছেলের বউ যে বড়ই দজ্জাল এ তল্লাটে জানার কারও বাকি নেই। তার ওপর যেমনি ঢ্যাঙা – তেমনি মোটা। আড়ে বহরে বড় শরীরটা নিয়ে যখন জায়েদের সঙ্গে ঝগড়া করতে নামে উঠোনে – তখন খুঁটোয় বাঁধা গাই গরুটা অব্দি ছিঁড়ে পালাবার চেষ্টা করে।[১৩০]

লেখক ভেদে কৈবর্ত পরিচয়ের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অনেক সময়ে অভিন্ন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন ঘটে। যেমনটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বেলায় লক্ষণীয়।[১৩১] 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের অনুকরণে জীবনের শেষদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন 'মাঝির ছেলে' উপন্যাসটি। উভয় উপন্যাসের মধ্যে চিত্রিত কৈবর্তের পরিচয় অনেক সময়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থাকে তুলে ধরে।

---

[১২৯] তদেব, পৃ, ২২৩।

[১৩০] শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, *গঙ্গা একটি নদীর নাম* (কলকাতাঃ বুকফ্রন্ট, ২০০১), পৃ. ৩৫।

[১৩১] স্বরোচিষ সরকার, "মানিক বন্দোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে নিম্নশ্রেণীর চরিত্র," *বাংলা একাডেমি পত্রিকা, কার্তিক-চৈত্র* ১৩৯৪ (১৯৮৭), পৃ. ৯২।

'পদ্মানদীর মাঝি'-তে বিত্তহীন জেলে চরিত্রগুলো বাস্তব অবস্থার মতোই নিরীহ ও গোবেচারা। সমাজের বহু অন্যায় অবিচারকে তারা প্রতিবাদহীন অবস্থায় মেনে নেয়। কুবের সারারাত জেগে মাছ ধরে। এত পরিশ্রমের উপার্জনের ভাগ ধনঞ্জয় প্রতারণা করে নিয়ে নেয়। এটা বুঝতে পেরেও কুবেরের কিছু করার থাকে না। বরং সে বিনীতভাবেই বলে, 'ভাবলাম তোমারে বুঝি চালান বাবু ঠকাইছে'।[১৩২] শীতল কুবেরের কাছ থেকে মাছ নেয় ঠিকই কিন্তু মাছের দাম পরিশোধ করে না। এ ঘটনায় কুবের মনে মনে শীতলবাবুকে গালি দিলেও শেষ পর্যন্ত সহ্য করে।

কিন্তু 'মাঝির ছেলে' উপন্যাসে জেলেদের ভিন্ন পরিস্থিতির চিত্র মেলে। এখানে কুবেরের ভূমিকায় আমরা যাকে দেখতে পাই তার নাম নাগা। কুবের ধনঞ্জয়ের মিথ্যাকে সহজভাবে মেনে নিলেও নাগার চরিত্র সত্যে আপোসহীন, তাই পরেশের মিথ্যা অভিযোগ সহ্য করতে না পেরে নাগা তাকে মারতে আরম্ভ করে দেয়। কুবেরের মধ্যে না থাকলেও নাগা চরিত্রে এভাবে শ্রেণিসচেতনতা লক্ষণীয়।[১৩৩]

জেলে কৈবর্তদের নিয়ে রচিত আরেকটি উপন্যাস সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহীন গাঙ'। উপন্যাসটি সুন্দরবন অঞ্চলের মৎস্যজীবী মালো সম্প্রদায়ের জীবন সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে রচিত। এতে রয়েছে বিত্তহীন জেলে সমাজের বাস্তব সংকটের ইতিহাস। এ উপন্যাসে কৈবর্তদের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রথা, আচার-আচরণ, রীতিনীতি, পূজা-পার্বণ, উৎসব, নৃত্যগীতি আর জীবনচর্চার নানা দিক ফুটে উঠেছে।[১৩৪] বস্তুত তিনি কৈবর্ত সমাজের খুব ভেতরের খবর পরিবেশন করেছেন। তাই তাঁর লেখায় এই সমাজের লোকাচার ও লোকধর্মের কথা যেমন আছে, তেমনি আছে ব্যক্তিজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক সংকট ও সম্পর্কের কথা।

এই উপন্যাসে কৈবর্ত সমাজের অধিকার সচেতনতার চিত্রও পাওয়া যায়। দেখা যায় প্রকৃতি ও মানুষের শোষণ প্রক্রিয়ার কাছে উপন্যাসের নায়ক শ্রীপদ আত্মসমর্পণ করে না। শোষণের বিরুদ্ধে, চক্রান্তের বিরুদ্ধে, কখনো কখনো প্রকৃতির বিরুদ্ধেও সে প্রতিবাদ করে।[১৩৫]

---

[১৩২] 'পদ্মানদীর মাঝি,' *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পৃ. ৩২৯।

[১৩৩] মানিক বন্দোপাধ্যায়, *মাঝির ছেলে* (কলকাতা: ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ১৯৬০), পৃ. ২৪।

[১৩৪] সাধন চট্টোপাধ্যায়, *গহীন গাঙ* (কলকাতা: ভাবনা, ১৯৯৬), পৃ. ১২।

[১৩৫] তদেব, পৃ. ৬৩।

অধিকার সচেতনতার পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের রাজনীতি প্রসঙ্গ উঠে এসেছে ঘনশ্যাম চৌধুরীর 'অবগাহন' উপন্যাসে। নদীভিত্তিক জেলেদের অন্যান্য উপন্যাসগুলো থেকে এর বৈচিত্র্য বিষয়বস্তুগত। জেলেদের জীবনে জীবিকার সংগ্রামের পাশাপাশি রাজনীতি সম্পৃক্ততা স্থান পেয়েছে এই উপন্যাসে।

সমুদ্রভিত্তিক জেলে কৈবর্তদের নিয়ে উপন্যাস রচনায় পথিকৃৎ বলা যায় হরিশংকর জলদাসকে। তাঁর রচিত 'জলপুত্র' এবং 'দহনকাল' এ দুটি উপন্যাসে উঠে এসেছে জেলে কৈবর্তদের অভিনব পরিচয়। সেখানে সামুদ্রিক জেলেদের সংগ্রামী জীবন, দারিদ্র্য, নারীদের সাহস, শোষণের হাহাকার, অশিক্ষার অন্ধকার, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি প্রসঙ্গ।

'জলপুত্র' উপন্যাসে সমুদ্রে সমাধি নেওয়া স্বামীর অবর্তমানে সন্তান ও সংসারের দায়িত্ব নিতে সাহসী কৈবর্ত নারী ভুবনেশ্বরী। বেঁচে থাকার জন্য মাছ বিক্রি করে সংগ্রাম চালায়। তার একমাত্র ছেলে গঙ্গাও মাছ ধরা শুরু করে। কিন্তু অধিকার সচেতন হওয়ার জন্য সুবিধাভোগী সমাজের লোকেরা তাকে হত্যা করে। কিন্তু তারপরও 'হার না মানা' ভুবনেশ্বরীর চোখের দৃষ্টিতে থাকে আগামীর জন্য প্রতীক্ষা।[১৩৬]

বাংলাদেশের হিন্দু সমাজব্যবস্থায় সব কৈবর্ত যেমন জেলে নয়, সব জেলেও কৈবর্ত নয়; আবার সকলের পেশাও ঐতিহ্যিকভাবে সুনির্দিষ্ট – এ বিষয়ে হরিশংকরের রচনায় দু-একটি অসঙ্গতি চোখে পড়ে। যেমন – এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "মাছ ধরা তাদের পেশা হলেও প্রধানতম পেশা নয়। এদের আছে জমিজিরাত। এরা হালিক কৈবর্ত। হালিক কৈবর্তরা হালচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে মাছ ধরার পেশাও তারা ত্যাগ করেনি।"[১৩৭] বাস্তবে হালিক কৈবর্তদের পেশা মাছ ধরা নয়, জালিক কৈবর্তরাই শুধু মাছ ধরার কাজে যুক্ত থাকে। এছাড়া 'কৈবর্তকথা' (২০০৯) উপন্যাসে কৈবর্ত এবং নমঃশূদ্রকে অভিন্ন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৩৮] বাস্তবে এরা আলাদা দুটি জাতিবর্ণ।

বাংলা সাহিত্যে কৈবর্তদের পেশা মূলত মৎস্যজীবিতা – মাছ ধরা, মাছ বিক্রি করা ইত্যাদি। কয়েকটি উপন্যাসে কৃষিজীবিতাকেও পেশা হিসেবে দেখা যায়। কৈবর্তদের পূর্ব পেশা পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক অন্যান্য পেশা যুক্ত হতেও দেখা যায়।

---

[১৩৬] হরিশংকর জলদাস, *জলপুত্র* (চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা: মাওলা ব্রাদ্রার্স, ২০০৮), পৃ. ১২৮।

[১৩৭] হরিশংকর জলদাস, *দহনকাল* (দশম মুদ্রণ, ঢাকা: মাওলা ব্রাদ্রার্স, ২০১০), পৃ. ২৯।

[১৩৮] হরিশংকর জলদাস, *কৈবর্তকথা* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদ্রার্স, ২০০৯), পৃ. ৭১।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সন্দীপন পাঠশালা’ উপন্যাসটি ‘উদয়াস্ত’ শিরোনামে প্রথমে ‘কৃষক’ (১৯৪৬) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণে কেন্দ্রীয় চরিত্রটি চাষি কৈবর্ত। চরিত্রচিত্রণটি চাষি কৈবর্ত সমাজের মনঃপূত না হওয়ায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মাহিষ্যদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দানের কথা ছিলো, কিন্তু মাহিষ্যরা এর বিরোধিতা করে। শুধু তাই নয়, ১৯৪৯ সালের ১০ই এপ্রিল হাওড়ার একটি সভা থেকে ফেরার পথে গাড়িতে তারাশঙ্করকে আক্রমণ করা হয়। আর এ ঘটনাই উপন্যাসটিকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা এনে দেয়। পরবর্তী কালে তারাশঙ্কর উপন্যাসটি পুনরায় লেখেন। বই আকারে প্রকাশের সময়ে চরিত্রটির মাহিষ্য পরিচয় বদলে যায়, পরিবর্তে চরিত্রটি চাষি সদ্‌গোপ হয়ে হয়। উপন্যাসের প্রথম অংশটি প্রায় অবিকৃত আছে, শেষ অংশটি পরিবর্তিত ও নতুন চরিত্রও সংযোজিত হয়েছে।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সীতারাম কৃষকের সন্তান। যদি সে পিতৃপেশা না নিয়ে বেছে নেয় জ্ঞান ও বিদ্যার জগৎ এবং সে শিক্ষক হতে চায়।[১৩৯] তবে সাধারণ হিন্দু সংস্কার অনুযায়ী কৈবর্ত সমাজের পেশা শুধুমাত্র কৃষিকাজ। ফলে অন্যান্য শ্রেণির হিন্দুরা তাকে শিক্ষকতা পেশায় আসতে দেয় না।

সত্যেন সেনের ‘বিদ্রোহী কৈবর্ত’ উপন্যাসে কৈবর্তদের চাষি বা কৃষিজীবী হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। একইভাবে মহাশ্বেতা দেবীর ‘কৈবর্তখণ্ড’ উপন্যাসেও কৈবর্তদের প্রধানত কৃষিজীবী হিসেবে দেখানো হয়েছে। তবে তাঁর রচনায় দুই এক জায়গায় মৎস্যজীবী কৈবর্তদেরও উল্লেখ রয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্রগুলোকে তিনি কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। যেমন, ভীমের বাল্যবন্ধু বিদুরের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন –

> বিদুর উচ্চাকাঙ্ক্ষী নন, রাজবৃত্তের লোক নন। ভীমের বাল্যবন্ধু, স্বগোত্র যখন, তখন কোনো আত্মীয়তা থেকে থাকবে। তিনি মহত্তর, সম্পন্ন গৃহস্থ এবং কৈবর্তপাড়ায় প্রধান। তিনি এখনও লাঙল ধরে মাঠে নামেন, বীজবপনের আগে ক্ষেত্রপূজা করেন। ধান গোলায় উঠলে গোলাপূজা করেন।[১৪০]

এই উপন্যাসের একটি জায়গায় কৈবর্তের বর্ণনা রয়েছে –

---

[১৩৯] *তারাশঙ্কর রচনাবলী*, ‘সন্দীপন পাঠশালা’ (কলকাতা: মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৭৫), পৃ. ৩।

[১৪০] *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র*, ‘কৈবর্তখণ্ড,’ পৃ. ৩০০।

> হালিক, যারা লাঙল চষে, আর জালিক, যারা নৌকা চালায়, মাছ ধরে, প্রধানত তাদের ডিঙ্গি করে এমন অপ্রতিরোধ্য সেনাবাহিনী গড়ে তোলা চারটিখানি কথা নয়।[১৪১]

জাকির তালুকদারের 'পিতৃগণ' উপন্যাসে কৈবর্তদের চাষি বা কৃষিমজুর হিসেবে দেখানো হয়েছে। নিজেদের শ্রম, ঘাম পায়ে ফেলে কিভাবে কৈবর্তরা ফসল ফলায় তার চমৎকার একটি উদাহরণ
রয়েছে –

> ... এমনিতেই কৈবর্তরা কাজে ফাঁকি দিতে জানে না। চাষের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে তাদের নাড়ির সম্পর্ক। চাষের কাজ পেলে, মাটি ও শস্য সম্ভাবনার কোনো চিহ্ন দেখতে পেলেই তারা তার সাথে একাত্ম হয়ে পড়ে। যে জমিতে কাজ করছে, সেটি নিজের জমি না অন্যের জমি তা নিয়ে মাথা ঘামানোর বিন্দুমাত্র অবসর তাদের থাকে না। তারা তখন পৃথিবী ও মৃত্তিকার উপাসনায় মগ্ন।[১৪২]

জেলে কৈবর্তদের নিয়ে রচিত উপন্যাসগুলোতে জেলেদের দুইভাগে ভাগ করা যায়। এক. নদীভিত্তিক জেলে, দুই. সমুদ্রভিত্তিক জেলে। নদীভিত্তিক জেলেদের নিয়ে রচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি,' মাঝির ছেলে, অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম,' অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাশেম,' সমরেশ বসুর 'গঙ্গা,' সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহীন গাঙ,' ঘনশ্যাম চৌধুরীর 'অবগাহন,' শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গঙ্গা একটি নদীর নাম' প্রশান্ত মৃধার 'জল ও জালের তরঙ্গ,' মহী মুহাম্মদের 'ময়নাদ্বীপ' উল্লেখযোগ্য। শুধুমাত্র সমুদ্রভিত্তিক জেলেদের নিয়ে 'জলপুত্র,' ও 'দহনকাল' উপন্যাস ও 'জলদাসীর গল্প' নামে একটি ছোটগল্প রচনা করেছেন হরিশংকর জলদাস।[১৪৩]

জেলে কৈবর্তদের নিয়ে রচিত উপন্যাসগুলোতে জেলেপল্লি জেলেদের জীবনযাত্রা ও সমাজ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। জেলেদের মূলত দরিদ্র হিসেবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের নৈতিকতা বর্জিত ও শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। বেশিরভাগ লেখকদের দৃষ্টিতে এ সমাজে রুচি ও আদর্শের কোনো বালাই নেই।

---

[১৪১] তদেব, পৃ. ৩১৬।

[১৪২] জাকির তালুকদার, *পিতৃগণ*, পৃ. ৭৪।

[১৪৩] সেলিনা হোসেনের 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' (১৯৮৬) উপন্যাসের পটভূমিও সামুদ্রিক জেলেদের নিয়ে রচিত। সেলিনা হোসেন, 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি,' *উপন্যাসত্রয়ী* (ঢাকা: পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স, ২০১০)।

মহাশ্বেতা দেবীর 'কৈবর্ত খণ্ড' উপন্যাসে কৈবর্ত নারী কাঞ্চনাকে যেভাবে পতিতা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, তাকেও খানিকটা বাস্তবতাবর্জিত বলে মনে হয়। কারণ কৃষক বা মৎস্যজীবী পরিবারের মেয়েরা সাধারণত পরিশ্রমী হয় এবং পারিবারিক পেশায় বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করে। তাই কাঞ্চনাকে কৈবর্ত নারীর প্রতিনিধি করাটা সঙ্গত হয়েছে কি-না, তা বিচার্যের বিষয়। এখানে বরং হিন্দু শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়, যেখানে কৈবর্ত নারী পতিতার সঙ্গে তুলনীয়।[১৪৪]

মহাশ্বেতা দেবীর এ দৃষ্টিভঙ্গির চূড়ান্ত প্রয়োগ পাওয়া যায় সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসে। উপন্যাসের নায়িকা হেমা মাছ বিক্রির ফড়েনি অর্থাৎ জেলেদের কাছ থেকে মাছ কিনে শহরে বিক্রি করে।[১৪৫] কিন্তু তার আরও একটি পেশার উল্লেখ পাওয়া যায়, সে শহুরে ধনী লোকের বাড়িতে রক্ষিতা হিসেবে থাকে। তার মা-দিদিমাও একই কাজ করতো। কিন্তু নির্যাতনের শিকার হয়ে সে বাড়ি ফিরে আসে এবং দিদিমার সাথে মাছ বিক্রির পেশায় যুক্ত হয়।

ঘনশ্যাম চৌধুরীর 'অবগাহন' উপন্যাসেও দেখা যায় মৎস্যজীবীরা যুগপৎ মাছ ধরে এবং মাছ বিক্রি করে। জাতগুলোর পেশাবিন্যাস অনুযায়ী এই চিত্র খানিকটা অস্বাভাবিক। কারণ মালোরা মাছ ধরে ঠিকই কিন্তু বিক্রি করে অন্যান্য জাতি, যেমন কাঁড়ার, নিকারি প্রভৃতি।[১৪৬] উপন্যাসে দেখা যায় দারিদ্র্যের মুখে পড়ে জেলে নারী মালতী জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্যের কাছ থেকে কেনা মাছ বাজারে বেচে। একমাত্র উপার্জনকারী ভাই পরেশ খুন হলে নিরুপায় হয়ে সে বাজারে মাছ বিক্রি করা শুরু করে। বাজারের হৈ হট্টগোল ছাপিয়ে মালতীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে ক্রেতাদের কাছে।[১৪৭]

জেলেদের পেশাগত পরিবর্তন ও সামাজিক জঙ্গমতার চিত্র পাওয়া যায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গঙ্গা একটি নদীর নাম' উপন্যাসে। সেখানে জেলেরা যে মৎস্যপেশা বাদ দিয়ে ভিন্ন পেশা গ্রহণ করছে এর উদাহরণ তিনি সৃষ্টি করেছেন হাজরা হালদার চরিত্রটির মাধ্যমে। জেলে কৈবর্ত হাজরার জীবন কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে উপন্যাসটি। ভাগীরথীর তীরে কালীনগর গ্রাম। এই

---

[১৪৪] রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, *প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্* (কলকাতাঃ ইলেকট্রমেশিন প্রেস, ১৯০৯), পৃ. ৩৮১-৩৮২। এখানে কৈবর্ত নারী এবং পতিতার সংসর্গকে সমান অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়, যা কৈবর্ত নারীর জন্য অসম্মানজনক।

[১৪৫] সমরেশ বসু, *গঙ্গা* (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৭, কলকাতাঃ মৌসুমী প্রকাশনী, ১৯৭৪), পৃ. ১৩২।

[১৪৬] H. H. Risley, *Tribes and Castes of Bengal*, p. 426.

[১৪৭] ঘনশ্যাম চৌধুরী, *অবগাহন* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০০০), পৃ. ১৩৯।

গ্রামের একজন জেলে হাজরা হালদার। প্রকৃতির ধ্বংসলীলা ও অর্থনৈতিক চাপে সে পিতৃপুরুষের পেশা ছাড়তে বাধ্য হয়। তার মাছ ধরার জাল ছেঁড়া, নৌকা মেরামতের অভাবে ভেঙে যায়। ফলে মৎস্যপেশা বাদ দিয়ে হাজরা কাজ শুরু করে চাঁদ হোসিয়ারিতে। ৮টি কুকুর ও ২৮০টি বুলবুলি পালন করে সে সংসার চালায়। বাড়িতে তার স্ত্রী, সাত মেয়ে ও এক ছেলে। ঋণ করে সে তার পাঁচ মেয়ের বিয়ে দেয়। গঙ্গায় মাছ ধরে সে ঋণ শোধও করে দেয়। কেতকী নামে তার একটি অবিবাহিত মেয়ে আছে যে আয়ার কাজ করে। আর সবার ছোট মেয়েটি কাপড়ে জরি বসানোর কাজ করে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আধুনিক মৎস্যজীবী কৈবর্ত সমাজের পেশাগত জঙ্গমতার মাধ্যমে কিভাবে সামাজিক জঙ্গমতা পরিবর্তিত হয় তার চিত্র অঙ্কন করছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসে সীতারামও যে কৃষি পেশা ছেড়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করে, সেটাও পেশাগত জঙ্গমতার একটি উদহারণ।[১৪৮] সীতারামের বাবার ইচ্ছা, যেহেতু সে চাষি, তাই তার ছেলে চাষিই হবে। সীতারাম তা মানতে নারাজ। জেলে কৈবর্ত পাড়ায় সে পাঠশালা খোলে। তার স্বপ্ন কৈবর্তদের একজনকে অন্তত লেখাপড়া শিখিয়ে সত্যিকারের মানুষ করে তুলবে।

কিন্তু সীতারাম বুঝতে পারে বাস্তবতা অনেক কঠিন। কৈবর্তদের লেখাপড়া পাঠশালাতেই শেষ। এটা তাদের নেহাত শখের ব্যাপার। বারো তেরো বছর বয়স হলেই হাল গরু নিয়ে চাষ শুরু করে, আর জেলে কৈবর্তরা জাল ঘাড়ে নিয়ে মাছধরা ব্যবসায় লেগে যায়।[১৪৯] রত্নহাটায় জেলেদের লেখাপড়ার প্রয়োজন হয় পুকুর বা নদীর জলকর জমা, নামসই আর দলিল পড়ার জন্য। তাই বাধ্য হয়ে পাঠশালায় যায়। এমন কঠিন বাস্তবতার মধ্যেও সীতারাম শিক্ষকতা পেশা ছেড়ে কৃষিকাজে ফিরে যায় না।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক লেখকগণও সাধারণ মানুষ বোঝাতে কৈবর্ত পদবিধারীদের উল্লেখ করেন। হুমায়ূন আহমেদ 'ফেরা', '১৯৭১' 'মধ্যাহ্ন' প্রভৃতি উপন্যাসে বাংলাদেশের জেলে জীবনের নির্যাতন, বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। হুমায়ূনের উপন্যাসে চিত্রিত জেলে জীবন ধারাবাহিকভাবে বিভাগপূর্ব, বিভাগপরবর্তী ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের। হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসে জেলেদের 'কৈবর্ত' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। '১৯৭১' উপন্যাসে জেলে জীবনের যে চিত্র

---

[১৪৮] *তারাশঙ্কর রচনাবলী*, 'সন্দীপন পাঠশালা,' পৃ. ৩।

[১৪৯] তদেব, পৃ. ৮৪।

পাওয়া যায় তা পূর্ব পাকিস্তানের জেলে জীবনকে প্রতীকায়িত করে। 'ফেরা' ১৯৮৩ সালে রচিত ও ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের কাহিনি ১৯৪৮ সালের কাছাকাছি সময়ের।

'ফেরা' উপন্যাসের আমিন ডাক্তারের মূল কাহিনীর সঙ্গে স্থানীয় কৈবর্তদের কাহিনী যুক্ত রয়েছে। স্থানীয় জেলেদের বাদ দিয়ে বহিরাগত জেলেদের দিয়ে জলমহালের মাছ ধরায় নিজাম সরকার। স্থানীয় জেলেরা এ বঞ্চনা মানতে না পেরে তারা মাঝি নরহরি দাসের নেতৃত্বে বহিরাগতদের উপর হামলা করে। এ হামলায় দুইজন বহিরাগত জেলে মারা যায়। '১৯৭১' উপন্যাসে প্রায় একই রকম ঘটনা দেখা যায়। উপন্যাসের ঘটনাস্থল ময়মনসিংহের নীলগঞ্জ। দুটি ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে এ উপন্যাসে স্থানীয় কৈবর্তদের জীবন সংগ্রামের একটি গল্প রয়েছে। এর একটি হলো নীলগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা এবং অন্যটি তাদের সংগ্রামশীল জীবন।

এই উপন্যাসে জেলেদের কাহিনীটি অগ্রসর হয়েছে হতদরিদ্র চিত্রা বুড়ি ও মনাকে কেন্দ্র করে। মনার স্ত্রীর সঙ্গে চিত্রা বুড়ির ছেলে 'খারাপ কাজ' করার কারণে মনা চিত্রা বুড়ির ছেলেকে খুন করে। গ্রামের জমিদার নীলু সেনের কাছে চিত্রা বুড়ি নালিশ করেও কোনো বিচার পায় না। থানাওয়ালারাও বুড়িকে উল্টো হুমকি দেয়। চিত্রা বুড়ি সকল প্রভুর কাছে ছেলে হত্যার বিচার চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অবশেষে প্রার্থনা করে দেবীর কাছে। কৈবর্তরা সকলেই মাছ ধরতে যায় কিন্তু বুড়িকে নেয় না। বুড়ি আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে কিছুদিন। তারপর জীবিকার তাগিদেই সে ভিক্ষা করা শুরু করে। চিত্রা বুড়ির ছেলের খুনি মনা অবশ্য রেহাই পায় না। গ্রামে মিলিটারি ঢোকে। চিত্রা বুড়ি তাদের কাছে নালিশ করলে জনমনে ভীতি সৃষ্টির লক্ষ্যে পাকিস্তানি সৈন্যরা মনা কৈবর্ত আর তার ছোটো ভাই বীরুকে নির্মমভাবে হত্যা করে।[১৫০]

উপন্যাসে জেলেদের গল্প এখানে শেষ হয় না। খান সেনাদের চরম নৃশংসতার বলি হয় জেলেরা। নীলগঞ্জ গ্রামে মুক্তিবাহিনী তালাশ করে না পেয়ে বারবার ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তারা জানতে পারে মূল গ্রামের বাইরে কৈবর্ত পাড়ার জঙ্গলামাঠে তাঁরা লুকিয়ে আছে। আর দেশপ্রেমিক জেলেরা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সেখানে খাবার আনা-নেওয়া করতো। এমন খবরের ভিত্তিতে পাক আর্মিরা জেলেদের পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। দুটি উপন্যাসেই জেলেদের জীবন সংগ্রামের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। জেলেদের এ সংগ্রাম তাদের দারিদ্র্য ও নিয়তির বিরুদ্ধে। উভয় উপন্যাসেই দেখা যায় তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত। তাদের এই অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জন্য তারা বহুকাল ধরে ক্ষমতাবানদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তারা সংগঠিত নয় বলে তাদের বঞ্চনাকারী

[১৫০] হুমায়ূন আহমেদ, '১৯৭১,' *মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসসমূহ* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৫), পৃ. ১১৪।

প্রভুদের কাছে প্রতিকার চাওয়া তো দূরের কথা, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদটুকুও করতে পারে না। উপন্যাসে জেলেদের সম্মিলিত প্রতিরোধ না থাকলেও একক প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

হুমায়ূন আহমেদ মার্কসবাদী লেখক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর উপন্যাসে সম্মিলিত প্রতিবাদ না থাকলেও জেলেদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাদের একক প্রতিবাদের চিত্র লেখক উপস্থিত করেছেন। 'ফেরা' উপন্যাসে দেখা যায় স্থানীয় অসহায় জেলেদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় হতদরিদ্র আমিন ডাক্তার। এ কারণে আমিন ডাক্তারকে কারাগারে পর্যন্ত যেতে হয়। কারাগার থেকে বের হয়ে আবারও প্রতিবাদ করে। '১৯৭১' উপন্যাসে চিত্রা বুড়িও প্রতিবাদ করে ছেলে হত্যার বিচার চায়। যদিও সে বিচার নিজের গোত্রেরই এক ঘাতকের বিরুদ্ধে। অপরদিকে খুনি মনাও মেজরের সামনে নির্দ্বিধায় বলতে পারে যে, চিত্রা বুড়ির ছেলেকে সে খুন করেছে। কারণ বুড়ির ছেলে তার স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধভাবে মেলামেশা করেছে। হুমায়ূনের জেলেরাও জমিদারদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদ করে না, তবে তাদের একক প্রতিবাদে উপন্যাস দুটি হয়ে ওঠে এক নতুন নির্মাণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলেদের মতো ঈশ্বরের নীরবতায় হুমায়ূনের জেলেরা সকলে নীরব থাকে না। চিত্রা বুড়ি তাই ছেলে হত্যার বিচার চায় পাকিস্তানি আর্মির মেজর এজাজের কাছে।

পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ তাঁর 'মধ্যাহ্ন' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বিষয়। উপন্যাসে এ প্রসঙ্গটি চিত্ররূপ পেয়েছে বান্ধবপুরের ছিন্নমূল কৈবর্ত বা জেলে সম্প্রদায়ের মানবেতর জীবন উপস্থাপনের মাধ্যমে। এ পাড়ার ছিন্নমূল জেলেরা দীর্ঘদিন ধরে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে খাবি খেয়ে টিকে থাকে। এর মধ্যে 'মরার উপর খাড়ার ঘা' হয়ে আসে পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ। জেলেদের মধ্যে নরেশের পরিবার পনের দিন ধরে অভুক্ত থাকে। জেলে পাড়ার বাকি সকলের একই অবস্থা। নরেশ ও তার মেয়ে লক্ষ্মী দুর্ভিক্ষ পীড়িত ও অসহায় ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতিনিধি। উপন্যাসে নরেশ প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে বাংলার অনাহারী মানুষ, মুনাফাখোর মহাজন ও মানবতাবাদী এক ব্যবসায়ীর চিত্র উঠে এসেছে। দুর্ভিক্ষের সময়ে জেলেদের বেদনা বিধুর ছবি চিত্রায়ণ করেছেন লেখক এভাবে –

> কৈবর্তরা থাকে উত্তরে। ... বাড়িঘর নৌকার ছইয়ের মতো। এদের জীবিকা মূলত মাছ ধরা। ... ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করার এদের অভ্যাস আছে। খাদ্য সংগ্রহের প্রধান দায়িত্ব মেয়েরা পালন করে। জঙ্গল খুঁড়ে বনআলু নিয়ে আসে। কচুশাক সিদ্ধ খাদ্য হিসেবে অনেকদিন থেকেই চালু। ... নমঃশূদ্ররা আগে শামুক ঝিনুক খেত না। হাঁসের খাবার মানুষ কেন খাবে? ইদানীং খাচ্ছে।[১৫১]

---

[১৫১] হুমায়ূন আহমেদ, "মধ্যাহ্ন," ১৯০১-১৯৭১ *সেই সময়*, পৃ. ২৮০।

হিন্দু ঔপন্যাসিকগণ যখন সমাজের চিত্র আঁকেন, তখন বাস্তবের শ্রেণিবিন্যস্ত সমাজের জাতপাতগুলো সেখানে অধিক বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত হয়। তাই সেখানকার চরিত্রগুলোর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত বা বাগদি পরিচয় স্পষ্টতা পায়। প্রশান্ত ঘোষের 'নতুন যুগের ভোরে' (১৯৬২) উপন্যাসে দুর্ভিক্ষের সময়ে বাগদি ও কৈবর্তদের দুরবস্থার চিত্র আঁকা হয়েছে।[১৫২] উপন্যাসে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ জমিদার কৃষ্ণদাস একজন মহাজন যে বন্ধকী ব্যবসা করে। দেশে দুর্ভিক্ষ শুরু হলে গ্রামের বাগদিপাড়ার মেয়েরা একটু ভাতের ফ্যান খাওয়ার জন্য কৃষ্ণদাসের বাড়ির দরজায় ভিড় করে। এতে কৃষ্ণদাসের স্ত্রী তারাসুন্দরী খুব বিরক্ত বোধ করে। কৈবর্তপাড়ার রামুর মা বৃদ্ধ রমণী যে ছেলের বউয়ের হাতের বালা বন্ধক রেখে কৃষ্ণদাসের কাছ থেকে টাকা ধার করে। পরে সুদে-আসলে সেই টাকা ফেরত দিয়ে বউয়ের বালা ফেরত নিয়ে যায়। কৈবর্তপাড়ার কুড়ি বছর বয়সের একটি কৈবর্ত মেয়ে পিতলেন বাটি বন্ধক রাখতে গেলে ব্রাহ্মণ জমিদার তাকে কৌশলে ধর্ষণ করে।[১৫৩] কিন্তু এ ঘটনার কোনো বিচার সে পায় না। ঔপন্যাসিকের মতে, সমাজের উঁচুতলায় যাদের বসবাস দুর্ভিক্ষ তাদের স্পর্শ করে না, যতো দুর্ভিক্ষ-আকাল ডোম, দুলে, মুচি, কৈবর্ত, বাউড়ি, মুণ্ডা আর সাঁওতালপাড়ায়। এ উপন্যাসের মাধ্যমে সমকালের করুণ সমাজ-বাস্তবতার চিত্র স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন রচনায় খুব সংক্ষেপে কৈবর্ত প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে দেখা যায় কলু, কুমার, কৈবর্ত প্রভৃতি পাড়ায় গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণসন্তান গোরা আতিথ্য গ্রহণ করতো। গোরা এইসব জাতির লোকেদের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের সুখ-দুঃখের খবর নিতো।[১৫৪] এছাড়া 'দৃষ্টিদান' নামক ছোটগল্পের নারী চরিত্র হেমাঙ্গিনীর একটি উক্তিতে কৈবর্তের উল্লেখ রয়েছে। উক্তিটি এ রকম – "কাকি, তুমি যদি বাড়ি না যাও আমি আমার কৈবর্তদাদার সঙ্গে চলিলাম, তাহা বলিয়া রাখিতেছি।"[১৫৫] এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধে কৈবর্তদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সমাজের উপেক্ষিত ও অনগ্রসর জাতিবর্ণগুলোর কথা একত্রে বলা হয়েছে –

---

[১৫২] প্রশান্ত ঘোষ, *নতুন যুগের ভোরে* (কলকাতা: বর্ণালী, ১৯৬২), পৃ. ১৩।

[১৫৩] তদেব, পৃ. ১৪।

[১৫৪] https://www.tagoreweb.in, accessed in 24 September 2020.

[১৫৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গল্পগুচ্ছ অখণ্ড সংস্করণ* (ঢাকা: সালমা বুক ডিপো, ২০০৬), পৃ. ২২৫।

> আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ Ethnology-র বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম-কৈবর্ত-বাগদি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না তখনই বুঝতে পারি পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে – পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের এই-সকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।[১৫৬]

সত্যেন সেন, মহাশ্বেতা দেবী, জাকির তালুকদারের উপন্যাস থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কৈবর্তরা একটি আদি জনজাতি ছিলো। তবে উপন্যাসের বর্ণনায় কৈবর্তদের জনজাতি পরিচয়ের চেয়ে শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিসংগ্রামের বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এর পাশাপাশি এসব উপন্যাসে কৈবর্তকে জনজাতি বলা হলেও অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের জীবনধারাকে চিত্রিত করা হয়েছে। সত্যেন সেনের উপন্যাসে কৈবর্ত জনজাতি থেকে হিন্দু জাতিতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়, যা এই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়াকে তুলে ধরে।

কৈবর্ত জাতিবর্ণকে নিয়ে রচিত সাহিত্যে তাদের পেশার পরিচয় প্রসঙ্গে লেখকদের মধ্যে ঐক্য বা সাদৃশ্য রয়েছে। বিশেষভাবে কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী উভয় ধরনের কৈবর্তদের নিয়ে উপন্যাস রচিত হয়েছে। তবে যেহেতু মাহিষ্যরা কৈবর্ত হিসেবে উপস্থাপিত হচ্ছে না, তাই কৃষিজীবী কৈবর্ত নিয়ে সাহিত্য কম। একমাত্র উদাহরণ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সন্দীপন পাঠশালা'।

জেলে কৈবর্তদের নিয়ে রচিত উপন্যাসগুলোতে কৈবর্ত সমাজের চিত্র প্রায় অভিন্ন। এসব উপন্যাসে জেলেদের জীবন সংগ্রাম, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, শোষণের চিত্র প্রভৃতি প্রতিফলিত হয়েছে। তবে অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসটি জেলে কৈবর্তসমাজকে অধিক প্রতিনিধিত্ব করে বলে মনে হয়। এছাড়া মৎস্যপেশার পাশাপাশি বর্তমান কালে জেলেদের পেশা পরিবর্তন ও সামাজিক জঙ্গমতার চিত্র ফুটে উঠেছে ঘনরাম চক্রবর্তী ও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে।

[১৫৬] https://www.tagoreweb.in, accessed in 24 September 2020.

৮. কৈবর্ত জাতিবর্ণের পদবি

আত্মপরিচয় নির্ধারণে পদবি গুরুত্বপূর্ণ না-কি গুরুত্বপূর্ণ নয়, এ নিয়ে রয়েছে নানা বিতর্ক। ভারতীয় সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা ও স্থান তার জাতিবর্ণের দ্বারা হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক অবস্থা অনগ্রসরতা নির্ণয়ের মাপকাঠি হবে কিনা এ নিয়েও রয়েছে প্রচুর দ্বন্দ্ব। শ্রেণিহীন অর্থাৎ জাতিবর্ণহীন সমাজ গঠন নিয়ে বিভিন্ন জাতিবর্ণের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে মাহিষ্য সমাজের ভাষ্য হলো, পদবির দ্বারা উচ্চবর্ণ হিন্দুরা (মাহিষ্য ব্যতীত) বর্ণ নিরূপণের ব্যবস্থা রেখেছে। চক্রবর্তী, চট্টোপাধ্যায়, উপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য প্রভৃতি পদবিধারীগণ ব্রাহ্মণ এবং বসু, মিত্র, দত্ত, ঘোষ পদবির ব্যক্তিরা কায়স্থ। কিন্তু মাহিষ্যদের পদবি কর্মানুসারে অর্জিত। ব্যবহৃত সব পদবি অর্থবহও নয়। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পদবি যথেষ্ট সহায়ক। সে কারণে পদবি ত্যাগের আন্দোলনে বর্ণ হিন্দুদের সমর্থন উল্লেখযোগ্য নয়।[১৫৭]

কৈবর্ত জাতিবর্ণের ব্যবহৃত পদবিসমূহ দাশ, দাস, কবিরাজ, কুণ্ডু, গিরি, চৌধুরী, জোয়াদ্দার, তরফদার, তালুকদার, পণ্ডিত, পাল, দেশমুখ, প্রামাণিক, বিশ্বাস, বাগচী, ভাদুড়ী, মণ্ডল, মল্লিক, মান্না, মাইতি, মৈত্র, রায়, শাসমল, সরকার, সামন্ত, সিকদার, সেন, সিংহ, হাজরা, হালদার প্রভৃতি।[১৫৮] এছাড়া উনিশ শতকে কৈবর্তদের ব্যবহৃত আরও কিছু পদবি যেমন, হাঁচড়া, আদক, বাঘ, গোল, বারিক, সাঁতরা, কলিয়া, মাড়, মান্না প্রভৃতি।[১৫৯]

কৈবর্তদের পদবি মূলত দাস। বর্তমানে এ জাতিবর্ণের শিক্ষিত কিছু ব্যক্তিদের মধ্যে পদবি পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে।[১৬০] শিক্ষিত হওয়ার ফলে যখন তারা দেখছে হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থগুলোতে কৈবর্তদের অবস্থান সম্মানজনক নয় বরং অস্পৃশ্য, তখন তাদের মধ্যে এক ধরনের হীনম্মন্যতা তৈরি হচ্ছে। ফলে তারা তাদের কৈবর্ত পরিচয় মুছে ফেলার জন্য পদবি বদলে দিচ্ছে। অনেকে নামের বানান পরিবর্তন করেও কৈবর্ত পরিচয় বদলে দাশ লিখছে, পরে তা আবার পরিবর্তিত হয়ে দাশগুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।[১৬১] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে এ পরিবর্তনটা

---

[১৫৭] খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক, *পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ* (কলকাতা: মিত্রলোক, ১৯৮৩), পৃ. ১৭-১৮।

[১৫৮] তদেব, পৃ. গ-বিভাগ, ৮-৯।

[১৫৯] আশিষ খাস্তগীর, *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ: ১৮১৬-১৮৫৫* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০০), পৃ. ৫৩; *শিশুসেবধি*-২ (কলকাতা: হিন্দু কলেজ, ১৮৪০), পৃ. ৫৩।

[১৬০] সাক্ষাৎকার: সুব্রত কুমার চক্রবর্তী (৬৩), মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, সিলেট ইউনিট, পুরান সিলেট, তারিখ: সিলেট, ২৫.০৫.২০১৯।

[১৬১] খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক, *পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পৃ. গ-বিভাগ, ২৮-৩০; হরিশংকর জলদাস, *কৈবর্তকথা* (৩য় সং; ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১২), পৃ. ৭।

বেশি লক্ষ করা যায়। এমন অনেক কৈবর্তও আছেন যারা নিজেদের কৈবর্ত পরিচয় স্বীকারও করতে চান না। স্কুলে নাম দেওয়ার সময় দাস পদবি বদলে অন্য পদবি দেন। যেমন চৌধুরী, সাহা, দেশি, সরকার, রায়, পাল, বিশ্বাস, নস্কর, বর্ধন প্রভৃতি।[১৬২]

১৯০৯ সালে সুনামগঞ্জ মাহিষ্য সমিতির সম্পাদক পেয়ারি মোহন দাস 'দি মাহিষ্যস' নামে একটি বই রচনা করেন। বইটিতে মাহিষ্যদের পরিচয়, শাসনকৃত রাজ্যসমূহ, ব্যবহৃত পদবি, মাহিষ্য আন্দোলনের ব্রিটিশ সরকারকে প্রদত্ত আবেদনসমূহ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। সেখানে পেশা ও সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে মাহিষ্যদের পদবিতে বৈচিত্র্য দেখা যায়। তাদের ব্যবহৃত পদবিসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো – ১. বাহুবলীন্দ্র – মায়ানগরের রাজপরিবারের ব্যবহৃত পদবি (দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায়, বাহুর শক্তি অর্থে),[১৬৩] ২. গজেন্দ্রমহাপাত্র – তুর্কা রাজপরিবারের ব্যবহৃত পদবি (হাতিদের রাজা অর্থে), ৩. ভূমিপা – পাহাড়পুরের ভুঁইয়া যারা মহিষাদল রাজাদের একটি শাখা হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে (ভূমি অধিকর্তা অর্থে), ৪. সেনাপতি – প্রধান সেনাধ্যক্ষ অর্থে, ৫. হাজরা – এক হাজার সেনার অধিনায়ক বা দলপতি অর্থে, ৬. সাতরা – একশত সেনার অধিনায়ক, ৭. ভুঁইয়া – ভূস্বামী বা জমিদার, ৮. কপোত – দারোয়ান, ৯. হাতি – গজ বা হাতির ন্যায় শক্তিশালী অর্থে, ১০. বাঘ – বাঘের ন্যায় শক্তিশালী অর্থে, ১১. খাড়া – তলোয়ার, ১২. মল্ল – যোদ্ধা, ১৩. দালাই – কৃষক সৈন্যবাহিনীর প্রধান, ১৪. রণসিংহ – যুদ্ধে সিংহের ন্যায় শক্তিশালী অর্থে, ১৫. বিতাল – দানব অর্থে, ১৬. নায়ক – নেতা অর্থে, ১৭. জানা – রাজপুত্র, ১৮. অর্ধকা – অর্ধেক বিভাগের নেতা, ১৯. গিরি – পাহাড়, ২০. দাস – হিজলি রাজাদের ব্যবহৃত পদবি, মাহিষ্যদের বৃহত্তর অংশের ব্যবহৃত পদবি, ২১. রায় – সম্ভ্রান্ত ভূমি অধিকর্তা, ২২. চৌধুরী – জমিদার, ২৩. বিশ্বাস – বিশ্বস্ত কর্মকর্তা, ২৪. লস্কর – যোদ্ধা, ২৫. মৌলিক – প্রকৃত ভূস্বামী, ২৬. জোতদার – একটি জোতের মালিক, ২৭. তালুকদার – একটি তালুকের মালিক, ২৮. সরকার – সরকারী কর্মকর্তা বা বিভাগীয় কর্মকর্তা, ২৯. পুরকায়স্থ – পরগনার হিসাবরক্ষক, ৩০. বক্সী – উপ-কোষাধ্যক্ষ, ৩১. শামারি – যোদ্ধা, ৩২. মজুমদার – রাজস্ব কর্মকর্তা, ৩৩. ভূপতি – সৈন্যদলের প্রধান, ৩৪. মহানায়ক – সৈন্যদলের অফিসার, ৩৫. সামন্ত – সামন্ত রাজপুত্র, ৩৬ –

---

[১৬২] সাক্ষাৎকার: সুব্রত কুমার চক্রবর্ত্তী (৬৩), মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, সিলেট ইউনিট, পুরান সিলেট, তারিখ: সিলেট, ২৫.০৫.২০১৯।

[১৬৩] Pyari Mohan Das ed., *The Mahishyas* (Kolkata: The Buckland Press, 1909), p. 75.

মহাপাত্র – প্রধানমন্ত্রী, ৩৭. গড়নায়ক – দুর্গ অধিনায়ক, ৩৮. দৌবারিকা – দ্বাররক্ষক, ৩৯. ভূপাল – ভূস্বামী।[১৬৪]

কৈবর্ত ও মাহিষ্য জাতিবর্ণের ব্যবহৃত পদবিতে রয়েছে যেমন মিল তেমনি বৈচিত্র্য। কৈবর্ত জাতিবর্ণের সাধারণ কিছু পদবি: দাশ, দাস, কবিরাজ, কুণ্ডু, গিরি, চৌধুরী, জোয়াদ্দার, তরফদার, তালুকদার, পণ্ডিত, পাল, দেশমুখ, প্রামাণিক, বিশ্বাস, বাগচী, ভাদুড়ী, মণ্ডল, মল্লিক, মান্না, মাইতি, মৈত্র, রায়, শাসমল, সরকার, সামন্ত, সিকদার, সেন, সিংহ, হাজরা, হালদার প্রভৃতি।[১৬৫] অন্যদিকে মাহিষ্য জাতিবর্ণের সাধারণ কিছু পদবি: দাশ, দাস, জলদাস, দাশগুপ্ত, দাশ মজুমদার, দে, ধর, নস্কর, নায়েক, নিয়োগী, পট্টনায়ক, পাল, পাত্র, পাইক, পিয়াদা, পুরকায়স্থ, পুরকাইত, প্রধান, প্রামাণিক, বক্সী, বড়াল, বাড়ৈ, বিশ্বাস, বেরা, বৈদ্য, বৈরাগী, ভূঁইয়া, ভৌমিক, মণ্ডল, মল্লিক, ময়রা, মহাপাত্র, মান্না, মাল, মাইতি, মৌলিক, রায়চৌধুরী, শাসমল, শিকদার, সেঠ, সরকার, সরদার, সিংহ, হাজরা, হালদার প্রভৃতি।[১৬৬]

চট্টগ্রাম অঞ্চলের কৈবর্তদের পদবি পরিবর্তন সম্পর্কে হরিশংকর জলদাস লিখেছেন: "জেলেরা আজ তাদের পদবি বদলে ফেলেছে। 'জলদাস' পদবি ত্যাগ করে চট্টগ্রামের অধিকাংশ জেলে তাদের নামের শেষে 'দাশ' লিখতে শুরু করেছে। শিক্ষিত জেলেরা স্কুলে ভর্তি করানোর সময়ে তাদের সন্তানদের নামের শেষে রায়, সেন, দাশগুপ্ত, চৌধুরী প্রভৃতি পদবি যুক্ত করে দিচ্ছে। সামাজিক নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে, হীনম্মন্যতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তারা এই লুকোচুরির আশ্রয় নিচ্ছে।"[১৬৭]

৯. উপসংহার

যজুর্বেদ থেকে শুরু করে প্রায় সকল প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে কৈবর্ত জাতিবর্ণটি জেলে, মৎস্যজীবী বা ধীবর নামে পরিচিত ছিলো। বেদ, মনুসংহিতা, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থে কৈবর্ত জাতিবর্ণ শূদ্র এবং অস্পৃশ্য হিসেবে বিবেচিত হতো। আধুনিক কালে কৈবর্ত বলতে জেলে,

---

[১৬৪] Ibid, p. 75-77.

[১৬৫] খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক, *পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পৃ. গ-বিভাগ, ৮-৯।

[১৬৬] তদেব, পৃ. ২৮-৩০।

[১৬৭] হরিশংকর জলদাস, *কৈবর্তকথা*, পৃ. ৭।

জালিয়া, কেওট, ঝালো, মালো, ধীবর, নৌজীবী বা মৎস্যজীবী শ্রেণিকে বোঝায়। বর্তমানেও সামাজিক ও পেশাগত উভয় দিক থেকেই কৈবর্তরা মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। প্রাচীন কিংবা আধুনিক সব কালেই কৈবর্তের বৃত্তি প্রায় অভিন্ন।

১৮৭২ সাল থেকে ১৮৯১ সালের আদমশুমারি পর্যন্ত জাতিবর্ণের তালিকায় কৈবর্ত শুধু কৃষিজীবী হিসেবেই অন্তর্ভুক্ত ছিলো, যদিও বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্রে কৈবর্তদের চাষি এবং জেলে শ্রেণির কথা উল্লেখ রয়েছে। একই রিপোর্টে মৎস্যজীবী ও নৌজীবীরা অন্য নামে অর্থাৎ জালিয়া, কেওট, পাটনি, মালো, মাঝি, তিয়র প্রভৃতি নামে অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তাই কৃষিজীবী হওয়া সত্ত্বেও চাষি নামের সাথে কৈবর্ত শব্দটি যুক্ত হওয়াটা আরোপিত কিনা এ বিষয়টি চিন্তা জগতে প্রশ্নের উদ্রেক করে। জেলে কৈবর্ত থেকে নিজেদের পৃথক করতে এবং প্রচলিত অবস্থান থেকে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য চাষি কৈবর্ত সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মাহিষ্য নাম গ্রহণ করে। এর মধ্য দিয়ে চাষি কৈবর্তরা সমাজে তাদের নতুন আত্মপরিচয় সৃষ্টি করে। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র, ঐতিহাসিক গ্রন্থ, ব্রিটিশ কর্মচারীদের লিখিত গ্রন্থ ও আদমশুমারি রিপোর্টে কৈবর্ত জাতিবর্ণের পরিচয় যেভাবে উঠে আসে, প্রায় একই তথ্যের সমর্থন রয়েছে বাংলা সাহিত্যেও।

কৈবর্ত জাতিবর্ণের আত্মপরিচয় সম্পর্কে যে আলোচনা করা হলো তার মধ্যে তিন ধরনের মতামত স্পষ্টতা পায়। প্রথমত, প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লেখ্য মৎস্যজীবী, দাশ, ধীবর ও কৈবর্ত অভিন্ন। দ্বিতীয়ত, কৈবর্ত হলো বাংলার প্রাচীনতম জনজাতি বা কৌম। তারা একটি স্বাধীন জনজাতি ছিলো। পরে ক্রমে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং জাতিবর্ণে পরিণত হয়। তৃতীয়ত, ব্রিটিশ আমলের বিভিন্ন গ্রন্থ, আদমশুমারি রিপোর্ট এবং গেজেটিয়ার থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কৈবর্ত জাতিবর্ণ সম্পর্কে হিন্দু সমাজের ধারণা ছিলো নেতিবাচক। এই কারণে কৈবর্তদের মধ্য থেকে কৃষিজীবী একটি অংশ তাদের পরিচয় বদল করার জন্য আন্দোলন করে। সে আন্দোলনে সফল হয়ে তারা নিজেদের 'মাহিষ্য' পরিচয় পায়। কিন্তু কৈবর্তদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শ্রেণিটি সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। এরাই বর্তমানের কৈবর্ত।

তৃতীয় অধ্যায়
কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়ন: মর্যাদা প্রসঙ্গ

১. ভূমিকা

যেসব উপাদান দিয়ে সংস্কৃতায়ন বোঝা যায় তার মধ্যে অন্যতম কোনো জাতিবর্ণের সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন। বিশ শতকের সূচনায় কৈবর্ত জাতিবর্ণের কৃষিজীবী অংশটি অর্থাৎ চাষি কৈবর্ত তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়ানোর জন্য আন্দোলন করেছিলো এবং কাঙ্ক্ষিত মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলো। ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি সভা-সমিতির মাধ্যমে তারা সংগঠিত হয়। বিশেষভাবে ১৮৯১ সালের পর থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তারা সাংগঠনিকভাবে আদমশুমারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং কৈবর্ত পরিচয়ের পরিবর্তে মাহিষ্য পরিচয়ের দাবি জানিয়ে আসতে থাকে। এভাবে কয়েক বছর সক্রিয় আন্দোলনের মাধ্যমে চাষি কৈবর্তরা মাহিষ্য নামে নতুন পরিচয় লাভ করে। নতুন এই পরিচয় তাদের সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন ঘটায়। কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামাজিক মর্যাদার এই পরিবর্তন এ অধ্যায়ের আলোচ্য।

২. বাংলায় জাতিগুলোর নাম পরিবর্তনের ইতিবৃত্ত

মাহিষ্য জাতিবর্ণের মর্যাদা বৃদ্ধির আলোচনার পূর্বে বাংলার অন্যান্য জাতিবর্ণগুলোর নাম পরিবর্তনের ইতিবৃত্তও জানা প্রয়োজন। ১৮৭২ সালে উপমহাদেশের প্রথম আদমশুমারি হয়। শুমারি রিপোর্ট তৈরি করতে গিয়ে ব্রিটিশ কর্মচারীরা সবচেয়ে বেশি ঝামেলায় পড়েছিলেন জাতিবর্ণ নির্ধারণ করতে গিয়ে। ১৮৯১ সালের পর থেকে অনেকগুলো জাতি তাদের নাম পরিবর্তনের জন্য শুমারি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে থাকে। বিষয়টি চরম অবস্থায় পৌঁছে যায় ১৯১১ সালে। বিভিন্ন জাতির কাছ থেকে জাতিবর্ণের ক্রমতালিকায় নতুন নামে অন্তর্ভুক্তির জন্য হাজার হাজার আবেদনপত্র আদমশুমারি কর্তৃপক্ষের কাছে জমা হয় – যার ওজন ছিলো প্রায় দেড় মন।[১] অনেকগুলো জাতিবর্ণ সরকারি রিপোর্টে তাদের অবস্থান দেখে অপমানিত এবং ক্ষুব্ধ হয়েছিলো।[২]

---

[১] *Census of India 1911*, vol. V, part I (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1912), p. 440.

[২] Ibid.

কৈবর্ত জাতিবর্ণ ছাড়া অন্য যেসব জাতিবর্ণ এভাবে তাদের পরিচয় বদলের জন্য আবেদন করে, তাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জাতিবর্ণের প্রার্থিত জাতিবর্ণ-নাম, প্রার্থনার কাল এবং শেষ পর্যন্ত কী নাম অর্জিত হয়, তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচের তালিকায় উল্লেখ করা হলো:

সারণি ৩.১

কয়েকটি জাতিবর্ণের প্রার্থিত নাম ও স্বীকৃতি

ক্রম	জাতিবর্ণের মূল নাম	প্রার্থিত নাম	শুমারিকাল	স্বীকৃত নাম
১	চণ্ডাল	নমঃশূদ্র	১৮৯১	নমঃশূদ্র (চণ্ডাল)
	নমঃশূদ্র (চণ্ডাল)	নমঃশূদ্র	১৯০১	নমঃশূদ্র (চণ্ডাল)
	নমঃশূদ্র (চণ্ডাল)	নমঃশূদ্র ব্রাহ্মণ	১৯১১	নমঃশূদ্র
	নমঃশূদ্র	নমঃব্রাহ্মণ নমঃব্রহ্ম	১৯৩১	নমঃশূদ্র
২	বৈদ্য	ব্রাহ্মণ বৈদ্য ব্রাহ্মণ	১৯৩১	বৈদ্য (ব্রাহ্মণ বৈদ্য, বৈদ্য ব্রাহ্মণ)
৩	যুগী	যোগী	১৯০১	যুগী/যোগী
	যুগী/যোগী	যোগী	১৯১১	যোগী
		যোগী ব্রাহ্মণ	১৯৩১	যোগী
৪	নাপিত	ক্ষত্রিয়, প্রামাণিক, শীতলদাস, কায়স্থ, পারশব	১৯১১	নাপিত
		চন্দ্র, বৈদ্য	১৯২১	নাপিত
		নৈ ব্রাহ্মণ, সাবিত্রী ব্রাহ্মণ	১৯৩১	নাপিত (হাজাম, নৈ, নৈ ব্রাহ্মণ, নাও, সাবিত্রী ব্রাহ্মণ)
৫	সূত্রধর/ ছুতার	বৈশ্য, সূত্রধর	১৯১১	সূত্রধর
		বৈশ্য, বৈশ্য সূত্রধর	১৯২১	সূত্রধর
		বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণ	১৯৩১	সূত্রধর
৬	স্বর্ণকার/ ছ্যাকরা	বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণ	১৯৩১	স্বর্ণকার
৭	কপালী	বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণ	১৯৩১	বৈশ্য কপালী
৮	চর্মকার/ চামার	সৎনামী	১৯৩১	চামার (চর্মকার, ঢেকারু, রবিদাস, সৎনামী)
৯	আগুরি	ক্ষত্রিয়, উগ্রক্ষত্রিয়	১৯৩১	আগুরি
১০	বাগদি	ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়	১৯৩১	বাগদি (ব্যগ্রক্ষত্রিয়)
১১	বৈষ্ণব/ বৈরাগী	বৈদিক বৈষ্ণব, সততা ব্রাহ্মণ	১৯৩১	বৈষ্ণব (বৈরাগী, রামাত, শ্রীবিষ্ণু, বৈষ্ণবা)
১২	হাড়ি	ক্ষত্রিয়	১৯১১	হাড়ি
		ক্ষত্রিয়	১৯২১	হাড়ি

		হৈহয় ক্ষত্রিয়	১৯৩১	হাড়ি (ভূষণ, বীরবংশী, বীরঘরিয়া, হরসন্তান)
১৩	কোচ	রাজবংশী	১৮৯১	কোচ/রাজবংশী
	কোচ/রাজবংশী	রাজবংশী	১৯০১	রাজবংশী (কোচ)
	রাজবংশী (কোচ)	কোচক্ষত্রিয়	১৯১১	রাজবংশী
		কোচক্ষত্রিয়	১৯২১	রাজবংশী
	রাজবংশী	ক্ষত্রিয়, রাজবংশী ক্ষত্রিয়, ব্রাত্যক্ষত্রিয় পতিত ক্ষত্রিয়, ভঙ্গক্ষত্রিয়	১৯১১	রাজবংশী ক্ষত্রিয়
		ক্ষত্রিয়, ব্রাত্যক্ষত্রিয়, বর্ণক্ষত্রিয়	১৯২১	রাজবংশী ক্ষত্রিয়
		ক্ষত্রিয়	১৯৩১	রাজবংশী (রাজবংশী ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় রাজবংশী)
১৪	মালো/ ঝালো	ব্রাত্যক্ষত্রিয়, ঝালো ব্রাত্যক্ষত্রিয়, মালো ব্রাত্যক্ষত্রিয়	১৯১১	মল্লক্ষত্রিয়, ঝালোমালো
		ব্রাত্যক্ষত্রিয়, মল্ল-ক্ষত্রিয়, ঝল্ল ক্ষত্রিয়, ঝল্ল বর্মণ, ঝালো বর্মা, মল্ল বর্মণ, মালো বর্মা	১৯২১	মল্লক্ষত্রিয়
		মল্ল-ক্ষত্রিয়, ঝল্ল-ক্ষত্রিয়		ঝালো, মালো (মল্লক্ষত্রিয়, ঝল্লক্ষত্রিয়)
১৫	পোদ	ব্রাত্যক্ষত্রিয়, পুণ্ড্রক্ষত্রিয়	১৯১১	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
		পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্রাত্যক্ষত্রিয়	১৯২১	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
		পৌণ্ড্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পদ্মরাজ ক্ষত্রিয়	১৯৩১	পৌণ্ড্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পদ্মরাজ ক্ষত্রিয়
১৬	বারুই/ বারুজীবী	বৈশ্য বারুজীবী, বারুজীবী	১৯১১	বারুজীবী
		কায়স্থ, বৈশ্য, লাটা বৈদ্য	১৯২১	বারুজীবী
		বৈশ্য বারুজীবী, বারুজীবী	১৯৩১	বারুই (বারই, বারজ, বারজীবী, বারুজীবী, বৈশ্য বারুজীবী)
১৭	গন্ধবেণে/ গন্ধবণিক	বৈশ্য গন্ধবণিক	১৯১১	গন্ধবণিক
		বৈশ্য, বৈশ্য গন্ধবণিক	১৯২১	গন্ধবণিক
১৮	গোয়ালা	বৈশ্যবল্লভ, গোপ	১৯১১	
		সদ্‌গোপ	১৯২১	সদ্‌গোপ
১৯	কামার/ কর্মকার	কর্মকার বৈশ্য, কর্মকৃতি	১৯১১	কর্মকার

		কামার ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় কর্মকার	১৯২১	কর্মকার
		বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণ, কামার ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় কর্মকার	১৯৩১	কামার (কর্মকার, বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণ, কামার ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় কর্মকার)
২০	শুঁড়ি	সাহা	১৯২১	সাহা
		ক্ষত্রিয়, শৌণ্ডিক ক্ষত্রিয়, সৌদিয়া ক্ষত্রিয়	১৯৩১	সাহা
২১	সাহা	বৈশ্য সাহা, সাধুবণিক, সাহা বণিক	১৯১১	সাহা
		বৈশ্য বণিক, বৈশ্য বারেন্দ্র সাহা, বৈশ্য বানিয়া	১৯২১	সাহা
		বৈশ্য সাহা, সাধুবণিক, বৈশ্য, খন্দবণিক	১৯৩১	বৈশ্য সাহা, সাধুবণিক, বৈশ্য, খন্দবণিক
২২	চাষাধোবা	সৎচাষি	১৯১১	
		সদ্গোপ	১৯২১	
		সৎচাষি	১৯৩১	চাষাধোবা
২৩	তিলি/ তৌলিক	বৈশ্য	১৯১১	
		বৈশ্য	১৯২১	তৌলিক
২৪	ময়রা/ মোদক	কায়স্থ, কায়স্থকুরি	১৯২১	মোদক
২৫	কায়স্থ	ক্ষত্রিয়	১৯২১	কায়স্থ
		ক্ষত্রিয়	১৯২১	কায়স্থ
			১৯৩১	কায়স্থ (কেইট, কায়েত, কায়েথ, লালা, লাল্লি)

টীকা: বিভিন্ন শুমারি রিপোর্ট ও সহায়ক উৎস থেকে তালিকাটি তৈরি করা হয়েছে। মর্যাদা পরিবর্তনের প্রবণতা বোঝানোই এই সারণির মূল লক্ষ্য। তথ্যগত কোনো ক্রটি থাকলে, তা ইচ্ছাকৃত নয়। আবার অনেক সময়ে গণনাকারীরা শুমারির জন্য ক্রটিপূর্ণভাবে তথ্য গ্রহণ করেছে, সে কথাও রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। সারণিতে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ জাতিবর্ণ চারটি নতুন পরিচয় দাবি করেছে; এগুলো হলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং অন্যান্য জাতিবর্ণের নাম।

উৎস: *Census of India 1891* vol. I part II (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1893), pp. 2-8; *Census of India 1901,* vol. VIA, part II (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1902), pp. 246, 252. *Census of India 1911,* vol. V, part I (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1912), pp. 441-42; *Census of India 1921,* vol. V (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1923), pp. 347-48; *Census of India 1931,* vol. V, (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1933), pp. 427-28; *Census of India 1931,* vol. V, part II (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1933), pp. 226-239; শিপ্রা বিশ্বাস, *অন্বেষণ* (কলকাতা: অদলবদল, ১৯৯৬), পৃ. ২৪৭-২৪৯; স্বরোচিষ সরকার, *অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ* (ঢাকা: প্রতীক, ২০০৫), পৃ. ২৯-৩০।

বাংলার জাতিবর্ণ, সামাজিক মর্যাদা, স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সম্পর্কে ব্রিটিশ কর্মচারী বা শুমারি কর্তৃপক্ষের কোনো ধারণা থাকার কথা নয়। কিন্তু আদমশুমারি রিপোর্টে বাংলার জনগোষ্ঠীকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন জাতিবর্ণে বিভাজন করা, বিশেষভাবে সামাজিক মর্যাদাক্রম তৈরি করার বিষয়টি খুব স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন প্রশ্নের উদ্রেক করে। জাতিবর্ণ সম্পর্কে শুমারি কর্তৃপক্ষের ধারণা প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ বা তথাকথিত উচ্চবর্ণের ধারণা বলেই মনে হয়। কারণ সে সময়ে শুমারির তথ্য সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিলো ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য শ্রেণির লোকেরা। এজন্য শুমারি রিপোর্টে অধিকাংশ শূদ্র জাতিবর্ণের মর্যাদার এই লড়াইকে ব্রিটিশরা সম্মান দেখায়নি বরং এইসব জাতিবর্ণ আদমশুমারিকে নাম বদলের সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছে বলে তির্যক মন্তব্য করা হয়েছে।[৩]

কিছু জাতিবর্ণের দাবি করা নতুন নামের স্বীকৃতি থাকলেও শুমারি রিপোর্টের একেকটা ভলিউমে একেক রকম নাম ব্যবহার করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অস্পৃশ্য জাতিবর্ণগুলোর বিবরণে পুরাতন নামটাই লেখা রয়েছে।[৪] শুধু তাই নয় ১৯৩১ সালে যেসব অস্পৃশ্য এবং আদিবাসী জাতিবর্ণ নতুন নাম পেয়েছিলো তাদের দুই একটি বাদে প্রায় সবগুলোই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে পুরাতন নামেই তফসিলি হিন্দু হিসেবে স্থান পায়।[৫]

হিন্দুত্বের মর্যাদা পাওয়া দূরে থাক, অস্পৃশ্য এসব জাতিবর্ণ অনেক সময়ে হিন্দু মন্দিরে প্রবেশের সুযোগও পেতো না। বাংলার কালীঘাট, তারকেশ্বর মন্দিরে খুব কম জাতিবর্ণের লোকের প্রবেশাধিকার ছিলো। ১৮০৯ সালে পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরে অস্পৃশ্য জাতিবর্ণগুলোর প্রবেশ নিষেধ করার জন্য আইন পর্যন্ত করা হয়েছিলো।[৬]

হয়তো এমন বিভিন্ন কারণে জাতিবর্ণগুলো বাধ্য হয়েছিলো তাদের নাম, পরিচয় পরিবর্তন করতে। তবে সামাজিক মর্যাদার আন্দোলনে সবগুলো জাতিবর্ণ প্রায় একই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। এক্ষেত্রে তাদের প্রথম পদক্ষেপ ছিলো বিভিন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছ থেকে ব্যবস্থাপত্র

---

[৩] *Census of India 1911*, vol. V, Part I (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1912), p. 440.

[৪] *Census of India 1931*, vol. V, part I (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1933), p. 498.

[৫] স্বরোচিষ সরকার, *অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ* (ঢাকা: প্রতীক, ২০০৫), পৃ. ২৯-৩০।

[৬] "There Still apparently exists on the statute book a regulation (No. IV of 1809) section 7 of which prohibits by law entry into the temple of Jagannath at Puri of a number of castes." *Census of India 1931*, vol. V, part I, p. 497. উল্লেখ্য যে, এই আইনে বাংলার নমঃশূদ্র, রাজবংশী, যোগী প্রভৃতি কৃষিজীবী জাতিবর্ণকে জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

গ্রহণ করা। সেখানে জাতিবর্ণগুলোর বর্তমান পেশা, জীবনপ্রক্রিয়া, শাস্ত্রগ্রন্থের উক্তি প্রভৃতি থাকতো। কিন্তু বাস্তবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা কী ব্যবস্থাপত্র দিতেন তা নিয়ে সাধারণ সমাজের কোনো মাথাব্যথাই ছিলো না। আর পণ্ডিতরাও নিজেদের জাতিবর্ণকে বাঁচিয়ে অন্যান্য জাতিবর্ণকে ব্যবস্থাপত্র দিতেন।[৭] অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো মন্তব্য ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখ থাকতো না।

এসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হিসেবে থাকতেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকগণ। যেমন, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, নীলমণি শর্মা প্রমুখ।[৮] এই পণ্ডিতদের উপর লালমোহন বিদ্যানিধির ধারণার বেশ প্রভাব ছিলো। ইংরেজরাও পণ্ডিতদের এইসব ব্যবস্থাপত্রকে গুরুত্ব দিতেন।

অস্পৃশ্য জাতিবর্ণের আন্দোলন ছাড়াও শুমারি রিপোর্টে বিভিন্ন জাতিবর্ণের পুরোহিত বা ব্রাহ্মণদের উপবর্ণ বা বিভাজন নিয়েও অনেক দাবি ওঠে এবং তার সমাধানও করা হয়। এক্ষেত্রে সব ধরনের ব্রাহ্মণদের দাবি মেনে নেওয়ার প্রবণতা স্পষ্ট। এর পেছনে ব্রাহ্মণদের জাতি-রাজনীতি থাকা সম্ভব। কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদী ধারণায় শ্রোত্রীয়, বৈদিক, বরেন্দ্রী, রাঢ়ীয়, কুলীন ইত্যাদি পরিচয়ধারীদের উন্নত সামাজিক অবস্থান স্বীকৃত। সেখানেও উঁচু ব্রাহ্মণ আর নিচু ব্রাহ্মণের ধারণাও থাকে। সেই ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ সকল ব্রাহ্মণকে এক কাতারে দাঁড় করানোর প্রয়োসকে তাই সন্দেহ না-করে পারা যায় না।

তবে অধিকাংশ জাতিবর্ণের নাম পরিবর্তনের বিষয়টি খুব একটা সহজ ছিলো না। কায়স্থরা ক্ষত্রিয় হতে চেয়েছিলো কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি।[৯] নমঃশূদ্র, যোগী, নাপিত, সূত্রধর প্রভৃতি জাতিবর্ণ নিজেদের ব্রাহ্মণ দাবি করেছিলো, তাও সফল হয়নি।

৩. মর্যাদা বৃদ্ধির আন্দোলন: পটভূমি

উনিশ শতকের শেষভাগে কৈবর্ত জাতিবর্ণ নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করে। এই আলোচনার পূর্বে জানা প্রয়োজন তখন কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামাজিক মর্যাদা কেমন ছিলো? তার মধ্য থেকেই জানা যাবে সমাজে কী মর্যাদা তারা ভোগ করছে এবং কী তাদের আকাঙ্ক্ষা? কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামাজিক মর্যাদা অতীতে কেমন ছিলো তার একমাত্র উৎস প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র।

---

[৭] *Census of India 1911,* vol. V, Part I, p. 440.

[৮] গোপালচন্দ্র সরকার, *মাহিষ্য-নামোদ্ধারের ইতিবৃত্ত* (কলকাতা: বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি, ১৯৯৭), পৃ. ৭৮।

[৯] শিপ্রা বিশ্বাস, *অন্বেষণ* (কলকাতা: অদলবদল, ১৯৯৬), পৃ. ২৫০।

কৈবর্ত জাতিবর্ণের মর্যাদা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় মনুসংহিতায়। কৈবর্ত জাতিবর্ণের উৎপত্তি, পেশা এবং সমাজে তাদের অবস্থান আলোচনা প্রসঙ্গে মর্যাদার বিষয়টি উঠে আসে। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী প্রতিলোম বিবাহ গর্হিত। তাই যেসব জাতিবর্ণের উৎস আলোচনা করতে গিয়ে তাদের প্রতিলোম বিবাহের ফসল বলা হয়, কার্যত সেইসব জাতিবর্ণকে হেয় করা হয়ে থাকে। মনুসংহিতায় একটি শ্লোকে কৈবর্তকে বর্ণবহির্ভূত প্রতিলোমের ফল বলা হয়েছে। শ্লোকটিতে কৈবর্তকে নিষাদ পিতা ও অয়োগব মাতার সন্তান বলা হয়েছে।[১০] ব্রাহ্মণ পিতা ও শূদ্র মাতার সন্তানদের নিষাদ বলা হয় এবং শূদ্র পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তানদের বলা হয় অয়োগব। সুতরাং উৎপত্তির দিক থেকে কৈবর্তরা শাস্ত্রগতভাবে অনুমোদনহীন সংকর জাতি। মনুসংহিতার এই বর্ণনা নিঃসন্দেহে কৈবর্তদের সামাজিক মর্যাদার জন্য হানিকর।

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব বইয়ে কৈবর্তদের অন্ত্যজ জাতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[১১] কৈবর্তদের সম্পর্কে একই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে। এখানে কৈবর্ত নারীদের সম্পর্কে অত্যন্ত অমর্যাদাকর বর্ণনা রয়েছে। যেসব লোক কৈবর্ত্তী, রজকী এবং বেশ্যার নিকট গমন করে তারা প্রজাপত্য বিধান ও কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা শুদ্ধ হবে।[১২]

[১০] "নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্মজীবিনম্। কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ ॥," (ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা শূদ্রাতে জাত নিষাদ নামক সন্তান, অয়োগবী স্ত্রীতে নৌকর্মজীবী দাশ নামক সন্তান উৎপন্ন হয়, যাহাকে আর্যাবর্ত বাসীরা কৈবর্ত জাতি বলে।" *মনুসংহিতা*, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত (কলকাতা: অরুণোদয় ঘোষ, ১৮৬৬), পৃ. ৩২৪, তবে একই গ্রন্থের আরও একটি শ্লোকে কৈবর্তের উল্লেখ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট শ্লোকটি যথা: "ব্যাধাঞ্ছাকুনিকান্ গোপান্ কৈবর্ত্তান্মূলখান্। ব্যালাগ্রাহানুঞ্ছবৃত্তীনন্যাংশ্চ বনচারিণঃ ॥ (ব্যাধ ও শাকুনিক অর্থাৎ নলে এবং গোপাল এবং কৈবর্ত/জেলে, বনমধ্যে ঔষধ খননকারী শাপুড়ে শিল উঞ্ছবৃত্তিশীল এবং ফলপুষ্প কাষ্ঠাদি আহরণের জন্য যাহারা সর্বদা বনে গমনাগমন করে উহাদিগকে সীমাবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবেন), পৃ. ৪৭৯।

[১১] "রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব'চ কৈবর্ত্তমেদাভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ ॥ এতেষান্ত স্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ ॥ অর্থাৎ রজক (ধোপা), চর্ম্মকার (চামার), নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ, ভিল্ল এই সাতটি অন্ত্যজ জাতি, অজ্ঞানপূর্বক চব্বিশ বার এদের স্ত্রীতে গমন করে অন্নগ্রহণ এবং প্রতিগ্রহ করলে ব্রাহ্মণ পতিত হয় জ্ঞানপূর্বক চব্বিশ বার গমনে এই সাতটি জাতির সমতা প্রাপ্ত হয় এবং এর প্রায়শ্চিত্তের কোনো বিধান নেই। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব অনুযায়ী পাপী অর্থাৎ অপরাধীরা আজকাল ব্রিটিশ আইনে দণ্ড পায় যা মোটেই যথেষ্ট নয়, অপরাধীদের অবশ্যই শাস্ত্রানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, *প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্* (কলকাতা: ইলেকট্রমেশিন প্রেস, ১৯০৯), পৃ. ৩৮১-৩৮২।

[১২] "কৈবর্ত্তীং রজকীঞ্চৈব বেশ্যাঞ্চাপি গতী নরঃ। প্রাজাপত্যবিধানেন কৃচ্ছ্রৈখেকেন শুদ্ধতি ॥" Bhatta Bhavadeva, *Prayaschitta Prakaranam* (Rajshahi: The Varendra Research Society, 1927), p. 95.

কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে জানার আর একটি জনপ্রিয় উৎস বল্লালচরিত। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সহ প্রায় সব পুরাণ গ্রন্থে মনুসংহিতার এই বক্তব্যের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এটি কৈবর্ত জাতিবর্ণের হেয়তা নির্দেশ করে।[১৩]

এ বইয়ে কৈবর্ত জাতিবর্ণকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যাতে মনে হয় তারা অস্পৃশ্য। বল্লাল চরিতের বর্ণনা অনুযায়ী বল্লাল সেন তাদের এই অসম্মানজনক সামাজিক মর্যাদার অবসান ঘটান। মূলত সুবর্ণবণিক ও যোগীদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষ্যে বল্লাল সেন কৈবর্তদের দলে টানতে তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়ান।

বল্লাল সেনের দ্বারা কৈবর্তদের মর্যাদা বাড়ানোর বর্ণনা উত্তরখণ্ডে পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায়, সুবর্ণবণিকেরা অনেক ধনলাভ করে, ফলে তারা অহংকারী হয়ে ওঠে এমনকি রাজাকেও অপমান করে বসে। প্রায় সমকালে যোগীদের সাথেও বল্লাল সেনের দ্বন্দ্ব বেধে যায়। বল্লাল সেনের সাথে সুবর্ণবণিক ও যোগীদের শত্রুতা জন্মে। বল্লাল সেন প্রতিজ্ঞা করেন এই দুই জাতিকে তিনি পতিত ও নীচ জাতির অন্তর্ভুক্ত করবেন। এ সংবাদ গৌড়ে প্রচারিত হলে সুবর্ণবণিকেরা কাজের লোকদের বেতন দুইগুণ, তিনগুণ বাড়িয়ে দেয়, ফলে রাজ্যে সাধারণ হিন্দুদের কাজের লোকের সংকট তৈরি হয়। এ অবস্থায় বল্লাল সেন বাধ্য হয়ে কৈবর্তদের কাজের লোক হিসেবে নিয়োগ করে। সে সময়ে কৈবর্তরা অস্পৃশ্য ছিলো, তাই সামাজিকভাবে তাদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে পবিত্রতাসূচক বিভিন্ন চিহ্ন ধারণ করতে বলা হয়। বল্লালচরিত অনুযায়ী, গঙ্গাস্নান করে তিলক ধারণ ও গলায় কাঠের মালা পরিধান করে পবিত্রতাসূচক চিহ্নাদি ধারণ করে তারা কাজের লোক হওয়ার উপযুক্ত হয়।[১৪] কৈবর্তদের ব্রাহ্মণ ও নাপিতরাও নিজেদের সম্মান বৃদ্ধির জন্য বল্লাল সেনের কাছে অনুরোধ জানায়।[১৫] এই সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিও আসলে শর্তসাপেক্ষ।

উনিশ শতকের কৈবর্তদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে জানা যায় কিছু গ্রন্থ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিবেদন এবং পত্রিকা থেকে।

'দর্পণ' পত্রিকায় ১৮৩৭ সালের ৫ আগস্ট প্রকাশিত সংখ্যায় কৈবর্তদের সামাজিক মর্যাদার বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়।[১৬] কৈবর্ত সম্পর্কিত বিশাল একটি কলাম লেখা হয়। লেখাটির বর্ণনার

---

[১৩] *বল্লালচরিত*, শশিভূষণ ভট্টাচার্য অনূদিত (কলকাতা: গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র, ১২২১), পৃ. ২৭-২৮।

[১৪] তদেব, পৃ. ২৭।

[১৫] তদেব, পৃ. ২৮।

[১৬] ব্রজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ২য় খণ্ড (৪র্থ সং; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৭), পৃ. ২৭৩।

ভাষায় চরম জাতিবিদ্বেষ লক্ষ করা যায়। সেখানে ঘোষ, বসু, মিত্র পদবির কয়েকজন কায়স্থ ব্যক্তি কৈবর্তদের ভৃত্য বলে উল্লেখ করেছেন।[১৭] এ থেকে বোঝা যায় সে সময়ে কৈবর্তদের সমাজে মর্যাদা দেওয়া হতো না। এছাড়া কৈবর্তদের নেতৃত্ব গ্রহণেও তাদের প্রচণ্ড আপত্তি দেখা যায়। সেখানে বলা হয় কায়স্থরা সবসময়ে ব্রাহ্মণদের দলপতি বা নেতা হিসেবে গ্রহণ করতো। নিতান্ত বাধ্য না হলে তারা কায়স্থ দলপতিও স্বীকার করে না। এই কলামে কৈবর্তদের কটাক্ষ করে লেখা হয়েছে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কিভাবে কিছু কৈবর্ত বিভিন্ন গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে কায়স্থ পরিচয় নিয়ে বসবাস করছে। কলাম লেখকদের মতে, তাদের সাথে আহার গ্রহণ ও বসবাসের জন্য প্রকৃত কায়স্থরা স্পর্শদোষ ও একঘরে হওয়ার শাস্তি ভোগ করছে এবং এর জন্য দায়ী কৈবর্তরা। একটি পরিবারের বংশপরম্পরায় প্রকৃত জাতিবর্ণ এবং পরিবর্তিত জাতিবর্ণের বর্ণনা করে কায়স্থরা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। যার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এ রকম:

বর্ধমান জেলার সোনা টিকলি গ্রামে বিজয়রাম কলে নামে একজন কৈবর্ত ব্যক্তি ছিলেন। যার পাঁচজন ছেলে ছিলো। এরা হলেন, ১. দুলাল সদ্দার, ২. সদাশিব তৈলদার, ৩. কান্ত মাড়, ৪. কন্দর্প দাস, ৫. কণ্ঠিরাম খুস্কি। জ্যেষ্ঠ পুত্র দুলাল সদ্দার দোকানদার ছিলেন। পত্রিকাটির লেখা অনুযায়ী, এই দুলাল সদ্দারের জন্যই প্রায় ২০০ ঘর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি বিভিন্ন জাতির মধ্যে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু সকল জাতির কাছ থেকেই বহিষ্কৃত হন। কায়স্থদের দাবি, শেষ পর্যন্ত সমাজে তাঁর পরিচয় কৈবর্ত নাকি কায়স্থ, না সদ্‌গোপ কিছুই নির্ধারণ করা যায়নি। পত্রিকার বর্ণনানুযায়ী, একই পরিণতি দেখা যায় চতুর্থ ভাই কন্দর্প দাসের। কায়স্থরা মনে করে, তাঁর সন্তানেরা কৈবর্ত বা কায়স্থ কোনো পরিচয়েই নির্দিষ্ট থাকেনি। দ্বিতীয় সদাশিব তৈলদার, যার সন্তানেরা নিজেদের কায়স্থ পরিচয়ে পরিচিত করে তুলেছিলো। তৃতীয় কান্ত মাড়, এঁর সন্তান প্রীতরাম মাড়। এই প্রীতরাম মাড় হলেন দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রানি রাসমণির শ্বশুর। প্রীতরামের ছেলে রাজচন্দ্র দাস হলেন রাসমণির স্বামী। কলকাতার বিখ্যাত ধনবান পরিবারগুলোর একটি ছিলো এই মাড় পরিবার। যারা নিজেদের কৈবর্ত পরিচয় পরিবর্তন করেননি। সর্বশেষ কণ্ঠিরাম খুস্কি; পত্রিকাটির মতে, তাঁর সন্তানরা ঘোষ পদবি নিয়ে কুলীন হতে চেয়েছিলো, কিন্তু তা না হয়ে গোয়ালা পরিচয় পেয়েছিলো।[১৮]

[১৭] তদেব, পৃ. ২৭৪।

[১৮] তদেব, পৃ. ২৭৫।

পত্রিকাটির এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সমকালে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামাজিক মর্যাদা কেমন ছিলো। তবে লক্ষণীয় একটি বিষয়, সমাজে মর্যাদা অর্জনে শুধু জাতি পরিচয় নয়, অর্থ, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে সে বিষয়টিও মাহিষ্য সমাজ ধীরে ধীরে বুঝতে পারে। রানি রাসমণির পরিবার কৈবর্ত জাতিবর্ণের হলেও তাদের আর্থিক সঙ্গতি এবং শিক্ষার জন্য সমকালীন সমাজে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রেখেছিলো।

উনিশ শতকে কৈবর্তদের সামাজিক মর্যাদার স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্যের 'স্বম্বন্ধ নির্ণয়' (১৮৭৫) বইয়ে। সমকালীন হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ ও ধর্মসংক্রান্ত ধারণা সৃষ্টিতে বইটি প্রভাব ফেলে। এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম বাঙালি হিন্দুর জাতিবর্ণগুলোকে মর্যাদার ক্রম অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়। তিনি যাবতীয় বাঙালি হিন্দুদের ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই ভাগে ভাগ করেন। ব্রাহ্মণদের তিনি পাঁচ ভাগে ভাগ করেন। যথাঃ রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, সাতশতী, মধ্যশ্রেণী ও পশ্চিমা (ঔপনিবেশিক) ব্রাহ্মণ। শূদ্রগণকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন, সেগুলো হলোঃ ১. সৎশূদ্র, ২. জল আচরণীয় শূদ্র, ৩. জল অব্যবহার্য শূদ্র, এবং ৪. অস্পৃশ্য শূদ্র।[১৯]

> ১. সৎশূদ্র।–কায়স্থ ও নবশাখ জাতি দ্বারা সৎশূদ্র জাতি সঙ্ঘটিত হইয়াছে। ইহাদের পুরোহিত এক। বসু,গুহ, মিত্র উপাধি ব্যতীত অন্যান্য উপাধিগুলি প্রায় সাধারণ। গোত্রও অনেক স্থলে সমান। আচার ব্যবহার পরস্পর অনুরূপ। ইহারা পুরোহিতের গোত্র অনুসারে গোত্রপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আধুনিক পুরোহিতের গোত্রানুসারে গোত্র পরিবর্তন বা নূতন প্রাপ্তির উপায় নাই।
>
> ২. জল আচরণীয় শূদ্র।–যে সকল শূদ্র জাতির জল ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতিরা গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে অশুচি জ্ঞান করেন না, তাহাদিগকেই জল আচরণীয় বলা যায়।
>
> ৩. জল অব্যবহার্য শূদ্র।–যে সকল শূদ্রকে স্পর্শ করিলে বর্ণ চতুষ্টয়ের উচ্চ জাতিরা আপনাদিগকে অশুচি জ্ঞান করেন, এবং তৎস্পৃষ্ট জলও অপবিত্র জ্ঞান করেন, তাহাদিগকে জল অব্যবহার্য শূদ্র কহা যায়।
>
> ৪. অস্পৃশ্য শূদ্র।– যে সকল ব্যক্তির সংস্পর্শাক্রান্ত গঙ্গাজল পর্যন্ত অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং যাহাদিগের সংস্পর্শ মাত্রে অপবিত্রতা জন্মে, তাহারাই অস্পৃশ্য শূদ্র বলিয়া পরিগণিত।[২০]

---

[১৯] লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য, *স্বম্বন্ধ নির্ণয়* (১৮৭৫; ২য় সং; কলকাতাঃ শশিভূষণ ভট্টাচার্য, ১৮৯৬), পৃ. ১০৮।

[২০] তদেব।

এই বিভাজন অনুযায়ী কৈবর্তদের ধীবরের সমজাতীয় বলে মনে করা হয়। লালমোহন মনে করেন এরা পূর্বে অস্পৃশ্য ছিলো। কিন্তু পরবর্তী কালে তারা স্পৃশ্য হয়।[২১] এই প্রসঙ্গটা আলোচনা করতে গিয়ে লালমোহন একটি গল্পের অবতারণা করেন। যদিও গল্পটি বল্লাল চরিতে পাওয়া যায় না। গল্পটি এ রকম: রাজা বল্লাল সেন নিজের ছেলে লক্ষ্মণ সেনের প্রতি রাগান্বিত হয়ে তাঁর শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দেন। প্রাণভয়ে লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে যান। রানী ছেলেকে ফিরে পেতে ইষ্টদেব-মন্দিরের সামনে একটি কবিতা লিখে রাখেন। কবিতাটি দেখে রাজার মন পুত্রস্নেহে উদ্বেল হয়। তিনি নৌজীবীদের আদেশ করেন, যে আমার পুত্রকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারবে তাদের আমি সাধ্যমত প্রার্থনা পূরণ করবো। একথা শোনামাত্র নাবিকরা নৌকা ভাসালো এবং যথাসময়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসলো। নির্বাসিত ছেলে লক্ষ্মণ সেনকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য রাজা খুশি হয়ে জানতে চাইলেন, তারা কি চায়। উত্তরে তারা জানালো, তারা সাধারণ সমাজে স্পৃশ্য হতে চায়। পুরস্কার স্বরূপ রাজা তাদের অস্পৃশ্য থেকে স্পৃশ্য করে দেন।[২২] তখন তারা নিজেদেরকে জেলেদের (নাবিক) থেকে পৃথক ঘোষণা করলো এবং তাদের জন্য আলাদা পুরোহিত চাইলো। এ দাবি শুনে প্রেক্ষিতে রাজা যাকে নিয়োগ দিলেন সে ব্যক্তি অস্পৃশ্য ছিলো। এ উদাহরণ দিয়ে লালমোহন প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, কৈবর্তরা অস্পৃশ্য না হলেও তাদের পুরোহিত অস্পৃশ্য।[২৩]

লালমোহনের বিভাজনের পাশাপাশি জাতিবর্ণগুলোর পারিসংখ্যানিক বিবরণ পাওয়া যায় ১৮৭২ সালে সূচিত উপমহাদেশের প্রথম আদমশুমারি থেকে। সম্ভবত ব্রিটিশ কর্মকর্তা এইচ এইচ রিজলি তাঁর 'ট্রাইবস্ এন্ড কাস্টস অব বেঙ্গল' গ্রন্থ লেখার ক্ষেত্রে এই ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আদমশুমারি রিপোর্টগুলোতেও এর প্রতিফলন পাওয়া যায়।

১৮৯১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে হাওড়ার হিন্দু জাতিবর্ণগুলোর সামাজিক মর্যাদানুক্রমিক একটি তালিকা প্রকাশিত হয়।[২৪] তালিকাটি ছিলো এমন: ১. ব্রাহ্মণ, ২. কায়স্থ, ৩. বৈদ্য, ৪. বাড়ুই, ৫. তাম্বুলি, ৬. তেলি, ৭. কুমার, ৮. কামার, ৯. সঙ্করি, ১০. নাপিত, ১১. গন্ধবণিক, ১২. সদ্গোপ, ১৩. কাঁসারি, ১৪. মালাকার, ১৫. ময়রা, ১৬. তাঁতি, ১৭. কৈবর্ত, ১৮. গোপ

---

[২১] তদেব, পৃ. ১৭১।

[২২] তদেব, পৃ. ১৭২।

[২৩] তদেব, পৃ. ১৭৩।

[২৪] *Report on the Census of Bengal 1891*(Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1891), p. 16.

(গোয়ালা), ১৯. সুবর্ণবণিক, ২০. বৈষ্ণব, ২১. কলু, ২২. ধোপা, ২৩. শুঁড়ি, ২৪. বাগদি, ২৫. ঢুলি, ২৬. জেলে, ২৭. তিয়র, ২৮. কয়রা, ২৯. হাড়ি, ৩০. চণ্ডাল, ৩১. মুচি।

তালিকাটিতে দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে অন্যান্য জাতিবর্ণগুলোর পর্যায়ক্রমে স্থান নির্দেশিত হয়েছে। অনুক্রম অনুযায়ী কৈবর্ত ১৭ নম্বরে এবং এর পূর্বে বাড়ুই, তাম্বুলি, তেলি, নাপিত, গন্ধবণিক, সদ্‌গোপ প্রভৃতি জাতিবর্ণের অবস্থান। এমন মর্যাদা হানিকর অবস্থানের কারণেই কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। শুধু কৃষক নয় সম্ভ্রান্ত অনেক জমিদার ব্যক্তিগতভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, আবার কখনো এর বিরুদ্ধে সমিতিও গঠন করেছেন। অনেক জাতিবর্ণ নিজেদের সভা-সমিতি তৈরি করে এবং জাতিবর্ণের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার আন্দোলনে যুক্ত হয়। এ তালিকা থেকে চাষি কৈবর্ত জাতিবর্ণের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সচেতন হয় এবং মাহিষ্য নাম গ্রহণ ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করে।[২৫]

ব্রিটিশ কর্মকর্তা উইলিয়াম হান্টার রচিত 'এ স্টাটিসটিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল' গ্রন্থটিতে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। সেখানে কৈবর্তদের বিভিন্ন ভাগের মধ্যে দেখা যায়, চাষি কৈবর্ত বা কৃষিজীবী কৈবর্তরা সমাজে সম্মানিত স্থানে রয়েছে। কিন্তু রেশম চাষি, সিউলি এবং মালো কৈবর্তরা সমাজে অস্পৃশ্য হিসেবে বিবেচিত হতো।[২৬]

এই বিভাজন, পেশা ও অবস্থান ইত্যাদি বিষয় থেকে মর্যাদার যে জটিল অবস্থা তৈরি হয়, তা থেকে মুক্তির পথ বের করতে কৈবর্তদের সংগঠিত আন্দোলনের সূচনা। আন্দোলনটি 'মাহিষ্য আন্দোলন' নামে পরিচিতি পায়।

৪. মর্যাদা বৃদ্ধির আন্দোলন: সূচনা পর্ব

মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কৈবর্ত জাতিবর্ণের প্রথম পদক্ষেপ ছিলো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছ থেকে ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করা। ১৯৬৪ সালে ঢাকার বিক্রমপুরের ৬৪ জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করে রাখা হয়, যেখানে শাস্ত্রীয় বচনের মাধ্যমে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামাজিক স্থান ও মর্যাদা নির্দিষ্ট থাকে।[২৭]

---

[২৫] গোপালচন্দ্র সরকার, *মাহিষ্য-নামোদ্ধারের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৫।

[২৬] W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal,* vol.1 (London: Turbner & Co., 1875), p. 64.

[২৭] গোপালচন্দ্র সরকার, *মাহিষ্য-নামোদ্ধারের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৪৩।

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে কৈবর্ত জাতির প্রতি লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্যের মন্তব্য ছিলো অমর্যাদাকর। এতে শিক্ষিত চাষি কৈবর্ত সমাজ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে। ১৮৭৫ সালে 'এডুকেশন গেজেট' নামের সাপ্তাহিক পত্রিকায় পাবনার অধিবাসী সুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস একটি প্রবন্ধ লিখে লালমোহনের উক্তির প্রতিবাদ করেন। বিশেষ করে বল্লালচরিতে কৈবর্তদের নিয়ে যে অপবাদটি রয়েছে তা যে ভ্রান্ত সেটা তিনি প্রমাণ করেন। এ নিয়ে তিনি 'বল্লাল-চরিত (সমালোচনা)' নামে একটি বইও প্রকাশ করেন। এ বিষয়টি নিয়ে এডুকেশন গেজেট পত্রিকায় দুজনের বিরোধিতায় লেখালেখি চলতে থাকে। অবশেষে প্রায় এক বছর পর লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন এবং চাষি কৈবর্ত জাতির মাহিষ্যত্ব স্বীকার করে নেন। পরবর্তী কালে তাঁর বইয়ের পরিশিষ্টে হালিক কৈবর্তই যে মাহিষ্য তা উল্লেখ করেন।[২৮] চাষি কৈবর্ত ও মাহিষ্য যে এক জাতি লালমোহনের এই স্বীকারোক্তি এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ব্যাপকভাবে মাহিষ্য নাম ব্যবহার শুরু হয়।

১৮৮৯-৯০ সালের দিকে ঢাকা অঞ্চলের কৈবর্ত সম্প্রদায়ের মানুষ 'ঢাকা মাহিষ্য সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করে। এ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ঢাকার জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং বসন্তকুমার রায়। বসন্তকুমার রায় 'মাহিষ্য বিবৃতি' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। নান্নুরের জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই কাজে উৎসাহ প্রদান করেন। এটা মাহিষ্যদের নিয়ে লেখা প্রথম গ্রন্থ। তবে বসন্ত রায়ের মৃত্যুতে মাহিষ্য আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়, কারণ জাতিতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিলো। মাহিষ্য বিবৃতিতে যে শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখানো হয় এর ভিত্তিতেই হয়তো ১৮৯১ সালের আদমশুমারিতে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি মাহিষ্য নামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। সে সময়ে যদিও পুরো বাংলার চাষি কৈবর্তদের মাহিষ্য নাম গ্রহণের কোনো ব্যবস্থা শুরু হয়নি তবুও ঢাকা মাহিষ্য আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

ঢাকা মাহিষ্য সমিতি উইলিয়াম হান্টারকে একটি চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন বাংলার শুমারি কর্তৃপক্ষকে চাষি কৈবর্ত নামের পরিবর্তে মাহিষ্য নামে উল্লেখ করেন। এর উত্তরে হান্টার জানান যে, বর্তমানে ভারত সরকারের সাথে তার সম্পর্ক নেই তাই মাহিষ্য বা চাষি কৈবর্ত সম্পর্কে তিনি কিছু করতে পারছেন না। তবে তিনি মনে করেন, এ বিষয়ে যুক্তি এতোটাই প্রবল যে, শুমারি কর্তৃপক্ষ এতে মনোযোগ না দিয়ে পারবেন না।[২৯]

---

[২৮] তদেব, পৃ. ১৩।

[২৯] সত্যরঞ্জন বিশ্বাস, *মাহিষ্য আন্দোলনের ইতিহাস* (কলকাতা: নিউ ভারতী প্রেস, ১৯৮৯), পৃ. ১৩।

পূর্ববঙ্গে ঢাকা এবং পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুরে প্রায় সমকালে মাহিষ্য নাম গ্রহণের চেষ্টা করা হয়। ১৮৯১ সালের আদমশুমারিতে মেদিনীপুর জেলায় মাহিষ্য নামের উল্লেখ পাওয়া গেলেও তা একটি পরিবারের মধ্যেই সীমিত ছিলো।[৩০] মেদিনীপুর জেলাও বিভিন্ন কারণে মাহিষ্য আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে পড়ে। বিভিন্ন নামে পরিচিত চাষি কৈবর্ত জাতির একত্ববোধ তৈরি, অশৌচ পালনের পার্থক্য দূর করা, কৈবর্তদের পুরোহিত নিয়ে কুসংস্কার দূর করা প্রভৃতি ছিলো মেদিনীপুর মাহিষ্য আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

মেদিনীপুর জেলার তাজপুরের জমিদার নরহরি জানা অবগত হন মাহিষ্য ও চাষি কৈবর্ত একই জাতি। এটা জানার পর জমিদার তিনটি সভা করেন। এতে মেদিনীপুর অঞ্চলে মাহিষ্য নাম গ্রহণের যৌক্তিকতা এবং মাহিষ্য সংস্কারাদি (অশৌচকাল বিধি, উপবীত ধারণ) প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। কিন্তু তখনও সমগ্র বাংলায় এমনকি মেদিনীপুরের সর্বত্র মাহিষ্য নাম প্রচলনের চেষ্টা করা হয়নি। সভায় উত্থাপিত ও মীমাংসিত কিছু প্রশ্ন ছিলো। এগুলো হলো:

১. হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী মাহিষ্য জাতি রয়েছে কিনা, মাহিষ্য ও কৈবর্ত জাতির মধ্যে কোনো প্রভেদ আছে কিনা বা শাস্ত্রের উৎপত্তি অনুযায়ী এক জাতি হিসেবে বিবেচিত হবে কিনা?
২. মাহিষ্য, চাষি কৈবর্ত, দাস প্রভৃতি জাতিগুলোর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রচলিত আছে কিন্তু অশৌচ পালনের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। শাস্ত্র অনুযায়ী এর বিধান কী হবে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে সভায় সিদ্ধান্ত হয়, বর্তমানে মাহিষ্য জাতি বিদ্যমান এবং অন্য অনেক জাতি এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা হতে অনেক সময় লাগে। শেষ পর্যন্ত বৈশ্য মাতার বংশধর হিসেবে পনেরো দিন ধার্য করা হয়। এ সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় মাহিষ্যদের পক্ষে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'সেবিকা' পত্রিকার কথা, ১৮৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে 'সেবিকা' নামে একটি পত্রিকা বের হয়। আন্দোলনের প্রচারণার স্বার্থেই মাহিষ্যদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে একটা পত্রিকা বের করা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। এই লক্ষ্যে কলকাতার শশীভূষণ বিশ্বাসের বাড়িতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার পাশাপাশি কলকাতায় আরও কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়, যদিও শেষ পর্যন্ত পত্রিকা বের করা সম্ভব হয়নি। এ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলেও চাষি কৈবর্তরা যে মাহিষ্য নাম গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলো কলকাতা সহ বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সভা তাই প্রমাণ করে।

---

[৩০] তদেব।

ঢাকা, মেদিনীপুরের পর পাবনা জেলায় মাহিষ্য সমিতি গঠিত হয়। ১৮৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে সুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাসের নেতৃত্বে পাবনা মাহিষ্য সমিতি স্থাপিত হয়।[৩১] তাঁর তত্ত্বাবধানে ১৯০০ সালের জুন মাস পর্যন্ত সমিতির কাজ চলতে থাকে। শুরুতে সদস্য সংখ্যা খুব কম ছিলো।

পাবনা জেলার প্রায় সমকালে নদীয়া জেলার দরিয়াপুর গ্রামে মাহিষ্য সমিতি গঠিত হয়। দরিয়াপুর সমিতি প্রথম দিকে নদীয়া জেলার পরবর্তী কালে মুর্শিদাবাদের কিছু অংশের মাহিষ্যদের আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিলো। পাবনা মাহিষ্য সমিতির নেতৃবৃন্দের মধ্যে দরিয়াপুরের হীরালাল বিশ্বাস এবং মাধবপুরের গগনচন্দ্র বিশ্বাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

বেশ কিছু জায়গায় মাহিষ্য সমিতি গঠিত হয় ঠিকই কিন্তু তাদের কর্মপদ্ধতি এবং তা বাস্তবায়নে সমিতিগুলোর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। এ সময়ে ঢাকা, পাবনা, নদীয়া মাহিষ্য সমিতি প্রায় নেতৃশূন্য অবস্থায় কাটায়। তবে আন্দোলনের হাল ধরে রাখেন পাবনার সুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস। সমিতিগুলোর মতানৈক্য শুরু হয় কাজ করতে গিয়ে। প্রথমে সমিতির সিদ্ধান্ত হলো আদমশুমারি প্রতিবেদনে জাতিবর্ণটির কৈবর্ত নাম পরিবর্তন করে মাহিষ্য নামে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। এ লক্ষ্যে তারা কাজও শুরু করে।

ঢাকা মাহিষ্য সমিতি প্রথম দিকে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় শুমারি কর্তৃপক্ষের কাছে নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব না পাঠিয়ে গোপনে এই কাজ করতে চেয়েছিলো। এ সমিতির যুক্তি ছিলো গণনার সময়ে একযোগে বহু চাষি কৈবর্ত মাহিষ্য নামে অন্তর্ভুক্ত হলে আদমশুমারি কর্তৃপক্ষ তা অস্বীকার করতে পারবে না। ঢাকা সমিতি চেয়েছিলো সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা সমতুল্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা যদি একটি আবেদনপত্র লিখে কোনো নামকরা উকিল দিয়ে গভর্নরের কাছে পাঠানো যায় তবে তা অনেক গুরুত্ব পাবে। আবেদনপত্র কেমন হবে, কী কী বিষয় থাকবে এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হলেও এ চাওয়া বাস্তব কোনো রূপ লাভ করেনি।

পাবনা ও নদীয়া সমিতি এই সিদ্ধান্তে আপত্তি জানায়। পাবনা ও নদীয়া মাহিষ্য সমিতির সাথে ঢাকা মাহিষ্য সমিতির সিদ্ধান্ত নিয়ে আপত্তি থাকায় বাধ্য হয়ে ঢাকা সমিতি বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর সমীপে একটা আবেদনপত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

[৩১] তদেব, পৃ. ১৯।

৫. মর্যাদা বৃদ্ধির আন্দোলন: চূড়ান্ত পর্ব

কৈবর্ত জাতিবর্ণের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বিচ্ছিন্ন এবং সংগঠিত উদ্যোগের মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। সূচনা পর্বে চেষ্টাগুলো ছিলো বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ। সংগঠিত উদ্যোগ জোরালো ভাবে শুরু হয় পাবনা মাহিষ্য সমিতির মধ্য দিয়ে।

পাবনা মাহিষ্য সমিতির নেতা গোপালচন্দ্র সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শুধু চাষি কৈবর্ত জাতিবর্ণের পক্ষ থেকে আবেদনপত্রে অনেক স্বাক্ষর গ্রহণ করলেই হবে না বরং দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যদি এই ধরনের আবেদন প্রেরণ করা হয় তাহলে সরকার গুরুত্ব দেবে এবং এ অনুযায়ী ফল পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে পাবনা মাহিষ্য সমিতি। একটি আবেদনপত্র তৈরি করে সকল সমিতিকে নির্দেশ দেয় হয় যেন অতি দ্রুত অসংখ্য ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ আবেদন সরকারী অফিসে পাঠানো হয়। দ্রুত বলা হয় এজন্য যে সময়টা ছিলো ১৯০০ সালের আগস্ট মাস। লোক গণনার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলো সরকার। ডিসেম্বরের মধ্যেই সকল কাগজ সারাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হতো।

পাবনা সমিতির মুদ্রিত আবেদন যে সকল স্থানে পাঠানো হয় তার দুই-একটি ছাড়া প্রায় স্থানেই সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিলো। অবিভক্ত বাংলার প্রেসিডেন্সি, রাজশাহী, বর্ধমান ও ঢাকা বিভাগের অধিকাংশ স্থানে পাবনার আবেদনপত্র অপরিবর্তিতভাবে পাঠানো হয়। শুধু হাওড়ার কিছু কিছু স্থান থেকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে পাঠানো হয়।

মাহিষ্য জাতির একজন ব্রাহ্মণ অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী মাহিষ্য আন্দোলনে একজন সহযোগী ছিলেন। ২৪ পরগনা জেলার 'সেবিকা' পত্রিকার সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ হালদার আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। তাঁর পত্রিকার কল্যাণেই মাহিষ্য নাম প্রচারের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়েছিলো। পাবনা মাহিষ্য সমিতি থেকে সুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাসের লেখা 'সম্মিলনী' নামে একটি পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। সর্বসাধারণের পক্ষ থেকে আবেদন পাঠানোর সিদ্ধান্তে ঢাকা সমিতির মত ছিলো না।

আবেদনপত্র পাঠানোর সাথে সাথেই প্রচার প্রচারণা শুরু হয়ে যায়। পাবনা, নদীয়া, হাওড়া সমিতি প্রচারণায় এগিয়ে ছিলো। কলকাতায় তখনও কোনো সমিতি ছিলো না। গগনচন্দ্র বিশ্বাস কলকাতায় সমিতি স্থাপনের জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। লক্ষ্য অনিশ্চিত জেনেও পাবনা সমিতির সদস্যরা বিশেষ করে সুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস, সতীনাথ সরকার ও দীননাথ দাস এই তিন ব্যক্তি অনেক শ্রম দিয়েছেন সমিতির জন্য।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত আবেদনপত্র আদমশুমারির দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা ই এ গেইটের কাছে পাঠানো হয়। তিনি আবেদন গ্রহণ করেন এবং সকল জেলার কর্মরত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে পাবনা মাহিষ্য সমিতির আবেদনপত্রের প্রতিলিপি পাঠিয়ে দেন। আবেদনপত্রের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছ থেকে রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এসব রিপোর্ট শুমারি সুপারিনটেনডেন্ট গেইটের কাছে পাঠানো হয়। কোন জেলা কী রিপোর্ট পাঠিয়েছে তা জানা না গেলেও অধিকাংশ ম্যাজিস্ট্রেট যে নেতিবাচক রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন এটা বোঝা যায় লোকগণনা শুরু হলে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলো পাবনা জেলা। সম্ভবত এখানকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মাহিষ্য জাতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। চাষি কৈবর্তরা যে মাহিষ্য হতে পারে গোপালচন্দ্র সরকারের অনুরোধে এ বিষয়টা তিনি রিপোর্টে উল্লেখ করেন।

১৯০০ সালের অক্টোবর মাসে ই এ গেইট একটা বিশেষ কাজে পাবনায় আসেন। এ তথ্যটি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে জেনে গোপালচন্দ্র সরকার এবং দরিয়াপুরের হীরালাল বিশ্বাস পাবনায় আসেন। গেইটের সাথে দেখা করার জন্য তাঁরা দুজন লিখিতভাবে অনুরোধ জানান। কিন্তু গেইট নির্ধারিত কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দেখা করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তবে আশ্বাস দেন কলকাতায় গিয়ে মাহিষ্য জাতিবর্ণের প্রতিনিধিরা যদি দেখা করতে চান তিনি তাদের সময় দেবেন। সেক্ষেত্রে প্রতিনিধির সংখ্যা হবে অনধিক পাঁচ জন। ১৯০০ সালের ১১ নভেম্বর দেখা করার সময় নির্ধারণ হয়।[৩২] ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন জানবাজারের ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস ও তাঁর বড়ো ছেলে, নদীয়ার হীরালাল বিশ্বাস, প্যারিমোহন সিকদার এবং পাবনার গোপালচন্দ্র সরকার। সর্বসম্মতিক্রমে গোপালচন্দ্র সরকার প্রধান প্রতিনিধি নিযুক্ত হন।

ই এ গেইট ১১ নভেম্বরের সভাতে মাহিষ্য জাতি বিষয়ক বেশ কিছু প্রশ্নের অবতারণা করেন। সেগুলো হলো:

১. মাহিষ্য নামে ভারতবর্ষে কোনো হিন্দু জাতি ছিলো কিনা?
২. হালিক ও জালিক কৈবর্ত জন্মগতভাবে এক না হলে এদের নাম এক হতে পারে কিনা?
৩. উভয় জাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান কিনা?

প্রশ্নের উত্তরে তিনি শাস্ত্রের উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য মনে করেননি বরং এগুলোর চেয়ে ঐতিহাসিক যুক্তি এবং প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতিকে গুরুত্ব দেন। কৈবর্ত সম্পর্কে হিন্দু সমাজের ধারণা এবং

[৩২] গোপালচন্দ্র সরকার, *মাহিষ্য-নামোদ্ধারের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ২০।

কোথায় কোথায় কৈবর্তরা অস্পৃশ্য এ তথ্য গেইট আগে থেকেই সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে এ সভা চলতে থাকে এবং শেষে তিনি একটা কাগজে 'চাষা কৈবর্ত (মাহিষ্য)' লিখে গোপালচন্দ্র সরকারকে জিজ্ঞেস করেন এ রকম লিখলে তারা সন্তুষ্ট হবেন কিনা।[৩৩] প্রতিনিধিদের সম্মতিতে গোপালচন্দ্র জানান, আদমশুমারি রিপোর্টে কৈবর্ত নামে আলাদা শ্রেণি থাকলে তাদের কোনো আপত্তি নেই তবে 'চাষা' শব্দটির বদলে তারা 'চাষি' শব্দটি দাবি করেন।

শুমারি কর্মকর্তা ই এ গেইট মাহিষ্য আন্দোলনকারীদের আবেদন অনুযায়ী প্রত্যেক জেলায় চিঠি প্রেরণ করেন এই মর্মে যে, চাষি কৈবর্ত জাতি কৈবর্ত নামে অপর একটি জাতি থেকে পৃথক। সুতরাং শুমারি রিপোর্টে 'চাষি কৈবর্ত (মাহিষ্য)' শীর্ষক আলাদা শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হবে। এ বিষয়টা ছিলো মাহিষ্য আন্দোলনকারীদের কাছে প্রথম সাফল্য। প্রত্যেক জেলাতে এ বার্তা পৌঁছালেও মাহিষ্য সমিতির কাজ তখনও শেষ হয়নি। গণনা কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা সক্রিয় থেকেছে।

গেইটের আদেশ জেলার প্রত্যেক কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক এবং গণনাকারীদের নিকট পাঠানো হয়। আন্দোলনকারীরা মনে করে এ আদেশ যথাযথভাবে পালন করা হয়নি। তাদের ধারণা কোনো কোনো স্থানে গণনাকারীরা চাষি কৈবর্তকে মাহিষ্য নামে অন্তর্ভুক্তি করতে অস্বীকৃতি জানায় আবার কোথাও জেলে কৈবর্তদের মাহিষ্য নামে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ঢাকা, ফরিদপুর এবং রংপুরে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয় সেখানে পাবনার সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস গিয়ে তা সমাধান করেন।

শুমারি কর্মকর্তার আনুষ্ঠানিক পত্র পাওয়ার সাথে সাথে চাষি কৈবর্ত জাতিবর্ণের একটি অংশ এবং তাদের পুরোহিতগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্নভাবে নিজেদের সম্প্রদায়ের গৌরবের কথা গেইটকে লিখে পাঠায়, যেটা ছিলো অপ্রয়োজনীয়। শুধু তাই নয় এরা সমাজের অন্যান্য জাতিবর্ণ যেমন শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের সাথে বিরোধিতা সৃষ্টি করে। যেটা মাহিষ্য আন্দোলনকারীদের জন্য বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে।

সাধারণ হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া আন্দোলনের পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। কারণ সাধারণ হিন্দুদের অনেকে কৈবর্তদের এই নাম পরিবর্তনের বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। হাওড়া, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ এই তিন জেলা থেকে প্রকাশ্যভাবে মাহিষ্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আসতে থাকে।

[৩৩] তদেব, পৃ. ২১।

শুরুতে এই প্রতিবাদ ছিলো পত্রিকার মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সে সময়ে 'মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন একজন মাহিষ্য। তিনি একটি শ্রাদ্ধ ১৫ দিনে করলে সাধারণ হিন্দুরা প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করে। এজন্য তারা একটি সভা করে। সভাতে কৈবর্ত জাতির (হালিক, জালিক) অস্পৃশ্যতা এবং শাস্ত্রানুযায়ী কৈবর্তদের অশৌচ ৩০ দিন পালনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। শুধু তাই নয়, সভার মন্তব্যগুলোকে লিখিত আকারে গেইটের কাছে পাঠানো হয় এবং 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৩৪] হাওড়া ও নদীয়া জেলা থেকেও একই ধরনের প্রতিবাদপত্র গেইটের কাছে যায়। পরে এর ব্যাপকতা বাড়তে থাকে। এমনকি মাহিষ্যদের অন্যান্য সংস্কার পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়েও সাধারণ হিন্দুরা সমালোচনা করে।

মাহিষ্য আন্দোলনের বিরোধী বর্ণহিন্দুদের মধ্যে একজন বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী। একটি বইয়ের আলোচনায় তিনি সমালোচনা করেন এভাবে –

> মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ক্ষত্রিয় পিতা এবং বৈশ্য মাতার গর্ভজাত পুত্রকে মাহিষ্য বলিয়াছেন। কৃষি ভিত্তিক বা হালুয়া কৈবর্ত অথবা নৌজীবী জালুয়া দাশ বা কৈবর্ত 'মাহিষ্য' বলিয়া বোধ হইতেছে না। পূর্বে কৈবর্ত ও যুগী জাতির লোকেরা নিরক্ষর ছিলো। ইহাদের কোনো প্রাচীন গ্রন্থ থাকা সম্ভবপর নহে।[৩৫]

সাধারণ হিন্দুদের দাবি, হালিক এবং জালিক কৈবর্ত একই জাতির দুটি সম্প্রদায় মাত্র। এক্ষেত্রে তারা মনুসংহিতা এবং বল্লাল সম্পর্কিত প্রবাদের উদাহরণ ব্যবহার করেন। সাধারণ মানুষদের মধ্যে বল্লালী প্রবাদ খুব জনপ্রিয় ছিলো।

আন্দোলনের বিরুদ্ধতাকারীদের পাল্টা প্রতিবাদ করার জন্য মাহিষ্য সমিতি প্রথমে সংস্কৃত কলেজের ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করে। কারণ ব্রিটিশ আমলে জাত-পাত সংক্রান্ত ধারণার জন্য সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। সে সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নীলমণি মুখোপাধ্যায়সহ দশজন পণ্ডিত এই ব্যবস্থাপত্রটি প্রদান করেন।[৩৬]

সংস্কৃত কলেজের এই ব্যবস্থাপত্র পাওয়াটা আন্দোলনকারীদের জন্য সহজ ছিলো না। ব্যবস্থাপত্রের শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতিগুলো আন্দোলনকারীদেরই সংগ্রহ করতে হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে কাজটি করেছিলেন পাবনার সুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস। তিনি তাজপুরসহ বিভিন্ন স্থান থেকে পূর্বে তৈরিকৃত

---

[৩৪] তদেব, পৃ. ২৫।

[৩৫] বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী, *আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ পদ্ধতি* (কলকাতা: গ্রন্থকার, ১৯৩২), পৃ. ১১৮; উদ্ধৃত, স্বরোচিষ সরকার, *অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ* (২য় সং; ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৮), পৃ. ৫১।

[৩৬] তদেব, পৃ. ২৬।

বিক্রমপুরের ব্যবস্থাপত্রের প্রতিলিপি সংগ্রহ করেন। হয়তো এগুলোর উপর নির্ভর করেই সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণ নতুন ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা সঙ্গত বলে বিবেচনা করেছিলেন। এ কাজে সুদর্শন বিশ্বাসকে সাহায্য করেছিলেন জানবাজারের জমিদার ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস।

তবে ব্যবস্থাপত্রে যে শ্লোকগুলো ছিলো তার মৌলিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এবার প্রাচীন পুথিতে শ্লোকগুলো আছে কিনা আন্দোলনকারীদের তা পর্যবেক্ষণ এবং সংগ্রহ করতে হয়। আন্দোলনের বিরুদ্ধকারীরা গেইটের কাছে রিপোর্ট পাঠায় যে চাষি কৈবর্তরা আবেদনে ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতা থেকে কৈবর্তের উৎপত্তি সংক্রান্ত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের যে শ্লোক উদ্ধৃত করেছে তা প্রকৃতপক্ষে নেই। এর ফলে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সংস্কৃত হস্তলিখিত গ্রন্থ খুঁজতে শুরু করে। পাবনার গোপালচন্দ্র সরকার জানতেন হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ পুরীর শঙ্করাচার্যের মঠে রক্ষিত আছে। তুলট কাগজে লিখিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের শ্লোকটি সুদর্শনচন্দ্র সংগ্রহ করেন।[৩৭] এই অনুসন্ধানে যে ব্যয় হয়েছিলো তা বহন করেন গগনচন্দ্র বিশ্বাস।

ব্যবস্থাপত্র এবং এই প্রমাণ শুমারি কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হয়। শাস্ত্রীয় প্রমাণ গেইটের কাজকে আরও কঠিন করে দেয়। এতে করে আন্দোলনকারীদেরই ক্ষতি হয়। এসে যায় তৃতীয় পক্ষ। কলকাতার জনৈক নামকরা পণ্ডিতকে স্বপক্ষ-বিপক্ষের সমস্ত যুক্তি দেখানো হয় যিনি চাষি কৈবর্তদের বিপক্ষে মত প্রদান করেন। এ সময়ে গেইট নদীয়ার মহারাজাকে অনুরোধ করেছিলেন নবদ্বীপের পণ্ডিতদের মতামত জানানোর জন্য। পণ্ডিতরা যে মতামত দেয় তা আন্দোলনকারীদের পক্ষে ছিলো। এজন্য নদীয়া মাহিষ্য সমিতিকে যথেষ্ট অর্থ ও শ্রম ব্যয় করতে হয়েছিলো। কিন্তু মহারাজা তা পাঠানোর সময়ে নিজের ভিন্নমতও পাঠান। মহারাজার এই ভিন্নমতের কারণে আন্দোলনের যে ক্ষতি হয়েছিলো সেটা আন্দোলনকারীরা বুঝতে পারে অনেক পরে। সে প্রসঙ্গ পরবর্তী আলোচনায় স্পষ্ট হবে।

অবশেষে আন্দোলনকারীদের সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে ১৯০১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদনে চাষি কৈবর্ত (মাহিষ্য) নামটি লেখা হয়। ১৯০২ সালের শেষের দিকে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্ট প্রকাশিত হলে মাহিষ্য সমিতি আরও সক্রিয় হয়। কলকাতার

---

[৩৭] শ্লোকটি হলো "ক্ষত্রবীর্যেন বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতং"। একই সাথে উৎকল মঠে প্রাপ্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের দশম অধ্যায়ের ১১১ নম্বর শ্লোকে একই উদ্ধৃতি প্রাপ্ত হয়। এটি একটি পুথিতে লেখা ছিলো। শঙ্করাচার্যের মঠে বিষ্ণুপুরাণের চব্বিশ অধ্যায়ে এই তথ্যের সমর্থনে একটি শ্লোক পাওয়া যায়, সেটি হলো, "মাগধায়াং বিশ্ব স্ফটিক সংজ্ঞেহন্যাম্ বর্ণাম্ করিষ্যতি। কৈবর্ত্ত কূট পুলিন্দ সংজ্ঞান্ ব্রাহ্মণ্যম্ রাজ্যে স্থাপয়িয্যত্যুৎখাদ্যখিল ক্ষত্র জাতিং।"

বাইরে নতুন অনেক স্থানে সমিতি স্থাপিত হয়, বিভিন্ন স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হয়। নতুন কর্মী নিয়ে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে মাহিষ্য সমিতির কাজ এগিয়ে যেতে থাকে। এসব কাজে যারা সাহায্য করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং আর একজন কলকাতার নরেন্দ্রনাথ দাস, যিনি পরবর্তীতে দীর্ঘদিন কেন্দ্রীয় কমিটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন।

১৯০১-০২ সাল থেকেই মাহিষ্য আন্দোলনকারীরা সমগ্র বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এতদিন পর্যন্ত ব্যক্তি বিশেষ বা কয়েকটি সমিতির মধ্য দিয়ে আন্দোলন পরিচালিত হলেও আন্দোলনের ব্যাপ্তি এবং কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ খুব প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এই প্রয়োজন থেকেই ১৯০২ সালে বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি নামে কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ লক্ষ্যে ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসের বাড়িতে একটি সভা আহ্বান করা হয়। এই সভাটিই ছিলো বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির প্রথম অধিবেশন এবং এতে অনেক জেলার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

শুমারি রিপোর্ট বের হওয়ার পূর্বে আন্দোলনকারীরা জানতোই না যে বিরুদ্ধতাকারীদের মতামত সেখানে সন্নিবেশিত হবে, এমনকি সেনসাস সিডিউলে মাহিষ্য নাম পর্যন্ত থাকবে না। রিপোর্টে 'কাস্ট' অধ্যায়ে মাহিষ্য আন্দোলনের অনেক সমালোচনা করা হয়। আন্দোলনের বিপক্ষ দলের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে ই এ গেইট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, চাষি কৈবর্ত কোনো আলাদা জাতি নয়, কৈবর্ত জাতির একটি সম্প্রদায় মাত্র। ১৯০১ সালের শুমারি প্রতিবেদনে তিনি তাঁর বক্তব্য এভাবে তুলে ধরেছিলেন:

> ক. The Chasi Kaibarttas vehemently deny all connection with the Jaliyas and claim to be a separate caste; yet the general opinion is that the two communities belong to one and the same caste.
>
> খ. There seems to be no room for doubt as to the common origin of the two sections of Kaibarttas. [৩৮]

স্বাভাবিকভাবেই মাহিষ্য আন্দোলনকারীদের জন্য এই মন্তব্য হতাশা সৃষ্টি করে এবং এর বিরুদ্ধে তারা সংগঠিত আন্দোলন শুরু করে।

---

[৩৮] E. A. Gait, *Census of India 1901*, vol. VI, part I (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1902), pp. 353 &380.

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি বিশেষ সভা আহ্বান করে। সেখানে নানা তর্ক-বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে রিপোর্টে লিখিত সমস্ত বিষয়ের সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে প্রতিবাদ করা হবে। তবে শুধু প্রতিবাদই মূল উদ্দেশ্য ছিলো না। আদমশুমারি তফশিল এবং সরকারি কাগজপত্রে মাহিষ্য জাতীয় নাম হিসেবে স্বীকৃত হওয়াটাও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো।

১৯০৩ সালে বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ শুরু করে। একই সালের ১০ই জুলাই সমিতি তৎকালীন সরকারের আদমশুমারি কমিশনার বরাবর সুদীর্ঘ একটি প্রতিবাদপত্র পাঠায়।[৩৯]

এই পত্রে আন্দোলনের বিপক্ষে যতো আরোপ ছিলো সবগুলোকে খণ্ডন করা হয় এবং উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। সুদীর্ঘ এই প্রতিবাদপত্রটি লিখেছিলেন গোপাল চন্দ্র সরকার এবং এর তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছিলেন সুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস। মাহিষ্য আন্দোলন সফল হওয়ার পেছনে এই প্রতিবাদপত্রটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শুমারি কর্তৃপক্ষ কয়েকটি যুক্তির উপর ভিত্তি করে চাষি কৈবর্তকে মাহিষ্য নামে পৃথক জাতি হিসেবে গণনা করতে অস্বীকৃতি জানায়। সেগুলোর পাশাপাশি আন্দোলনকারীদের আত্মপক্ষ সমর্থন সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

প্রসঙ্গ ১. সংস্কৃত শ্লোকের প্রক্ষিপ্ততা

শুমারি প্রতিবেদনে উল্লিখিত মন্তব্যটি এ রকম যে – কারো কারো মতে, পদ্মপুরাণের উক্ত শ্লোক (কৈবর্তদের উৎপত্তি সম্বন্ধে) প্রচলিত কোনো সংস্করণে পাওয়া যায় না এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ থেকে উদ্ধৃত শ্লোকও অসম্পূর্ণ; কারণ শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনে লেখা হয়েছে কলিযুগে তীবরের সঙ্গে সংসর্গ হেতু ওরা (কৈবর্তরা) পতিত হয়েছে।[৪০] সুতরাং কৈবর্ত জাতির উৎপত্তি সংক্রান্ত উক্ত শ্লোক প্রকৃত হলেও তারা যে জন্মগতভাবে জালিক কৈবর্ত থেকে পৃথক নয়, এই জাতির একটি সম্প্রদায় মাত্র, এটাই প্রমাণিত হচ্ছে।[৪১]

১৯০১ সালের শুমারি রিপোর্টে গেইট লিখেছেন যে, এ দেশের জাতিগুলোর উৎপত্তি এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা নির্ণয় করা বড়ো কঠিন।[৪২] প্রতিবেদনে জাতির সংজ্ঞায় তিনি বলেন, কোনো সাধারণ নামে আখ্যায়িত এক বা একাধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ববর্ণে বৈবাহিক সম্পর্ক

---

[৩৯] সম্পূর্ণ পত্রটি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হলো।

[৪০] *Census of India 1901*, vol. VI, part I, p. 380.

[৪১] Ibid.

[৪২] Ibid. p. 347.

প্রচলিত থাকলে; শাস্ত্রগত উৎপত্তি এবং পেশাগত সাদৃশ্য থাকলে; দেশে অবস্থিত প্রাজ্ঞ সমাজ অন্যান্য জাতি থেকে পৃথক মনে করলে এরকম প্রত্যেক সম্প্রদায়কে একটি জাতি বলা যায়।[৪৩] আন্দোলনকারীদের প্রতিবাদপত্রে গেইটের এই মন্তব্যকে সমর্থন করা হয়। এ প্রসঙ্গে বলা আছে, জাতিতত্ত্বের জ্ঞান সাধারণ মানুষের নয় বরং শিক্ষিত প্রাজ্ঞ লোকেদের থাকে, তাই তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ হিন্দুদের মধ্যে একটি জাতি আর একটি জাতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না।

প্রতিবেদনের ৫৬৯ নম্বর অনুচ্ছেদে গেইট শাস্ত্রানুসারে জাতিসমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করেন আন্দোলনকারীরা তাও সমর্থন করে। তাদের মতে, হিন্দুদের জাতিগত উৎপত্তি, তাদের অতীত ও বর্তমান সামাজিক অবস্থা নির্ণয় করতে হলে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ছাড়াও ঐতিহাসিক ও কিংবদন্তিমূলক প্রমাণ এবং প্রত্যেক জাতি সম্পর্কে পূর্বের ও বর্তমান সময়ের সর্বজনীন মতও বিবেচনা করা প্রয়োজন। শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রসঙ্গে পত্রটিতে বলা হয়, জাতির উৎপত্তি নির্ণয়ে শাস্ত্রের প্রমাণ গ্রহণ করতে হলে সকল সংকর জাতির ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। পুরাণে বর্ণিত বৈদ্য, নবশাখ প্রভৃতি জাতির উৎপত্তির বিবরণ গ্রহণ করা হলে চাষি কৈবর্ত জাতির উৎপত্তির প্রমাণ অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং শাস্ত্রীয় প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হলে হালিক ও জালিক কৈবর্ত জন্মগতভাবে যে পৃথক তা স্বীকার করতে হবে।[৪৪]

বিভিন্ন পুরাণ ও সংহিতার শ্লোক পত্রটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, গৌতম সংহিতা অনুসারে, জালিক কৈবর্ত প্রতিলোম জাতি; বৈশ্য পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতার সন্তান। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও পদ্মপুরাণ অনুসারে চাষি কৈবর্ত অনুলোম জাতি; ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান। মনুসংহিতায় শুধু জালিক কৈবর্তের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে, এটা যদি স্বীকার করা হয় তবে পৌরাণিক প্রমাণকে অস্বীকার করা হয়। বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী' ছাড়া আর কোনো পত্রিকা মনুসংহিতার ব্যাখ্যা গ্রহণ করেনি।

মাহিষ্য সমিতি জানতো যে, বেনারস সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগার এবং ওড়িশা ও মুম্বাইয়ের কয়েকটি গ্রন্থাগারে হস্তলিখিত প্রাচীন শাস্ত্রে চাষি কৈবর্তের উৎপত্তি বিষয়ক শ্লোক রয়েছে। বেনারস সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে মাহিষ্য সমিতি চিঠি প্রদান করলে তিনি এর উত্তরে বেনারস সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এ ভেনিস লেখেন:

---

[৪৩] Ibid, p. 349; গোপালচন্দ্র সরকার, *মাহিষ্য-নামোদ্ধারের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৩৪।

[৪৪] তদেব।

আমি আনন্দের সাথে আপনার প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি, এখানে যে শ্লোকটা উদ্ধৃত করা হয়েছে সেটা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রয়েছে।

"ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলৌ তীবরসংসর্গাৎ ধীবরঃ পতিতো ভূবি॥"[৪৫]

প্রতিবাদপত্রটিতে বলা হয়েছে, শঙ্করাচার্যের মঠ, পুরী জেলার অনেক পণ্ডিতের ব্যক্তিগত সংগ্রহে এবং কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত ২১ জি আই সংখ্যক হস্তলিখিত পুস্তকে উপরে উল্লিখিত শ্লোকগুলো রয়েছে। বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে যারা গেইটকে চিঠি লিখে এই শ্লোকগুলোর কথা অস্বীকার করেছেন তারা প্রামাণিক কোনো দলিল দিতে পারেনি।

ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতা থেকে কৈবর্তদের উৎপত্তি এর প্রমাণ পাওয়া যায় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের আর একটি বাংলা সংস্করণে।[৪৬] পণ্ডিত রামসেবক মিশ্র তাঁর গ্রন্থে এই তথ্যকে সমর্থন করেছেন। শাস্ত্রগত ভিত্তি না থাকলে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের শ্লোকটি লেখকের কল্পনাপ্রসূত বলতে হয়। কিন্তু প্রাচীনকালে সংহিতা রচয়িতাগণ কোনো সামাজিক অবস্থা বিবেচনা না করে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে এগুলো লিখেছেন বলে মনে হয় না।

জনগণনা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের শ্লোক যদি সত্যি হয়েও থাকে, তবে শ্লোকের দ্বিতীয় উক্তি অনুযায়ী কলিযুগের চাষি কৈবর্তকে তীবর সংসর্গ হেতু পতিত জালিক জাতি হিসেবে গণ্য করা হবে। প্রতিবাদপত্রে এই শ্লোকটির অর্থের ক্ষেত্রে আন্দোলনকারীদের যুক্তি ছিলো: কৈবর্ত জাতি ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান, ধীবরেরা তীবরের সাথে সংসর্গের কারণে পতিত হয়েছে; শ্লোক রচয়িতা যদি কৈবর্তকেই উল্লেখ করতেন, তাহলে পরের বাক্যে ধীবর না বলে কৈবর্ত শব্দ ব্যবহার করতেন।

প্রতিবাদপত্রে এ বিষয়টির আরও একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এভাবে – জন্মগতভাবে উভয় শ্রেণি এক হলেও চাষি কৈবর্তরা পতিত হয়নি বরং ধীবরেরা পতিত হয়েছে। উভয় জাতি পতিত হলে শ্লোকে একটা জাতির নাম থাকতো না। কিন্তু সমস্যা হলো যদি এই ব্যাখ্যা ঠিক ধরা হয় তবে গৌতম সংহিতা, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রমাণ অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়।

---

[৪৫] "In reply to your enquiry I have much pleasure in stating that the Sloka, as now quoted, does occur in our MSS. of the Brahmavaivartta Purana," তদেব, পৃ. ৮৫।

[৪৬] উদ্ধৃত, গোপালচন্দ্র সরকার, *মাহিষ্য-নামোদ্ধারের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৩৬।

প্রতিবাদপত্রটির শেষে বলা হয়, মাহিষ্য ও চাষি কৈবর্ত যে একই জাতির নাম বিভিন্ন শাস্ত্রের উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিত হয়েছে। আন্দোলনকারীদের ধারণা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ও পরশুরাম সংহিতা মনুসংহিতা অপেক্ষা প্রাচীন শাস্ত্র তাই এগুলো অনুসরণ করেই মনুসংহিতা ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ লিখিত হয়েছে। এভাবে তারা অনুলোমজাত হালিক ও প্রতিলোমজাত জালিককে পৃথক জাতি হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

এই প্রমাণ করতে গিয়ে মাহিষ্যদের উপরে লিখিত অনেক গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রগুলোর বরাত ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এসব ব্যবহারের একটা প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো, ঐ গ্রন্থগুলোতে যেখানে যেখানে কৈবর্ত শব্দ ছিলো, উদ্ধৃতি দেওয়ার সময়ে সেসব জায়গায় অনেক ক্ষেত্রে মাহিষ্য শব্দ লেখা হয়েছে।

প্রসঙ্গ ২. হেলে ও জেলে কৈবর্তের স্বাতন্ত্র্য

শুমারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কৈবর্ত নামের দুটি সম্প্রদায় যে একই জাতি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ আছে বলে মনে হয় না। ওড়িশায় তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান।[৪৭]

প্রতিবেদনে গেইট ‘ক’ বর্ণের অর্থ করেছেন জল হিসেবে অর্থাৎ কৈবর্ত জেলে জাতি এই ধারণাই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থে ‘ক’ যে জল অর্থে ব্যবহৃত হয়নি প্রতিবাদপত্রে তা উল্লেখ করা হয়। সেখানে মিশ্র জাতির উদাহরণ হিসেবে ওড়িশার সাগরপেশা সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়। প্রতিবাদে বলা হয় ‘সাগরপেশা’ নবশাখের মতো একটি সাধারণ নাম; এই এক নামে অনেক জাতি আছে। মারহাট্টি, বাঙালি ও উত্তর পশ্চিম দেশীয় পুরুষ বা নারী এবং ওড়িয়া পুরুষ বা নারীর বিয়ের মাধ্যমে তাদের সন্তানেরা ‘সাগরপেশা’ নামে পরিচিত। এদের এক একটি সম্প্রদায় এক একটি জাতি এবং এক সম্প্রদায়ের সাথে আরেক সম্প্রদায়ের বৈবাহিক সম্পর্ক হয় না। একই নাম হওয়ার পরেও তারা এক জাতি নয়। প্রত্যেক সাগরপেশা সম্প্রদায় স্বতন্ত্র আচারাদি পালন করে। মূল বিষয় এটাই যে একই নামে পরিচিত হয়েও যদি এতগুলো জাতির উদ্ভব হতে পারে তবে একটি সংজ্ঞায় প্রাচীনকালের দুটি জাতির স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সন্দেহের কারণ কী?

সমগ্র বাংলার কোথাও চাষি কৈবর্তের সাথে জেলে কৈবর্তের বৈবাহিক সম্পর্কের কোনো প্রমাণ নেই। অসবর্ণ বিবাহের দৃষ্টান্ত হিন্দু সমাজের প্রায় সব বর্ণেই দু-চারটি খুঁজে পাওয়া যায়। সিলেট, ময়মনসিংহ অঞ্চলে চাষি কৈবর্তের সাথে হিন্দু সমাজের উচ্চ অনেক জাতির বিবাহের প্রমাণ পাওয়া

[৪৭] *Census of India 1901*, vol. VI, part I, p. 380.

যেতে পারে। এ ধরনের বিবাহে আবদ্ধ ব্যক্তিরা সাধারণত সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে থাকে। কিন্তু কোথাও জেলে কৈবর্তের সঙ্গে চাষি কৈবর্তের বিবাহের ঘটনা ঘটে না।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওড়িশার কেওট এবং কৈবর্ত একই জাতি। এ কথার উত্তরে প্রতিবাদপত্রের উত্তর, ওড়িশায় কোনো চাষি কৈবর্ত নেই, যারা আছে তারা খণ্ডাইত ও চাষা এই দুই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কোনো ঐতিহাসিক বা পুরাতত্ত্ববিদ কৈবর্ত এবং ওড়িশার কেওটকে এক জাতি বলে অভিহিত করেনি। এ দুই জাতির মধ্যে কোনো সাদৃশ্য তো নেই বরং আচার-ব্যবহার ও প্রকৃতিগত পার্থক্য অনেক। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার এই দুই জাতিবর্ণকে পৃথক বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ওড়িশার কেওটকে মৎস্যজীবী এবং বাংলার কৈবর্তকে কৃষিজীবী বলে উল্লেখ করেছেন। ওড়িশার করদ মহালে কোনো কোনো স্থানে হয়ত কেওট জাতিবর্ণের লোক কৃষির সাথে যুক্ত থাকতে পারে কিন্তু তাই বলে তার হিন্দু সমাজে জাতিবর্ণ পরিবর্তিত হতে পারে না।

আন্দোলনকারীদের ধারণা, জনগণনার সময়ে পূর্ববঙ্গে গণনাকারী ও তত্ত্বাবধায়কেরা ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে জেলে কৈবর্তকে মাহিষ্য শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। অনেক গণনাকারী মাহিষ্য নামে পরিচিত হওয়া অপমানের বিষয় বলে সরল কৃষকদের বিভ্রান্ত করে। চাষি কৈবর্তরা নিজেদের আরও যেসব নামে পরিচয় দেয় সেগুলো হলো – পরাশর দাস, হালিক দাস, কৃষিকার, মাহিষ্য দাস। হালিক আর জালিক যদি একই জাতিবর্ণকে বোঝাতো তবে এসব নামের কোনো প্রয়োজন ছিলো না। তাদের দাবি, চাষি ও জেলে কৈবর্ত পৃথক জাতি।

প্রসঙ্গ ৩. অস্পৃশ্যতা

শুমারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে – অধিকাংশ জেলায় চাষি কৈবর্তের জল ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করে না, কোনো কোনো জেলায় ব্রাহ্মণেরা চাষি কৈবর্তের জল গ্রহণ করে। এর অর্থ হলো বাংলার সব জেলায় কৈবর্তরা অস্পৃশ্য নয়, কিছু কিছু জেলায় অস্পৃশ্য।[৪৮]

পূর্ববঙ্গের কিছু কিছু স্থানে প্রকাশ্যে চাষি কৈবর্তরা অস্পৃশ্য, একথা প্রতিবাদপত্রে স্বীকার করা হয়। বল্লাল সেনের গল্প প্রসঙ্গে বলা হয়, বল্লাল সেন যদি কোনো জাতিকে স্পর্শযোগ্য করে থাকেন তবে তা জেলে কৈবর্ত জাতিকেই করা সম্ভব। কারণ বল্লাল সেন 'সূর্যমাঝি' নামে একজন জেলেকে পুরস্কৃত করেছিলেন।

[48] *Census of India 1901,* vol. VI, part Is, p. 371.

বিভিন্ন গ্রন্থের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়, হালিক বা দাসদের রাজ্য থেকে সূর্যদ্বীপ নামের একটি দ্বীপের একাংশ কেড়ে নিয়ে 'সূর্যমাঝি' নামের একজন জালিককে তা দান করা হয়। উক্ত সূর্যদ্বীপ ভৈরব ও ইছামতি নদী দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত ছিলো; লাট, কঙ্ক ও যোগীন্দ্র। সূর্যদ্বীপের যোগীন্দ্র অংশ সূর্যমাঝি পেয়ে যায়। অতএব বলা যায়, এই দুই জাতি বল্লাল সেনের সময়ে বা তার পূর্ব থেকেই হয়তো পৃথক ছিলো; আর হালিক কৈবর্ত শুধু কৃষিজীবী ছিলো না, তাদের রাজ্যও ছিলো, সেই রাজ্যের কিছু অংশ কেড়ে নিয়ে সূর্যমাঝিকে দেওয়া হয়েছিলো। এ যুক্তিতে আন্দোলনকারীরা বলার চেষ্টা করেন বল্লাল সেন চাষি কৈবর্তদের স্পৃশ্য করেননি।

এছাড়া তাদের আরও একটি যুক্তি এ রকম: ঢাকা ও মালদহ জেলার যে দুই জায়গায় সেন রাজাদের রাজধানী ছিলো সেখানেই সাধারণ হিন্দু সমাজে চাষিদের স্পর্শে আপত্তি দেখা যায়। রাজধানী থেকে দূরের প্রদেশে ব্রাহ্মণেরা চাষি কৈবর্তদের স্পর্শে কোনো আপত্তি দেখায়নি। কিন্তু রাজধানীতে তাদের গ্রহণ না-করা মানে রাজার আদেশ অমান্য করা, যা সম্ভব নয়। তাদের মতে, বল্লাল সেন চাষি কৈবর্তদের সমাজে তাদের উন্নীত করেছেন, একথা সঠিক নয়।

প্রতিবেদনের ৬১২ অনুচ্ছেদের পাদটীকায় বলা আছে, মাহিষ্য আন্দোলনের জন্য নদীয়া জেলার ব্রাহ্মণেরা চাষি কৈবর্তদের জল ত্যাগ করেছে অর্থাৎ অস্পৃশ্য করেছে।[৪৯] প্রতিবাদপত্রে বলা হয়েছে পূর্বে কৈবর্তরা স্পৃশ্য ছিলো বলেই হয়তো ত্যাগ শব্দটার ব্যবহার করা হয়েছে। মেহেরপুর জেলার ভবানীপুর গ্রামের জমিদারের সাথে কোনো কারণে ব্রাহ্মণদের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, এই বিষয়টিও আন্দোলনের বিরুদ্ধপক্ষ গেইটকে লিখিতভাবে জানায়।

প্রসঙ্গ ৪. মর্যাদা ও কৈবর্তদের পুরোহিত

শুমারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চাষি কৈবর্তের এবং জালিক কৈবর্তের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখা হয় না এবং তাদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা সর্বত্র স্বীকার করা হয় না। এদের ব্রাহ্মণ (যাজক ব্রাহ্মণ) গোয়ালার ব্রাহ্মণ থেকেও নিচু এবং ঐসব ব্রাহ্মণদের বাড়িতে এরা আহার গ্রহণ করে না। এরা নীচ বৃত্তিধারী; এদের স্ত্রীরাও জাত্যাচার পালন করে না, এবং অনেক জেলায় (যেমন, ঢাকা, ত্রিপুরা, বীরভূম, মেদিনীপুর ও নোয়াখালী) এদের জল উচ্চতর জাতি গ্রহণ করে না।[৫০]

---

[৪৯] গোপালচন্দ্র সরকার, *মাহিষ্য-নামোদ্ধারের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৪১।

[৫০] *Census of India 1901,* vol. VI, part I, p. 371.

প্রতিবাদপত্রে মাহিষ্য বা চাষি কৈবর্ত, শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও নবশাখের ব্রাহ্মণ যে একই শ্রেণির ব্রাহ্মণ, তা জানানো হয়। আরও বলা হয় প্রাচীন কাল থেকেই চাষি কৈবর্তের কুলগুরু যে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, তা সর্বজনবিদিত কিন্তু জালিক কৈবর্তের কুলগুরু সাধারণ ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব। এ থেকেও প্রমাণিত হয় হালিক ও জালিক পৃথক শ্রেণি।

প্রতিবেদনে কৈবর্তদের যাজক-ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে প্রচলিত বল্লাল সেনের প্রবাদকে ঐতিহাসিক ঘটনা মনে করে বলা হয়, হালিক ও জালিক উভয় জাতির পুরোহিত একই এবং তাদের পুরোহিতদের বাড়িতে আহার করা তো দূরে থাক, জল পর্যন্ত স্পর্শ করে না। এই মন্তব্য আন্দোলনকারীদের কাছে অত্যন্ত অপমানজনক মনে করা হয়।

প্রতিবাদপত্রে এর উত্তরে বলা হয়, চাষি কৈবর্তের ব্রাহ্মণরা বাংলার আদি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ কনৌজ ব্রাহ্মণ নন। আত্মগৌরব রক্ষার জন্য এরা কনৌজ ব্রাহ্মণদের কাছে মাথা নত না করায় সমাজে এদেরকে বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। চাষি কৈবর্তদের বাহ্মণ যেমন আলাদা তেমনি জেলে কৈবর্তদের ব্রাহ্মণও আলাদা। চাষি কৈবর্তদের ব্রাহ্মণরা সৎ-ব্রাহ্মণ বলেই নাটোর, নদীয়া ও অন্যান্য স্থানের জমিদারগণ তাদের ব্রহ্মোত্তর দান করেন। কিন্তু জেলে কৈবর্তদের ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্তির কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। চাষি কৈবর্তরা তাদের ব্রাহ্মণদের বাড়িতে খাবার গ্রহণ করেন। যে সকল শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ কৈবর্তদের থেকে জল গ্রহণ করে তারাও জানেন যে চাষি কৈবর্তরা তাদের ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে আহারাদি গ্রহণ করে। অর্থলোভে কোনো ব্রাহ্মণ জেলে কৈবর্তদের পৌরোহিত্য করলে তাদেরকে সমাজচ্যুত করা হয়। মেদিনীপুরের কোনো কোনো এলাকায় কৈবর্তদের ব্রাহ্মণ এবং কনৌজ ব্রাহ্মণ উভয়েই চাষি কৈবর্তদের যাজকতা করে। মেদিনীপুর এবং বিহার অঞ্চলে চাষি কৈবর্তদের ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত সম্মান করা হয়।

১৯০১-১৯১১ এই দুই জনগণনার মধ্যবর্তী সময়ে সমিতি চাষি কৈবর্ত সমাজ ও তাদের পুরোহিতদের উন্নতির জন্য কাজ করে। তারা মনে করে কৈবর্তযাজী ব্রাহ্মণদের দুরবস্থার জন্য দায়ী বল্লাল সেন সম্পর্কিত কুসংস্কার। যে কোনো কুসংস্কার একবার সাধারণ মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেলে তা নিবারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য পাবনা মাহিষ্য সমিতি শুরু থেকেই এ লক্ষ্যে কাজ শুরু করে।

পাবনা সদরের তাঁতিবন্ধ গ্রামের বারেন্দ্র শ্রেণির জমিদারগণ এ বিষয়ে সমিতির পক্ষে ছিলেন। তারা স্বীকার করে যে মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ পতিত নন। তারা প্রকাশ্যেই মাহিষ্য পুরোহিতদের সমাজে গ্রহণ করে। একই গ্রামে গোপালচন্দ্র সরকারের আত্মীয় জলধর জোয়ারদারের বাড়িতে

একটি ছোটো সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় তাঁতিবন্ধ গ্রামের কয়েকজন প্রতিনিধি ও মাহিষ্যযাজী পুরোহিতগণ উপস্থিত ছিলেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ কিছু দক্ষিণা দাবি করে। এই অর্থ সংগ্রহের ভার মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণদের উপর দেওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা এ অর্থ আত্মসাৎ করে ফেলে, ফলে সভায় গৃহীত উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয় না। তবে আন্দোলনকারীদের বিশ্বাস, আধুনিক কালে হিন্দু সমাজে জাতপাতের ক্ষেত্রে যে উদারতা প্রকাশ পাচ্ছে, তাতে করে ভবিষ্যতে তাদের পুরোহিতদের নিয়ে যে অপবাদ তা অপনীত হবে। হয়তো শীঘ্রই চাষি কৈবর্ত সমাজের সামাজিক কলঙ্কের অবসান ঘটবে।

প্রসঙ্গ ৫. ব্যবস্থাপত্র

সমাজের শিক্ষিত, প্রাজ্ঞ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ চাষি কৈবর্তকে মাহিষ্য জাতির বংশধর বলে স্বীকার করে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন, যা প্রতিবাদপত্রে ব্যবহার করা হয়। এগুলো মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

১. ১৮৬৪ সালে বিক্রমপুরের বিখ্যাত ৬৪ জন পণ্ডিতের প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র।
২. উদ্দীপন পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্ববঙ্গের ৫০ জন পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্র।
৩. ১২৯৮ বঙ্গাব্দে তাজপুর সভায় প্রদত্ত মেদিনীপুর ও ওড়িশার পণ্ডিতগণের ভাষাপত্র এবং ১৩০৪ বঙ্গাব্দে তাজপুরের আরও একটি সভায় প্রদত্ত কাশী, পুরী, চিত্রকুট ও নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র।
৪. ১৯০১ সালে প্রদত্ত কলকাতা সংস্কৃত কলেজের ব্যবস্থাপত্র।
৫. ১৯০১ নালে প্রদত্ত নদীয়ার পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র।

নিম্নে সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ব্যবস্থাপত্রের সারমর্ম আলোচনা করা হলো –

> সাধারণত কৈবর্ত সংজ্ঞা সম্বন্ধে মাহিষ্যের অপর নাম কৈবর্ত বিশেষের নৌকর্মজীবী, অপর নাম দাশ। কৈবর্ত বিশেষের পরস্পর ব্যবহার থেকে জাতিগতভাবে অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সেখানে মাহিষ্য কৈবর্ত অনুলোম সংকরজাত; কৃষিপ্রভৃতি বৈশ্যবৃত্তি আচরণকারী; দ্বিজাতি ব্যবহারে জলচল বলে গৃহীত। নৌকর্ম ও মৎস্যাদি বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারীদের দাশ বা ধীবর বলে। কৈবর্ত বিশেষ প্রতিলোম সংকর প্রভাবে অন্ত্যজ মধ্যে পরিগণিত। দ্বিজাতির স্পর্শাদি অযোগ্য এবং অপকৃষ্ট শূদ্র বলে গণ্য। শাস্ত্রীয় প্রমাণে এবং লৌকিক ব্যবহার দর্শনে সর্বপ্রকারে প্রমাণিত এই সিদ্ধান্ত।
>
> শাস্ত্রে বলা হয়েছে –

রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যা মাতার সন্তান শূদ্র মাহিষ্য বলে পরিগণিত।
-যাজ্ঞবল্ক্য বচন।
পরশুরাম সংহিতাতেও বলা হয়েছে, ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্যা মাতার সন্তান মাহিষ্য বলে গণ্য।
পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উক্ত হয়েছে – ক্ষত্রিয় ঔরসে ও বৈশ্য মাতার গর্ভজাত সন্তান কৈবর্ত নামে পরিকীর্তিত হয়। নৃপ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় পিতায় বৈশ্যা নারীতে জাত যে সন্তান সে বৈশ্য বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহের কারণে সে ক্ষাত্রধর্ম আচরণ করবে না – এটি উশনস বচন।
'অয়োগব' জাতীয় নারীতে নিষাদ জাতীয় পুরুষ (ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রা নারীতে জাত সন্তানকে নিষাদ বলে) মার্গব নামক সংকর জাতির সৃষ্টি করে থাকে তাদের দাস বলা হয়। আর্যাবর্ত বাসীরা তাদের কৈবর্ত নামে অভিহিত করেন, তারা নৌকর্মজীবী।
এই সমস্ত বচনের দ্বারা মাহিষ্য (কৈবর্তদের ক্ষত্রিয় থেকে বৈশ্যা নারীতে উৎপন্ন হেতু দাস, উৎকর্ষ ও অনুলোম সংকর জাতত্ব; ব্রাহ্মণ দ্বারা শূদ্র নারীতে জাত নিষাদ হতে, শূদ্র দ্বারা বৈশ্যা নারীতে জাত 'অয়োগব' জাতত্ব প্রতিপাদন হেতু মাহিষ্য দাসের কৈবর্ত সংজ্ঞা জাত জাতি থেকে অপকর্ষ, প্রতিলোম সংকর জাতত্ব নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন করে।
ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দ্বিজবর্ণত্রয়ের দ্বারা অনুলোমক্রমে অনন্তর অর্থাৎ অব্যবহিত পরবর্তী জাতীয়া নারীর গর্ভজাত সন্তানেরা হীন জাতীয়া মাতার গর্ভে উৎপন্ন বলে পিতৃজাতি প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু উৎপাদকের (পিতার) জাতির সদৃশ অর্থাৎ দ্বিজধর্মী হয়।
– এইভাবে মনুবচন দ্বারা অনুলোম সংকর জাতি পিতৃজাতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন এবং মাতৃজাতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট বলে প্রতিপন্ন হলো।
বৈশ্য নারীর গর্ভে ক্ষত্রবীর্য হতে যে জাতি জন্মলাভ করে তার নাম কৈবর্ত। এই কৈবর্তদের মধ্যে কতকগুলি কলিতে তীবর সংসর্গে পতিত হয়ে ধীবর নামে সমাজে কথিত। এরূপ ব্রহ্মবৈবর্ত বচনে মাহিষ্য-কৈবর্তদের মধ্য থেকে মৎস্যজীবী কৈবর্তদের জাতিত্ব স্বীকৃত (বিশেষত) নয়। এই বচনের দ্বারা বৈশ্যার গর্ভে তীবর সংসর্গে ধীবর জাতির উৎপত্তি প্রতিপাদন হেতু ক্ষত্রিয় থেকে বৈশ্যার ন্যায় অনুলোমক্রমে সৃষ্ট কৃষি বাণিজ্যাদি বৈশ্যবৃত্তিহেতু মাহিষ্য/কৈবর্তদের ধীবর হিসেবে গ্রহণ প্রমাণ করেন।
ভগবান মনু বলেছেন – পিতা মাতার নাম নির্দেশপূর্বক এই সব হীন সংকর জাতির কথা বলা হলো, এছাড়া যাদের পিতামাতার নাম জানা যায় না এমন, যারা গুপ্তভাবে বা প্রকাশ্যভাবে বর্ণ সংকর রূপে উৎপাদিত হয়, তাদের জাতিপরিচয় তাদের ক্রিয়াকলাপ থেকে জানতে হবে। এই বচন দ্বারা এটাই বলতে চাওয়া হয়েছে যাদের বংশপরিচয় সংকর রূপে জানা যায় না, তাদের চিরাচরিত কার্যকলাপ থেকেই নির্ণীত হবে।
এই ব্যাখ্যা দ্বারা যারা গুপ্তভাবে বা প্রকাশ্যভাবে বর্ণ সংকর রূপে উৎপন্ন তাদের ক্রিয়াকলাপ দ্বারাই তাদের জাতিত্ব নিরূপিত হবে। টীকাকার কুল্লুক ভট্টের উক্তি দ্বারাও এইটি সর্ব প্রকারে সমর্থিত হলো।

বৈশ্যা নারী ও ক্ষত্রিয় পুরুষের পুত্র মাহিষ্য, বৈশ্য ধর্মাচারণকারী। পণ্ডিত সর্বস্বের বচনের দ্বারা মাহিষ্য জাতীয় কৈবর্তদের বৈশ্য ধর্মাচারণ হেতু মৎস্যজীবী কৈবর্ত যে অন্ত্যজ মধ্যে পরিগণিত, এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো।

কুল্লুকভট্ট, মনুবচন এবং উশনশ বচনের দ্বারাও জাতি সংজ্ঞায় মাহিষ্য কৈবর্তদের বৈশ্যবৃত্তি পালন স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হলো।

রজক, চর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ, ভিল্ল – এই সাত জাতি অন্ত্যজ বলে পরিগণিত। এই সমবচনের দ্বারা মৎস্যজীবী কৈবর্তদের অন্ত্যজ মধ্যে পরিগণিত হেতু সমুন্নত জাতি হতে নিতান্ত অবকৃষ্ট জাতি বলে প্রতিপন্ন হলো এবং মাহিষ্য নাম বৈশ্য বৃত্তি কৈবর্ত উৎকৃষ্ট জাতিতে উন্নীত হলো।

চামার, রজক, বেণ, ধীবর, নট – এদের স্পর্শ করলে দ্বিজজাতি স্পর্শ যোগদুষ্ট হয় – এই সম্বর্ত বচনে রজক, ধীবরাদির স্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত উপদেশহেতু মৎস্যবিক্রয়াদি নিকৃষ্ট জীবিকা অবলম্বনকারীদের ধীবর সমান ধর্মী কৈবর্তদের অস্পৃশ্যতাহেতু বৈশ্যবৃত্তিজীবী মাহিষ্য কৈবর্ত অপেক্ষা দ্বিজ জাতির অস্পৃশ্যরূপ জাতি অপকৃষ্টতার অবসান হলো। কিন্তু 'রজক ও চর্মকার' ইত্যাদি যমবচনে কৈবর্ত এরূপ সামান্য নির্দেশহেতু মাহিষ্য ও কৈবর্তদের অন্ত্যজ মধ্যে পরিগণনা করা হলো। তারপরও অস্পৃশ্যত্ব রূপ অপকৃষ্টত্ব বলে অনিবারণীয়।

দ্বিজ জাতিগণের নিজ নিজ বর্ণোৎপন্ন তিনটি এবং অনন্তর বর্ণোৎপন্ন তিনটি (অর্থাৎ অনুলোম জাত) এই ছয়টি সন্তান দ্বিজ ধর্মাবলম্বী হবে – এই মনুবচনের দ্বারা স্বজাতীয় অনুলোম সংকর জাত এই ছয়জনের নিজ ধর্মত্ব প্রতিপাদন দ্বারা অন্ত্যজত্ব অবসান হলো।

নতুবা বর্ধকী, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক, কিরাত (ছুতার), কায়স্থ, মালাকার, বরাট, মেদ, চণ্ডাল, শ্বপচ, কোণক – এরা অন্ত্যজরূপে সমাখ্যাত এবং অন্যেরা গোখাদক।

এই ব্যাসসংহিতা বচনে কায়স্থ সংজ্ঞা মাত্র সম্বন্ধহেতু কায়স্থ সংজ্ঞা দ্বারা প্রসিদ্ধ সাম্প্রতিক সৎশূদ্রদেরও অন্ত্যজত্ব আপত্তি দুর্নিবার সেই হেতু মৎস্যজীবী কৈবর্ত অপেক্ষা কৃষিজীবী মাহিষ্য রূপ কৈবর্তদের সমুৎকর্ষত্ব সিদ্ধ হলো। সাধারণ সংজ্ঞা মাত্রের দ্বারা সম্ভাব্য অপকৃষ্ট জাতীয়ত্বের ভ্রান্তি নিরসন হেতু মাহিষ্য কৈবর্ত সংজ্ঞা দ্বারা এদের কৈবর্ত সংজ্ঞা নিরূপিত হলো। চিরকাল আমাদের দেশে প্রচলিত ব্যবহার দর্শন হতে মাহিষ্য কৈবর্তদের বৈশ্যবৃত্তি আচরণরত দাস কৈবর্ত অপেক্ষা জাতি হতে সম্যৎকর্ষত্ব নির্ণীত হলো। আমরা জানি উৎকলে অর্থাৎ ওড়িশায় বহু মাহিষ্য ইদানীং উপবীত গ্রহণ করে, পনের দিনের অশৌচ পালন করে এবং কৃষ্যাদি বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। ময়নাগড়, তাম্রলিপ্ত, সুজামুঠা, গড়বেতা প্রভৃতি প্রখ্যাত ভূভাগে অতিপ্রাচীন বংশ সম্ভূত মাহিষ্য কৈবর্ত ভূম্যধিকারী বৈশ্যধর্মী বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। হুগলী, হাওড়া, চব্বিশ পরগনা, কলকাতা, মেদিনীপুর প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ভূভাগে বসবাসকারী মাহিষ্য কৈবর্তরা বাহুবলীন্দ্র, গজেন্দ্র, মহাপাত্র, ভূপতি, হাজরা, সেনাপতি, দিকপতি, মজুমদার, মল্লিক, চৌধুরী, বিশ্বাস, নায়েক, রায়, মণ্ডল, হালদার, পাল, ভৌমিক, সামন্ত, বাগ, আর্দ্ধক, পাত্র, দেওয়ান, বংশী ইত্যাদি উপাধি ধারণ করে।

> সমৃদ্ধ ভূমিপতি ও সৎশীল জাতি রূপে গণ্য হতে পারে, তবে কোনো জালজীবী 'জেলে কৈবর্ত'-রা কর্মাদি দ্বারা নিজেদের উৎকর্ষত্ব প্রমাণ করলেও কেন চিরকাল দ্বিজাতির 'অজলচল' অন্ত্যজ মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকবে অর্থাৎ এদেরও সমুন্নত জাতি রূপে গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়, শাস্ত্রীয় বচনের যুক্তি এটাই সমর্থন করে।
>
> ইতি – সন – অগ্রহায়ণ ১৮২২ শকাব্দ।
>
> ন্যায়ালঙ্কার উপাধিপ্রাপ্ত শ্রী নীলমণি শর্মা প্রবর্তিত, সংকলিত ও অনুমোদিত এই ব্যবস্থা। শ্রী নীলমণি শর্মা স্বাক্ষরিত। তর্কবাগীশ উপাধিপ্রাপ্ত শ্রী কামাক্ষানাথ শর্মা, ন্যায়ভূষণ উপাধিধারী শ্রী লোকনাথ দেবশর্মা, বিদ্যারত্ন উপাধিপ্রাপ্ত শ্রী তারাপ্রসন্ন শর্মা, শিবনারায়ণ শর্মা শিরোমণি, কাব্যরত্ন উপাধিপ্রাপ্ত শ্রী দেবেশচন্দ্র দেবশর্মা, তর্কভূষণ উপাধিপ্রাপ্ত প্রমথনাথ দেবশর্মা, শ্রী গোবিন্দ শাস্ত্রী এবং শ্রী আশুতোষ শাস্ত্রী এই ব্যবস্থাপত্রে সম্মতিজ্ঞাপন করেছেন।[৫১]

প্রতিবাদপত্রে এই ব্যবস্থাপত্রের পাশাপাশি জাতিতত্ত্ব বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে চাষি কৈবর্তের সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে প্রাপ্ত মতামত উল্লেখ করা হয়। পত্রটির ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদে অবস্থান অনুযায়ী সামাজিক মর্যাদার বিষয়টি আলোচনা করা হয়। সেখানে বলা হয়, কায়স্থ, নবশাখ, মাহিষ্য প্রভৃতি জাতির মর্যাদা কখনও কখনও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। এ কথাটিকে অস্বীকার করা যায় না। চাষি কৈবর্তের মধ্যে যারা দরিদ্র তারা অনেক সময়ে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির অধীনে কাজ করে। ঠিক তেমনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বাদ দিয়ে অন্যান্য অপরাপর জাতি অর্থনৈতিকভাবে সংকটাপন্ন হলে চাষি কৈবর্তের অধীনে কাজ করে।

একই জাতিবর্ণের হয়েও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় একটি সমাজে ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, কায়স্থ জমিদার, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা প্রভৃতির সাথে কৃষক, চাকর প্রভৃতি পেশায় নিয়োজিত নৌজীবী কায়স্থের পার্থক্য রয়েছে। ঠিক তেমনি মেদিনীপুর জেলার তমলুক, সুজামুঠা, তুর্কা এবং বরেন্দ্রের কৈবর্ত জমিদার, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, ব্যবসায়ীর সঙ্গে দরিদ্র কৈবর্ত কৃষকের সামাজিক অবস্থানের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

আন্দোলনকারীরা মনে করেন, হিন্দু জাতিবর্ণগুলোর সামাজিক মর্যাদা শ্রেণিতে কৈবর্তদের চতুর্থ স্থান দেওয়াটা অর্থহীন। হিন্দু সমাজে তাদের স্থান কখনোই নবশাখের নিচে হতে পারে না। ১৯০১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে মাহিষ্যদের সৎশূদ্রে স্থান দেওয়া হয়েছিলো কিন্তু সেখানে

[৫১] সংস্কৃত কলেজের ব্যবস্থাপত্রটি বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. কানাই লাল রায়।

তাদের ব্রাহ্মণদের অধঃপতিত বলা হয়েছে।[৫২] আন্দোলনকারীদের মতে, তাদের ব্রাহ্মণ গোয়ালাদের ব্রাহ্মণদের থেকে কখনোই নিম্ন শ্রেণির নয়।

প্রসঙ্গ ৬. আচার প্রতিপালন

১৯০১ সালের শুমারি প্রতিবেদনে কৈবর্ত জাতিবর্ণের 'জাত্যাচার' সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে।[৫৩] তার উত্তরে প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে – 'জাত্যাচার' শব্দটি অত্যন্ত গোলমেলে। ব্রাহ্মণসহ অন্যান্য জাতিবর্ণের বিধবা নারীরা যেসব আচার পালন করে থাকে চাষি কৈবর্ত জাতিবর্ণ পরিবারেও সেই সমস্ত আচার পালন করা হয়। বরং আচার প্রতিপালনে নবশাখের চেয়ে চাষি কৈবর্তদের মধ্যে সামাজিক কঠোরতা বেশি দেখা যায়।

চাষি কৈবর্ত বা মাহিষ্য নারীদের সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে মাহিষ্য নেতৃবৃন্দ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মতো পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোকে প্রাধান্য দিয়েছে। মাহিষ্য নারীদের মধ্যবিত্ত জাতিবর্ণের যোগ্য করে তোলার জন্য 'মাহিষ্য সমাজ,' 'মাহিষ্য মহিলা' প্রভৃতি নামে কয়েকটি সাময়িকীও বের করা হয়েছিলো। শুমারি কর্তৃপক্ষের ভাষায় এই প্রচেষ্টা 'নতুন ভদ্রমহিলা' তৈরির প্রচেষ্টা। এটা করতে গিয়ে মাহিষ্য জাতিবর্ণের নেতৃবৃন্দ রক্ষণশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো। পারিবারিক সমস্যার চেয়ে নতুন নিয়মকানুন, রীতিনীতি আয়ত্ত করাটাই তাদের কাছে গুরুত্ব পায়।[৫৪] উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে কোনো বয়সের বিধবা মহিলাদের নিরামিষ আহার করতে বাধ্য করা বা চুল ছোটো করে ফেলা প্রভৃতি।

প্রসঙ্গ ৭. ভাষা

কৈবর্ত জাতিবর্ণ যে আর্য জাতির অন্তর্গত নয় এটা প্রমাণ করার জন্য শুমারি প্রতিবেদনের ৬১২ নম্বর অনুচ্ছেদের পাদটীকায় ড. জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসনের মন্তব্য উল্লেখ করা হয়।[৫৫] তিনি

---

[৫২] *Census of India 1901,* vol. VI, part I, p. 371.

[৫৩] Ibid.

[৫৪] Prasenjit Biswas, "Social Mobility and the Dynamics of Caste: The Mahishyas of South-Western Bengal (1901-1931)," (PhD Dissertation, Calcutta University, 2016), p. 271.

[৫৫] "The Kaibarttas, says Dr. Grierson, seem to be a non-Aryan race and to have entered Bengal from Orissa. They conquered by force of arms and the defeat, by them, of the Raja of Maina is the subject of a local poem. They founded several great families of

অনুমান করেন, কৈবর্তগণ অনার্য জাতি। কোনো অনার্য ভাষা তাদের কথ্য ছিলো, পরে তারা এক প্রকার গ্রাম্য ওড়িয়া ভাষা অবলম্বন করে। বর্তমানে তারা এই ভাষা এবং বাংলার মিশ্রণে এক প্রকার ভাষা ব্যবহার করে।

এই যুক্তির বিপরীতে প্রতিবাদপত্রে বলা হয়, ঠিক কোন পরীক্ষার দ্বারা আর্য-অনার্য নির্দেশ করা যায়? ভাষাই যদি একমাত্র ও সুনিশ্চিত পরীক্ষা হয় তবে মেদিনীপুর জেলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ প্রভৃতি জাতিকেও অনার্য বলতে হয়। কারণ তারা সকলেই ওড়িয়া ও বাংলার মিশ্রিত এক ধরনের ভাষায় কথা বলে। সেখানে আরও বলা হয়, হাওড়া জেলার চাষি কৈবর্তরা তো ঐ ভাষায় কথা বলে না তবে তারা কি এই জাতির নয়? তাহলে ভাষা দিয়ে কি প্রমাণিত হলো? তাদের মতে, ড. গ্রিয়ারসন ছাড়া অন্য কেউ আর কৈবর্ত এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে আকার-আকৃতি ও ভাষাগত পার্থক্য আবিষ্কার করেনি। তাদের মতে, গ্রিয়ারসনের বক্তব্য স্বীকার করে নিলে বাংলাদেশের হিন্দু জাতিগুলোর মধ্যে বিশুদ্ধ আর্য জাতির বংশধর কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এভাবে বিভিন্ন যুক্তির মধ্য দিয়ে আন্দোলনকারীরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন যে, চাষি কৈবর্ত ও জেলে কৈবর্ত পৃথক জাতি এবং চাষি কৈবর্তের অপর নাম মাহিষ্য।

৩.১ প্রতিবেদন পরবর্তী অগ্রগতি

প্রতিবাদপত্রটি ১৯০৩ সালের ১০ই জুলাই তৎকালীন সরকারের শুমারি কমিশনে প্রেরণ করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এর তথ্য সংগ্রহ ও সুনির্দিষ্টভাবে পত্রটি লিখতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়, ফলে কমিশনে পাঠাতেও অনেক দেরি হয়ে যায়। শুমারি প্রতিবেদনে ই এ গেইটের মন্তব্যের বিরুদ্ধে মাহিষ্য সমিতির সুদীর্ঘ এই প্রতিবাদপত্রটি পাঠানো হয়। পরবর্তী সময়ে তাঁর অধীনেই আন্দোলনকারীরা বিচারপ্রার্থী হয় যেটা মাহিষ্য সমিতির জন্য একটু সংকোচ আর দ্বিধার বিষয় ছিলো।

প্রতিবাদপত্রের পাণ্ডুলিপি ১৯০৩ সালের জুন মাসে কলকাতার একটি বিশেষ সভায় আলোচিত হয়। ঐ সভায় মাহিষ্য আন্দোলনের বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা

---

which that of the Raja of Tamluk still survives. The history of their arrival accounts for the peculiar dialect of Bengali Bengali spoken by them. Probably owning originally to some non-Aryan language, they arrived in Midnapore speaking a corrupt patois of Oriya, and on this, as a basis, they have built the dialect of Bengali which they speak in present home." *Census of India 1901,* vol. VI, part I, p. 380.

হাইকোর্টের উকিল মহেন্দ্র নাথ রায়কে পাণ্ডুলিপিটি পড়তে দেওয়া হয়। তিনি এটার কোনো পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করেননি। সভায় অনুমোদিত হলে সেনসাস কমিশনারের নিকট পাঠানো হয়। কয়েক মাস পর উত্তর আসে যে, সেনসাসের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে তাই এখন আর কোনো পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। নাম পরিবর্তন না হলেও প্রতিবাদপত্রটি পাঠ করে সেনসাস কমিশনারের পূর্বের ধারণাগত মতামত যে পরিবর্তিত হয়েছিলো এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯১১ সালের শুমারি প্রতিবেদনে।

১৯০১-১৯১১ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরে মাহিষ্য আন্দোলন থেমে থাকেনি বরং শুমারি প্রতিবেদনে কৈবর্তদের বিরুদ্ধে যেসব মন্তব্য প্রকাশিত হয় তার ফলে মাহিষ্য আন্দোলন আরও শক্তিশালী আকার ধারণ করে। ১৯০১ সালের পূর্বে যারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি, শুমারি প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর তারাও আন্দোলনে যোগদান করে। সমস্ত বাংলায় নতুন আরও অনেক কমিটি গড়ে ওঠে এবং সেগুলো কেন্দ্রীয় সমিতির সহযোগী প্রতিষ্ঠানস্বরূপ কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। কেন্দ্রীয় সমিতির ব্যয়ভার বহনের উদ্দেশ্যে যে ব্যাংকটি স্থাপন করা হয় তার কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। ব্যাংকের মূলধন এক লক্ষ টাকা এবং প্রত্যেক অংশের মূল্য ১০ টাকা নির্ধারণ করে একটি রেজিস্ট্রি করে কেন্দ্রীয় সমিতি। নিয়মাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ধারা হলো ব্যাংকের আয়ের এক-চতুর্থাংশ কেন্দ্রীয় সমিতি পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হবে।

হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটি জাতিবর্ণের শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। চাষি কৈবর্ত জাতিবর্ণের মধ্যেও এই ধরনের শ্রেণিবিভাগ বিদ্যমান। এ বিভেদ মাহিষ্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়েছিলো। ১৯০৩ সালে মাহিষ্য সমিতিতে মাহিষ্যদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন বৈবাহিক সম্পর্ক চালু হয়, প্রস্তাব রাখা হয়। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলে এর প্রচলনও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান কয়েকটি জেলায় চাষি কৈবর্তরা উত্তর রাঢ়ী ও দক্ষিণ রাঢ়ী এ দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম বিবাদ ছিলো। নিজেদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদা নিয়ে এ দ্বন্দ্বের কোনো মীমাংসা শেষ পর্যন্ত করা যায়নি।

১৯০৫ সাল পর্যন্ত মাহিষ্য আন্দোলন বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হতে থাকে। সে সময়ে আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় কলকাতা শহর। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তার কুপ্রভাব পড়ে মাহিষ্য আন্দোলনে। পূর্ববঙ্গের নেতৃবৃন্দ কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাবনা জেলা রাজশাহীর মধ্যে বলে সেটাও পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে পড়ে, ফলে পাবনাও কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।

আন্দোলনকারীদের মতে, পূর্ববঙ্গের সরকারি কর্মচারীরা হিন্দু সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও অনুন্নত জাতিবর্ণগুলোর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখায়। এ সুবিধা লাভের আশায় ঢাকা মাহিষ্য সমিতি মাহিষ্য ছাত্রদের জন্য আলাদা ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের কাছ আবেদন করে। কারণ হিসেবে দেখানো হয় যে, সাধারণ ছাত্রাবাসে তারা স্থান পায় না। তবে মাহিষ্য ছাত্ররা যে একেবারে স্থান পেত না সে রকম অবস্থাও ছিলো না। অন্যান্য মাহিষ্য নেতারা মনে করেন, ঢাকা সমিতির অদূরদর্শিতার জন্যই মাহিষ্য জাতিবর্ণের সামাজিক মর্যাদার আরও অবনতি ঘটে। ঢাকা সমিতি ভেবেছিলো এর জন্য হয়তো তারা সরকারের প্রীতিভাজন হবেন। তাদের এ প্রার্থনা অনুযায়ী সরকার শিক্ষা বিভাগের একটি সারকুলার বের করে এই মর্মে যে, মাহিষ্যগণ নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মতো অধঃস্থিত ও অনুন্নত। এজন্য মাহিষ্য ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র ছাত্রাবাসের বিধান করা হোক।[৫৬] মাহিষ্য নেতাদের মতে, এ ঘটনার পর থেকে বাংলার হিন্দু সমাজ মাহিষ্যদের আরও ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে। পাবনার সুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস সরকারের কাছে আবেদন করেন রাজশাহীতে এ রকম কোনো ছাত্রাবাস স্থাপনের প্রয়োজন নেই। এজন্য তাঁকে সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। ফলে ঢাকা মাহিষ্য সমিতির সাথে তাঁর বিবাদ সৃষ্টি হয়।

এছাড়া ঢাকা মাহিষ্য সমিতি পূর্ববঙ্গ সরকারের কাছে একটা অভিনন্দনপত্র পাঠায় সেখানে শুমারি গণনার বহু আগে অপ্রাসঙ্গিকভাবে অনুরোধ করা হয় চাষি কৈবর্তরা যেন মাহিষ্য নামে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের ধারণা, এ বিষয়টা মাহিষ্যদের জন্য বিব্রতকর ও অন্যান্য জাতিবর্ণের কাছে তাদের হাস্যস্পদ করে তুলেছিলো। তারা মনে করে, এ কারণেই পূর্ববঙ্গের শাসনকর্তারা চাষি কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামাজিক অবস্থান নমঃশূদ্রের সমান মনে করে। হয়তো এদেশের সরকারি কর্মচারীরা জানেই না যে পশ্চিমবঙ্গে এরা মাহিষ্য নামে পরিচিত। ফলে তারা ভেবেছিলো জালিক কৈবর্ত থেকে আলাদা করলেই এরা খুশি হবে।

১৯১১ সালে জনগণনা শুরু হলে একটি সমস্যা সৃষ্টি হয়। গণনাকারীরা পূর্বের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী খাতায় মাহিষ্য নাম লিখে। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত শুমারি কর্মকর্তা আদেশ করেন যে, মাহিষ্য নামে পরিচিতদের ঘরে চাষি কৈবর্ত লিখতে হবে। এ ঘটনায় দুই বাংলাতেই বেশ সাড়া পড়ে যায়।

বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি ১৯০১ সালে লিখিত শুমারির সমালোচনাপূর্ণ প্রতিবাদপত্র এবং সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিপূর্ণ উত্তরের প্রতিলিপিসহ পুনরায় শুমারি কর্মকর্তার কাছে পাঠিয়ে দেয়। আসন্ন

[৫৬] গোপালচন্দ্র সরকার, *মাহিষ্য-নামোদ্ধারের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৫১।

বিপদ উপলব্ধি করে ঢাকা মাহিষ্য সমিতি সরকারের উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ করে। সমস্ত বিষয় জেনে সরকারের পক্ষ থেকে একটি দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। সে অনুযায়ী সমিতি একটি আবেদনপত্র প্রেরণ করে। কিন্তু আবেদনপত্রটি দীর্ঘ হওয়ায় আরেকটি আবেদন চাওয়া হয়। পুনরায় সংক্ষিপ্ত একটি আবেদনপত্র পাঠানো হয়। এই পত্রটি পেয়ে ১৯১১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি সরকারের পক্ষ থেকে শুমারি কর্মকর্তা ম্যাকসুয়ানিকে (McSwiney) আদেশ করা হয়, আবেদনকারীদের মাহিষ্য নামে গণনা করতে হবে। ম্যাকসুয়ানি ৩ তারিখে সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের লিখিত আদেশ পাঠান এই মর্মে, চাষি কৈবর্তদের মাহিষ্য নামে গণনা করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত পূর্বের আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। পূর্ববঙ্গের গাইবান্ধা জেলায় এ বিষয়টি নিয়ে অনেক সমস্যা হলেও শেষ পর্যন্ত বাংলায় মাহিষ্য নাম বজায় থাকে। তবে বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট জেলা এ সময়ে আসামের অন্তর্ভুক্ত থাকায় সিলেটের চাষি কৈবর্তরা মাহিষ্য নাম থেকে বঞ্চিত হয়।

৪. মর্যাদা বৃদ্ধির আন্দোলন: উত্তর পর্ব

চাষি কৈবর্তরা দীর্ঘদিন ধরে জেলে কৈবর্ত বা নৌজীবী কৈবর্তদের থেকে পৃথক হওয়ার জন্য সংগ্রাম করে এবং ১৯১১ সালে সেটি অর্জন করে। তারা মাহিষ্য নামে স্বতন্ত্র একটি পরিচয় পায়। তবে ১৯১১ সালে জেলে কৈবর্ত এবং পাটনিরাও মাহিষ্য নামে গণিত হওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানায়।[৫৭] জেলে কৈবর্তদের প্রভাব পাবনা জেলাতেই বেশি ছিলো। তাদের আবেদন দেওয়া নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। শুমারিকার্যের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কয়েকজন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মতামতের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেন, জালিক কৈবর্ত জল অনাচরণীয় জাতি, তারা মাহিষ্য থেকে পৃথক, তাদের মাহিষ্য শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। জালিকদের এই আন্দোলনের কেন্দ্র ছিলো কলকাতা। ওদের কয়েকজন নেতা কলকাতা মাহিষ্য সমিতি নামে একটি সমিতির পক্ষ থেকে জালিক মাহিষ্য নামে ভুক্তির জন্য শুমারি সুপারিনটেনডেন্টের কাছে আবেদন করে।

এ ঘটনায় বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। তবে তাদের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে পশ্চিমবঙ্গের শুমারি কর্মকর্তা ও'ম্যালী, জালিক কৈবর্তদের আবেদনের উত্তর দেওয়ার আগেই বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির সম্পাদককে একটি পত্র দেন। ও'ম্যালী সরকারি পত্রে জিজ্ঞেস

[৫৭] তদেব, পৃ. ৫৪।

করেন, কলকাতা মাহিষ্য সমিতি তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিনা এবং তাদেরকে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের বলে গণ্য করা যায় কিনা? পত্রটি নিম্নরূপ:

> আমি আপনাকে জানাতে চাই, কলকাতা মাহিষ্য সমিতি থেকে আমি একটি আবেদনপত্র পেয়েছি যেখানে তারা অনুরোধ করেছেন যে সকল কৈবর্তকে একটি নামে তথা মাহিষ্য নামে গণ্য করা হোক। ভালো হতো যদি আপনি আমাকে জানাতেন, আপনি যে সমিতির সম্পাদক তার সাথে এই সমিতি কোনোভাবে সম্পর্কিত কিনা এবং এটা আপনার সম্প্রদায়ের স্বার্থকে প্রতিফলিত করে কিনা।[৫৮]

বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির নেতা গগনচন্দ্র বিশ্বাস ও নরেন্দ্রনাথ দাস ও'ম্যালীকে চিঠি দিয়ে জানান জালিকরা মাহিষ্য নামে গণিত হতে পারে না। শুধু চাষি কৈবর্তরাই মাহিষ্য নামে গণিত হবে। পত্রটির সারমর্ম নিচে দেওয়া হলো:

> কলকাতা মাহিষ্য সমিতি কোনোভাবেই 'কেন্দ্রীয় মাহিষ্য সমিতি'র (বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি) সাথে যুক্ত নয় এবং এটা আমাদের (চাষি কৈবর্ত) স্বার্থকে প্রতিফলিত করে না। এই তথাকথিত কলকাতা মাহিষ্য সমিতির আবেদনকে আমরা দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জানাই। সকল কৈবর্তকে মাহিষ্য নামে গণ্য করার বিষয়টি অত্যন্ত আপত্তিজনক ও অনিষ্টকর এবং এটা মাহিষ্য সম্প্রদায় অর্থাৎ যারা পূর্বে চাষি কৈবর্ত হিসেবে পরিচিত ছিলো তাদের অনুভূতিকে গভীরভাবে আঘাত করেছে। জেলে কৈবর্ত নামে অন্য একটি সম্প্রদায়ের কিছু লোক সরকার এবং সাধারণ জনগণকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে। তারা একটা অদ্ভুত আন্দোলন করছে যার মাধ্যমে জালিয়া বা জেলে কৈবর্তরা মাহিষ্য হতে চায়।
>
> সরকার অবগত আছেন বহু বিতর্কের পর ভারতের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত এটাই যে উৎপত্তিগত এবং সামাজিক অবস্থানগত দিক থেকে মাহিষ্যরা (চাষি কৈবর্ত) জেলে কৈবর্তদের থেকে আলাদা। ভবিষ্যতে মাহিষ্য জাতিবর্ণের বিরুদ্ধে এ ধরনের আরও কোনো অপব্যাখ্যা প্রদান করা হলে তা বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতিকে জানানোর অনুরোধ জানাচ্ছি।[৫৯]

---

[৫৮] "I beg to inform you that I have received a memorial from the Calcutta Mahishya Samiti requesting that all Kaibarttas may be returned under the general heading as Mahishya and to request that you will be so good as to inform me whether this Samiti is connected with the Samiti of which you are the Secretary, and whether it represents the interests of the same community," তদেব, পৃ. ১২৫-১২৬।

[৫৯] "In reply to your letter No 422-O.C. dated the 23rd inst., I have the honour to inform you that the Calcutta Mahishya Samity, which you reffered to is in no way connected with the "Central Mahishya Samity" Bengal (Bangiya Mahishya Samity) and it does not represent the interests of the community to which we (Chasi Kaibarttas) belong. We strongly protest the request of the "so

উপরের চিঠির ভিত্তিতে জালিক কৈবর্ত সমাজের প্রতিনিধি কলকাতা মাহিষ্য সমিতিকে ও'ম্যালী জানিয়ে দেন, ১৯১১ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি লেখা পত্রে, সকল কৈবর্তকে একটি সাধারণ নামে (মাহিষ্য) গণ্য করার জন্য তারা যে আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁর পক্ষে সেটা অনুমোদন করা সম্ভব নয়, কারণ মাহিষ্য নামটি কেবল চাষি কৈবর্ত জাতিবর্ণের জন্য সীমাবদ্ধ। তাই জেলে কৈবর্তদের মাহিষ্য নামে গণনা করা সম্ভব নয়।[৬০]

এই একই চিঠি কেন্দ্রীয় মাহিষ্য সমিতির কাছেও পাঠানো হয়। অনুরূপভাবে পাটনি সমাজের প্রতিনিধি উমাপ্রসাদ দাসকে ও'ম্যালী জানিয়ে দেন, পাটনি আর মাহিষ্যরা একই জাতিবর্ণের এ রকম কোনো প্রমাণ তারা দিতে পারেনি। তাই তাদের মাহিষ্য নামে গণনা করা সম্ভব নয়।[৬১]

পূর্বের ন্যায় এই চিঠিও কেন্দ্রীয় মাহিষ্য সমিতির কাছে পাঠানো হয়। ১৯১১ সালে চাষি কৈবর্তরা মাহিষ্য নামে আলাদা জাতিবর্ণ হিসেবে পরিচিতি পায়। আন্দোলনের কর্মকাণ্ড দেখে

---

called" Calcutta Mahishya Samity to return all Kaibarttas under the one general heading Mahishya, which will be highly prejudicial, objectionable and will deeply wounds the feelings of the Mahishya community formerly known as Chasi Kaibarttas. It may not be out of place to mention here, for your information that some of the "Jelia Kaibarttas" as I come to learn, induced, out of a malicious spirit by a few members of the other communities, are trying to mislead the Government, and the general public, by recently setting on foot a curious movement, the object of which is to get the Jelia Kaibarttas also returned as Mahishyas. Your honour is perfectly aware of the fact that it has been finally decided, after a good deal of controversy and with the opinions of several eminent Pandits of India that the Mahishyas (Chasi Kaibarttas) are quite distinct from Jelia Kaibarttas both in origin and social position.In conclusion, I beg most respectfully to request the favour of your informing me of any other points of misinterpretation against Mahishya Community," তদেব, পৃ. ১২৫-১২৬।

[৬০] "With reference to your memorial dated the 19th February 1911, asking that all Kaibarttas may be returned under one head as Mahishya, I have the honour to inform you that I am unable to grant your request as the use of the term Mahishya is confined to the Chasi Kaibartta," তদেব, পৃ. ১২৮।

[৬১] "With refference to your letter of no data stating that thr chief occupation of the Patnis is cultivation and that therefore they should be called Chasi Kaivartta and placed under the category of Mahishya, I have the honour to point out that Patnis and the Chasi Kaivarttas have hithero been returned as seperate caste, and that no proof is produced by you to show that the Patnis and the Chasi Kaivarttas from the one and same caste. In these cercumstances, I am unable to accede to your request," তদেব, পৃ. ১২৯।

বোঝা যাচ্ছে, শুমারি কর্মকর্তারা আন্দোলনকারীদের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগকে উপেক্ষা করতে পারে নি। দীর্ঘ বিশ বছরের সংগ্রামের পর মাহিষ্য আন্দোলন চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করে।

১৯০১ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত চাষি কৈবর্ত জাতিবর্ণ যে চূড়ান্ত আন্দোলন শুরু করে এর ফলে চাষি কৈবর্ত সমাজে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। বিশেষ করে শিক্ষিত চাষি কৈবর্তদের মধ্যে সম্প্রদায়গত এক ধরনের গণজাগরণ শুরু হয়, সমাজ সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই সমাজের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত পিছিয়ে পড়া অংশটির মধ্যে বিশেষ কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে মাহিষ্য নেতৃবৃন্দ মনে করেন না।

মাহিষ্য নেতৃবৃন্দের ধারণা, মাহিষ্য আন্দোলনে তারা দ্বিবিধ আক্রমণ প্রতিহত করেছে। একটি ছিলো সাধারণ হিন্দু সমাজের, যারা সবসময়ে ক্ষমতার দিক থেকে উচ্চ আসনে আসীন থেকেছে অন্যটি ছিলো সমাজের সুবিধা বঞ্চিত ও নিষ্পেষিত জাতিগুলো থেকে। অর্থাৎ, জেলে কৈবর্ত ও পাটনি সমাজ থেকে। ১৯১১ সালে এদের মাহিষ্য নামে পরিগণিত হওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে ১৯২১ সালের শুমারির সময়ে। তখন জেলে কৈবর্তদের থেকে পাটনিদের আগ্রহ বেশি দেখা যায়। চাষি কৈবর্তদের মতো তারাও কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছ থেকে ব্যবস্থাপত্র নিয়ে মাহিষ্য নামের জন্য আদমশুমারি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে।

পাটনিদের আবেদনের প্রেক্ষিতে শুমারি কর্তৃপক্ষ তাদের লুপ্ত মাহিষ্য নামে পরিচিতি দিতে সম্মতি জানায়। এ ভিত্তিতে তাদের সরকারি চিঠিও প্রদান করা হয়। মাহিষ্যদের মধ্যে সর্বপ্রথম সুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস এ বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারেন। এর প্রতিবাদে তিনি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। একই সাথে বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির সম্পাদককে জানিয়ে দেন, পাটনিদের যেন মাহিষ্যদের থেকে পৃথক করে রাখা হয়। এ বিষয়ে সমিতির সম্পাদক শুমারি কর্তৃপক্ষকে একটি চিঠি প্রদান করলে কর্তৃপক্ষ উত্তর জানায় ১৯২০ সালের ১৬ই জুলাই। এতে উল্লেখ থাকে, চাষি কৈবর্তরা আগের মতোই মাহিষ্য নামে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং জেলে কৈবর্ত ও পাটনিরা পৃথক শ্রেণিভুক্ত হবে। ১৯২০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর আরও একটি চিঠিতে জানানো হয় শুমারিতে 'মাহিষ্য অর্থাৎ চাষি কৈবর্ত' এই বাক্যের ব্যবহার হবে এবং এদের সাথে জেলে কৈবর্ত ও পাটনিদের পার্থক্যের বিষয়টি উল্লেখ করা হবে। এই চিঠিগুলো দেখে বোঝার উপায় নেই যে শুমারি কর্তপক্ষ তখনও পাটনিদের 'লুপ্ত মাহিষ্য' নামটি প্রদানের জন্য বিবেচনা করছিলেন। এই মর্মে একটি আদেশপত্র জারি করা হয় ১৯২১ সালের ২১শে জানুয়ারিতে। মাহিষ্য সমিতি পুনরায় তার প্রতিবাদ করলে ১৯২১ সালের ১৮ই এপ্রিল শুমারি কর্মকর্তা ডব্লিউ এইচ থম্পসন 'মাহিষ্য সমাজ' পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত

সেবানন্দ ভারতীকে উত্তর দেন – কোনো প্রকার সঠিকতা নির্ণয় ছাড়াই শুমারি রিপোর্টে লেখা হবে যে, পাটনিরা 'লুপ্ত মাহিষ্য' নামে কথিত হওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে মাহিষ্যদের সাথে আলোচনার কোনো সময় তার নেই।[৬২]

এই উত্তর পাওয়ার পর মাহিষ্যরা কলকাতায় একটি সভা আহ্বান করে। সভার মন্তব্য এবং পাটনিরা যে মাহিষ্য নয় তার প্রমাণাদি থম্পসনের নিকট পাঠানো হয়। তিনি প্রত্যুত্তরে জানান, শুমারি রিপোর্টে কেবল লেখা হবে যে পাটনিরা মাহিষ্য নামের দাবি করে এবং নামের তালিকায় পাটনির সাথে বন্ধনীর মধ্যে লুপ্ত মাহিষ্য নামের উল্লেখ থাকবে না। শেষ পর্যন্ত শুমারি রিপোর্টে পাটনিদের এই দাবির কথা উল্লেখ করা হয়। মাহিষ্য সমিতি মনে করে শুমারি কর্মকর্তা থম্পসন তাদের উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। মাহিষ্যদের সমকালীন অবস্থা বর্ণনার ক্ষেত্রে থম্পসনের মন্তব্য দেখে তাদের এই ধারণা হয়েছিলো – শিক্ষা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মাহিষ্যদের তিনি অনুন্নত ও হীন জাতির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

এই মতের বিরুদ্ধে মাহিষ্যরা সরকারের কাছে একটি আবেদন পাঠায়। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, উল্লিখিত মন্তব্যটি সরকারের অনুমোদিত মত নয় বরং শুমারি কর্মকর্তার ব্যক্তিগত মত। তাই মাহিষ্যদের অনিষ্ট হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

১৯২১ সালে জেলে কৈবর্ত এবং পাটনিদের প্রচেষ্টাকে বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি প্রতিহত করতে পারলেও পরবর্তী আদমশুমারিতে ব্যর্থ হয়। ১৯৩১ সালে শুমারি কর্তৃপক্ষ অনেকগুলো জাতিবর্ণের দাবিকৃত নাম গ্রহণ করে। ১৯৩১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে পাটনি নামের সাথে বন্ধনীর মধ্যে 'লুপ্ত মাহিষ্য' এবং 'পাটুনি' নাম উল্লেখ করা হয়।[৬৩]

তবে আন্দোলনে প্রাপ্তির দিক দিয়ে চাষি কৈবর্তরা জেলে কৈবর্তদের থেকে অনেক অগ্রসর ছিলো। চাষি কৈবর্ত জাতিবর্ণ মাহিষ্য পরিচয় গ্রহণ এবং সামাজিক অবস্থান তৈরিতে অনেক জাতিবর্ণের মাধ্যমে যেমন নিজেরা উৎসাহিত হয়েছিলো তেমনি অনেক জাতিবর্ণকে উৎসাহিতও করেছিলো।

---

[৬২] "In reference to your letter No. 52 dated 14th April, 1921. I have the honour to state that I propose to mention in the Census Report without comment on its correctness the claim of the Patnis to be called Lupta Mahishya. I regret that I am unable to make time to discuss with you the case of communities other than the one which you represent," তদেব, পৃ. ৬৪।

[৬৩] *Census of India 1931,* vol. V, part II, pp. 239.

৫. মাহিষ্য আন্দোলনে পত্রিকার ভূমিকা

যে কোনো আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে পত্রিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাহিষ্য আন্দোলনের ক্ষেত্রেও পত্রিকাগুলোর বিশেষ অবদান রয়েছে। আন্দোলনের শুরুর দিকে 'সময়' নামে একটি পত্রিকা মাহিষ্যদের বক্তব্য প্রকাশ করতো। কিন্তু আন্দোলনের বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধাচরণের ফলে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। চাষি কৈবর্ত সমাজের এই দীর্ঘদিনের এই অভাব দূর হয় কলকাতার ডায়মণ্ড হারবার নিবাসী মহেন্দ্রনাথ দাসের মাধ্যমে। তিনি 'সেবিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি মাহিষ্য আন্দোলনকে বেগবান করতে এবং সমাজে মাহিষ্যদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে প্রভূত সহায়তা করে। এই পত্রিকার মাধ্যমেই আন্দোলনের যে কোনো পদক্ষেপ বা তথ্য সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মাহিষ্য সমাজে পৌঁছে যায়। কিন্তু ১৯১২ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর মাহিষ্য সমিতি থেকে আরও একটি পত্রিকা বের করার প্রস্তাব দুই-তিন বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। ১৯১৭ সালের বৈশাখ মাস থেকে 'মাহিষ্য সমাজ' নামে মাহিষ্যদের একটি সামাজিক পত্রিকা বের হয়।

প্রথমদিকে কয়েক বছর পত্রিকাটির নির্দিষ্ট কোনো সম্পাদক ছিলো না। মাহিষ্য সমিতির কর্মচারী রামপদ বিশ্বাস সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই পদটি অবৈতনিক ছিলো। এ কারণে পত্রিকাটি প্রকাশে নানা রকম জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনেক বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে নানা ইতিহাসের সাক্ষী এই 'মাহিষ্য সমাজ' পত্রিকাটি বর্তমানেও চালু রয়েছে এবং এখনও মাহিষ্য সমাজের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

৬. উপসংহার

সংস্কৃতায়নের সঙ্গে মর্যাদার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন কোনো জাতিবর্ণকে সমাজে অস্পৃশ্য করে রাখা হয়, সেই জাতিবর্ণটি তার প্রচলিত অবস্থান থেকে পরিচয় পরিবর্তনের জন্য বাধ্য হয়। সেটা পদবি পরিবর্তন করে হয়ে থাকে আবার আন্দোলনের মাধ্যমেও হয়ে থাকে। চাষি কৈবর্ত জাতিবর্ণও আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের মাহিষ্য পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এজন্য তারা বিভিন্ন পণ্ডিতমহল থেকে ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেছে, ব্রিটিশ সরকার ও শুমারি কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে জাতিগতভাবে নিজেদের উন্নীত করেছে। এর ফলে সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছে। যদিও চাষি কৈবর্তদের আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে কিছু জেলে কৈবর্ত এবং পাটনি

সম্প্রদায়ের মানুষও নাম বদলের আন্দোলন করেছিলো। কিন্তু সে আন্দোলন থেকে জেলে কৈবর্ত বা পাটনিদের সামজিক মর্যাদার তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

জাতিবর্ণগুলোর নাম বদলের এই আন্দোলন তাদের সামাজিক মর্যাদা অর্জনের জন্য কতোটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো তা বোঝা যায় ১৯৩১ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ঘটনা থেকে। 'প্রবর্তক' নামের পত্রিকাটিতে বলা হয়, সাধারণ হিন্দু সমাজের মানুষ পাটনিদের মাহিষ্য পরিচয়ে আপত্তি করায় সিলেটের সুনামগঞ্জে পাটনিরা মুসলমান হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলো। যদিও শেষ পর্যন্ত তারা ধর্মান্তরিত হয়নি।[৬৪] এই ঘটনা থেকে তৎকালীন সাধারণ হিন্দুদের মনোভাব সম্পর্কে কিছুটা হলেও আঁচ করা যায়। শেষ পর্যন্ত পাটনিরা লুপ্ত মাহিষ্য নাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এলাকাভেদে পাটনিরা মাহিষ্য দাস হিসেবেও পরিচিতি লাভ করে।[৬৫] তবে এটুকু অর্জন তাদের সামাজিক মর্যাদাগত অবস্থানকে খুব বেশি পরিবর্তন করতে পারেনি।

মর্যাদা বৃদ্ধির আন্দোলনে যে সকল জাতিবর্ণ অংশগ্রহণ করেছে তাদের সাথে চাষি কৈবর্ত বা মাহিষ্যদের আন্দোলনের পদ্ধতিগত একটা পার্থক্য ছিলো, যা লক্ষ করার মতো। সেটা হলো আন্দোলনে এরা সরাসরি তথাকথিত উচ্চবর্ণগুলোকে আক্রমণ করেনি, তাদের শ্রেণিবৈষম্য বা সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধেও কোনো কথা বলেনি। মাহিষ্যরা ব্রাহ্মণত্ব দাবি করেনি, নিরেট কৃষিজীবী একটা জাতিবর্ণ হয়ে জাতিবর্ণের ক্রমোচ্চ ধাপের মাঝামাঝি একটা অবস্থান নিশ্চিত করতে চেয়েছে মাত্র। দাবি আদায়ের ক্ষেত্রেও তারা সবসময়ে মধ্যপন্থী অবস্থান গ্রহণ করেছে।[৬৬]

সমকালের বেশ কয়েকটি জাতিবর্ণ অবশ্য কৈবর্তদের মতো এমন আপোসমূলক মনোভাব দেখায়নি। যেমন প্রায় সমকালে নমঃশূদ্ররা ব্রাহ্মণত্ব এবং রাজবংশীরা ক্ষত্রিয়ত্ব দাবি করেছিলো। রাজবংশীরা রাজবংশী ক্ষত্রিয় নাম নিয়ে আংশিক সফল হলেও নমঃশূদ্র জাতিবর্ণ ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে পারেনি। শুধু নমঃশূদ্র নয়, ব্রাহ্মণত্ব দাবি করা অন্য কোনো জাতিবর্ণই তখন সফল হতে পারেনি। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা নিজেদের মর্যাদা ঠিক রেখে অন্য জাতিবর্ণের মর্যাদার সনদ

---

[৬৪] জাতিবর্ণগুলোর ধর্মান্তর প্রসঙ্গটির বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে।

[৬৫] সাক্ষাৎকার: বিধান চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (৫৭), কৈবর্ত পুরোহিত ও হোমিও চিকিৎসক, হালদার পাড়া, সিলেট, তারিখ: ২৩.০৫.২০১৯।

[৬৬] Prasenjit Biswas, "Social Mobility and the Dynamics of Caste: The Mahishyas of South-Western Bengal (1901-1931)" (PhD Dissertation, Calcutta University, 2016), p. abstract.

দিয়েছে। এক্ষেত্রে শুমারি কর্তৃপক্ষও ব্রাহ্মণ্যবাদী মনোভাবের বাইরে যেতে পারেনি বরং ব্রাহ্মণদের চিরাচরিত ধারণাকেই শুমারির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করেছে।

একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এভাবে চাষি কৈবর্ত জাতিবর্ণ মাহিষ্য হিসেবে নতুন পরিচয় গ্রহণ করে। তাতে হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে বিন্যস্ত তথাকথিত উচ্চবর্ণের সাথে মাহিষ্যদের সামাজিক মর্যাদার ব্যবধান খানিকটা হ্রাস পায়। সমাজে প্রচলিত অবস্থা থেকে তাদের সামাজিক মর্যাদার এই পরিবর্তন জাতিবর্ণটির সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়াকেই প্রতিফলিত করে।

চতুর্থ অধ্যায়

কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়ন: সংস্কার প্রসঙ্গ

১. ভূমিকা

সংস্কার বলতে হিন্দু সমাজে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সমস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বিধিনিয়ম পালন করা হয় সেগুলোকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ হিন্দু সমাজের অবশ্য পালনীয় আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, প্রথা প্রভৃতিকে সংস্কার বলা হয়। সদাচার, সংযম ও বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করাই হলো সংস্কার। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী, শাস্ত্রে বর্ণিত সংস্কার পালনের মধ্যেই হিন্দুদের পরিচয় ও সকল ধরনের মঙ্গল নিহিত। সংস্কার হিসেবে বহুবিধ আচার-অনুষ্ঠান, বিধি ও প্রথা রয়েছে। যেমন, বিবাহ, গর্ভাধান, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, শৌচাশৌচ প্রভৃতি।

হিন্দু সংস্কারগুলোর উৎস গ্রন্থ হলো বিভিন্ন ধরনের স্মৃতিশাস্ত্র। যেমন, ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ প্রভৃতি। এছাড়া বর্তমান সময়ে পুরোহিত দর্পণ সংস্কার বিধি পালনে বহুলভাবে ব্যবহৃত একটি গ্রন্থ। কোন কোন বর্ণ কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করবে স্মৃতিশাস্ত্রগুলোতে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। অর্থাৎ একজন ব্যক্তির কর্তব্য, খাদ্য-অখাদ্য, শৌচ-অশৌচ ও শুদ্ধি-অশুদ্ধি, চার বর্ণের আপৎকালের বিধান, প্রায়শ্চিত্ত বিধান প্রভৃতি বিধিবিধানই সংস্কার হিসেবে হিন্দু সমাজে পালিত হয়ে আসছে।[১] এক কথায় বলা যায়, শাস্ত্র অনুসারে হিন্দুদের জন্য ধর্মীয় আচরণবিধিই হলো সংস্কার। হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী, সংস্কার শরীর ও মনের শুদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে। বলা হয়ে থাকে, সংস্কার মানুষের দৈহিক মলিনতা দূর করে দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণে বিভূষিত করে।

শাস্ত্রের ভাষ্য অনুযায়ী বৈদিক ঋষিরা বিশ্বাস করতেন, সংস্কারের দ্বারা ব্যক্তিজীবনে অনেক মঙ্গল সাধিত হয়। এগুলো হলো, অবাঞ্ছিত প্রভাব দূরীকরণ, অভীষ্ট প্রভাবের আমন্ত্রণ ও প্রাপ্তি, ধন-ধান্য, পশু, সন্তান, দীর্ঘায়ু, সমৃদ্ধি, শক্তি এবং বুদ্ধিলাভ, জীবনে বিভিন্ন কারণে সঞ্জাত সুখ-দুঃখ, হর্ষবিষাদের অভিব্যক্তি সৃষ্টি, গর্ভ ও বীজ সম্বন্ধীয় দোষ দূরীকরণ, সামাজিক বিশেষ অধিকার তথা অপরাপর দায়িত্ব পালনে যোগ্যতা সম্পাদন, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি পূর্বক ব্রহ্মপদলাভ, ব্যক্তির

---

[১] *মনুসংহিতা*, ভরতচন্দ্র শিরোমণি অনূদিত (কলকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৮৯৮), পৃ. ভূমিকা ২।

নৈতিক বিকাশ সম্পাদন, ব্যক্তিত্বের গঠন ও বিকাশ সম্পাদন, দেহ ও মনের শুদ্ধি ও ব্রহ্মতেজের আধার করণ, এবং ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধের উদ্বোধন।[২]

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলো বেদ। বেদ বা শ্রুতি বলতে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদকে বোঝায়। কিন্তু এই বেদ পাঠের সহায়ক হিসেবে আরও কিছু রচনা সৃষ্টি করা হয়েছিলো। সামগ্রিকভাবে এগুলোকে বেদাঙ্গ বলা হয়। এর প্রয়োজন ছিলো ব্যবহারিক কাজে। বেদাঙ্গ বেদ-পাঠ ও যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হতো। শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের জন্য বেদাঙ্গ সাহিত্য রচনা করা হয়েছিলো। বেদাঙ্গ সাহিত্য ছয় ধরনের বিষয়বস্তুতে বিভক্ত ছিলো – এগুলো হলো শিক্ষা, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প।[৩]

কল্পের আলোচ্য বিষয় হলো নির্ভুলভাবে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠানের পদ্ধতি। মনে রাখার সুবিধার জন্য কল্পগুলি সূত্র আকারে রচিত। কল্পসূত্রে যজ্ঞের প্রয়োগবিধির পাশাপাশি গার্হস্থ্য জীবনের সংস্কার প্রভৃতির আলোচনা রয়েছে। চার ধরনের কল্পসূত্র রয়েছে, এগুলো হলো – ১. শ্রৌতসূত্র, ২. গৃহ্যসূত্র, ৩. ধর্মসূত্র, এবং ৪. শূল্বসূত্র।[৪] এদের মধ্যে গৃহ্যসূত্রতে গৃহ্য যজ্ঞের আলোচনা রয়েছে। হিন্দুসংস্কৃতিতে জন্ম থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত যেসব সংস্কার পালন করা হয় সেই সংস্কারগুলো রয়েছে এই গৃহ্যসূত্রে। এছাড়া সংস্কারগুলো কিভাবে পালন করা হবে তার বিধিও এখানে রয়েছে। আর ধর্মসূত্রে রয়েছে আচরণ সম্পর্কে উপদেশ ও অনুশাসন, ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য-অকর্তব্য, দেশাচার-লোকাচার প্রভৃতির আলোচনা।

সংস্কারের সংখ্যা নিয়ে স্মৃতিশাস্ত্র এবং গৃহ্যসূত্রগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।[৫] যেমন, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত সংস্কারের সংখ্যা ১১টি, বৌধায়নে ১৩টি, বৈখানত্রে ১৮টি, পারস্ক গৃহসূত্রে বর্ণিত সংস্কার ১৩টি। ধর্মসূত্রগুলোর সংখ্যাতেও বৈষম্য লক্ষ করা যায়। তবে গৌতম ধর্মসূত্রে আত্মগুণসহ ৪০টি সংস্কারের উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তী সময়ে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি

---

[২] অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., *যজুর্বেদীয় দশবিধ সংস্কার বিধি* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০২), পৃ. ঙ।

[৩] https://horoppa.wordpress.com/2015/07/05/vaidika-savyata-5-vaidika-literature-vedanga, accessed in 17 May 2020.

[৪] Ibid.

[৫] Dr. M. Winternitz edited, *The Apastambiya Grihyasutra* (Vienna: Alfred Holder, 1887); Mahamahopadhaya Chandrakanta Tarkalankara edited, *Grihyasangraha* (Kolkata: Asiatic Society, 1939).

স্মৃতিকারগণ তেরোটি সংস্কারকে স্বীকার করেছেন। এগুলো হলোঃ ১. গর্ভাধান, ২. পুংসবন, ৩. সীমন্তোন্নয়ন, ৪. জাতকর্ম, ৫. নামকরণ, ৬. নিষ্ক্রমণ, ৭. অন্নপ্রাশন, ৮. চূড়াকর্ম, ৯. কেশান্ত, ১০. উপনয়ন বা মৌঞ্জীবন্ধন, ১১. সমাবর্তন, ১২. বিবাহ, এবং ১৩. অন্ত্যেষ্টি – এই তেরোটি সংস্কারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৬]

এর আরও পরবর্তী কালে স্মৃতিশাস্ত্রগুলোকে যারা লিপিবদ্ধ করেছেন তারা কেশান্ত, সমাবর্তন ও অন্ত্যেষ্টি – এই তিনটিকে বাদ দিয়ে দশবিধ সংস্কারের উল্লেখ ও প্রয়োগবিধি বর্ণনা করেছেন। তবে হিন্দু সমাজে এখনও কোথাও কোথাও গৃহ্যসূত্র যুগের কর্ণবেধ সংস্কার এবং স্মৃতিযুগের সমাবর্তন সংস্কার উপনয়নের সময়ে হয়ে থাকে।

বর্তমানে হিন্দু সমাজের সকল জাতিবর্ণের মধ্যে বিবাহ, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশন – এই তিনটি সংস্কারই মূলত অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। আবার এই তিনটির মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় নির্দেশনার গুরুত্বই বেশি লক্ষ করা যায়।

২. সংস্কার বিধায়ক ব্যক্তিবর্গ

সংস্কারের সাথে বেশ কিছু ব্যক্তি যুক্ত থাকে। এদের আমরা সংস্কার বিধায়ক বা নিয়ন্ত্রক বলতে পারি। যেমন, পুরোহিত, ক্ষৌরকার, এয়ো স্ত্রী, বাজনদার প্রভৃতি। তবে কিছু সংস্কার পালনে কয়েক ধরনের নারীদের অংশগ্রহণের উপরে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যেমন, বিধবা, বন্ধ্যা বা মৃতবৎসা নারী।

সংস্কার পালনে পুরোহিতদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সংস্কার বিধায়কদের মধ্যে পুরোহিতদের নিয়ন্ত্রণ সবথেকে বেশি। কারণ, স্মৃতিশাস্ত্রগুলোতে সংস্কারের যে ধারণা পাওয়া যায় তা ব্রাহ্মণদের স্বার্থসমর্থিত। যেমন বলা যায়, যদি কোনো ব্রাহ্মণ ব্যক্তির বয়স মাত্র দশ বছর হয় আর ক্ষত্রিয় কোনো ব্যক্তির বয়স একশ বছর হয় তারপরও ব্রাহ্মণ ব্যক্তি পিতা আর ক্ষত্রিয় ব্যক্তি সন্তানতুল্য হবেন।[৭] অর্থাৎ ক্ষত্রিয় অধিক বয়স্ক হলেও কম বয়সী ব্রাহ্মণকে প্রণাম করবে, এটাই স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান।

---

[৬] অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., *ছান্দোগ-দশবিধ-সংস্কার বিধি* (কলকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০২), পৃ. ঙ।

[৭] "ব্রাহ্মণং দশবর্ষন্ত শতবর্ষন্ত ভূমিপম্। পিতাপুত্রৌ বিজানীয়াদ্‌ব্রাহ্মণস্তু তয়ো পিতা॥" তদেব, পৃ. ১৩৬।

এই গবেষণার ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়ে এমন একাধিক উদাহরণ পাওয়া গেছে, যেখানে অব্রাহ্মণ জাতিবর্ণের প্রবীণ ব্যক্তিরাও তরুণ পুরোহিত ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে। বিশেষভাবে চট্টগ্রাম অঞ্চলের কৈবর্তদের মধ্যে অল্প বয়সের পুরোহিতদের প্রণাম করার রীতি প্রচলিত।[৮] একই চিত্র দেখা যায় সিলেট এবং কুমিল্লা অঞ্চলের কৈবর্তদের মধ্যে। রাজশাহী অঞ্চলের গ্রামগুলোতে জেলে কৈবর্ত এমনকি চাষি কৈবর্তের মধ্যেও এই রীতি পালিত হতে দেখা যায়। যে কোনো পূজাপার্বণের শেষে পুরোহিতকে দক্ষিণা দেওয়ার সময়ে এই রীতি অনুসৃত হতে দেখা যায়।[৯]

তবে শিক্ষিত যজমানদের বেলায় এই রীতি পালনে কমবেশি শিথিলতা লক্ষ করা যায়। অনেকে অধিক দক্ষিণা দিয়ে এই অসঙ্গত আচরণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করে। বিশেষভাবে শিক্ষিত মাহিষ্যদের অনেকেই আজকাল অল্পবয়স্ক পুরোহিতকে পায়ে হাত দিয়ে বা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে চায় না, বড়ো জোর দুই হাত একত্র করে নমস্কারের ভঙ্গিতে প্রণাম করে থাকে। শহরে এবং উচ্চবিত্ত মাহিষ্যদের বাড়িতে উৎসব পার্বণ বাদেও যেসব ক্ষেত্রে নিত্যপূজার জন্য মাসোহারা দিয়ে পুরোহিত নিয়োগের প্রচলন রয়েছে, সেখানে এই ধরনের প্রণাম রীতির কোনো প্রয়োজন হয় না।

সংস্কারাদি পালনের সময়ে যেহেতু পুরোহিতের দরকার হয়, এবং পুরোহিতের নির্দেশই চূড়ান্ত মনে করা হয়ে থাকে, সেহেতু প্রণাম ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রেই কৈবর্ত ও মাহিষ্য যজমানগণ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কর্তৃত্বকে মেনে নেয়। এর ফলে সমাজে ব্রাহ্মণ সন্তানের অপেক্ষাকৃত উঁচু সামাজিক মর্যাদা স্থায়িত্ব পায়। পৌরোহিত্যের বৃত্ত ছাড়িয়ে তা সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। তার ফলে সমাজে কে নেতা হবে, কার কথার গুরুত্ব বেশি হবে, কাকে অধিকতর সুবিধা দিতে সবাই রাজি হবে – এসব ব্যাপারে কৈবর্ত অধ্যুষিত গ্রামেও ব্রাহ্মণ ব্যক্তি সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে।

সংস্কারাদি পালনের বেলায় পুরোহিতগণ প্রধানত তিনটি বেদ অনুসরণ করে। এগুলো হলো – ঋগ্‌বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ। বেদ অনুসরণের দিক দিয়ে পুরোহিত ব্রাহ্মণের পরিচয়ও আলাদা হয়। যারা ঋগ্‌বেদ অনুসরণ করেন তারা ঋগ্‌বেদী ব্রাহ্মণ, সামবেদ অনুসরণকারীরা সামবেদী ব্রাহ্মণ এবং যারা যজুর্বেদ অনুসরণ করে তাদের যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ বলা হয়ে থাকে।[১০]

---

[৮] হরিশংকর জলদাস (৬৭), অধ্যাপক ও কথাসাহিত্যিক, ডিসি হিল আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম। তারিখ: চট্টগ্রাম, ১২.০৮.২০১৯।

[৯] সাক্ষাৎকার: উজ্জ্বল কুমার দাস (৬৫), ব্যবসায়ী, আত্রাই, নওগাঁ। নওগাঁ, ০১.০৪.২০২০।

[১০] সাক্ষাৎকার: বিনয় কুমার চক্রবর্তী (৬৫), অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও মাহিষ্য পুরোহিত, কচুয়া, আত্রাই, নওগাঁ। তারিখ: মোবাইলে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ২১.০৬.২০২০।

বেদ অনুযায়ী সংস্কারের পার্থক্য ব্রাহ্মণসহ সব জাতিবর্ণের জন্যই প্রযোজ্য। তবে পৌরোহিত্যের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ যে বেদের অনুসারী, সেই অনুসারে সে পৌরোহিত্য করে না, বরং যজমানদের জন্য নির্ধারিত সংস্কার যে বেদে রয়েছে পুরোহিত সেই অনুযায়ী পৌরোহিত্য করে। যেমন মাহিষ্য পুরোহিতগণ সাধারণত যজুর্বেদীয় দশবিধ সংস্কার বিধি অনুসরণ করে যাবতীয় সংস্কারাদি করে থাকে।[১১]

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র; এই বর্ণগুলোর মধ্যে যেমন অবস্থানগত, মর্যাদাগত পার্থক্য রয়েছে ঠিক তেমনি এই বর্ণগুলোর সংস্কারের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। সংকর জাতিবর্ণ হিসেবে কৈবর্ত জাতিবর্ণ শূদ্র বর্ণের অন্তর্গত। কিন্তু বিভিন্ন প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে কৈবর্ত জাতিবর্ণ নিজেদের কখনো ক্ষত্রিয় আবার কখনো বৈশ্য বলে দাবি করে আসছে। এই দাবির সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রচলিত সংস্কারেও নানা ধরনের পরিবর্তন চেষ্টা লক্ষ করা যায়। এসব বিষয় মনে রেখে কৈবর্ত জাতিবর্ণের প্রধান প্রধান সংস্কার কী এবং কীভাবে তা পরিবর্তিত হয় বা হয়েছে তা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হলো।

৩. হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী সংস্কারসমূহের বিবরণ

কৈবর্ত জাতিবর্ণের পালিত সংস্কারগুলোর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বে হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত সংস্কারগুলোর প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। তাতে কৈবর্ত জাতিবর্ণের পালিত সংস্কার কতোটা সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট, তা উপলব্ধি করা সহজ হবে। প্রধানত হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রসমূহের মধ্যে এসব সংস্কারের বর্ণনা পাওয়া যায়। তাই স্মৃতিশাস্ত্রগুলোর উপর ভিত্তি করেই হিন্দু সমাজের এসব সংস্কারের পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

ছান্দোগ-দশবিধ সংস্কার অনুযায়ী দশবিধ সংস্কারগুলো হলো – ১. গর্ভাধান, ২. পুংসবন, ৩. সীমন্তোন্নয়ন, ৪. জাতকর্ম, ৫. নিষ্ক্রমণ, ৬. নামকরণ, ৭. অন্নপ্রাশন, ৮. চূড়াকরণ, ৯. উপনয়ন, ও ১০. বিবাহ।[১২] এগুলোর পাশাপাশি যজুর্বেদীয় দশবিধ সংস্কারে সমাবর্তন সংস্কার রয়েছে। কিন্তু

---

[১১] তদেব।

[১২] অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., *ছান্দোগ-দশবিধ-সংস্কার বিধি* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০২), পৃ. ৪৫।

এসব সংস্কারের বাইরেও কিছু সংস্কার সমাজে পালিত হতে দেখা যায়। এগুলোর মধ্যে অশৌচ পালন ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দুটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার।

মনুসংহিতা অনুযায়ী প্রাচীন ব্রহ্মাবর্ত দেশে প্রচলিত আচার-ব্যবহারগুলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র – এই চার বর্ণ মেনে চলবে।[১৩] এই আচারগুলোই বর্তমানে বিভিন্ন সংস্কার হিসেবে পরিচিত। মনুসংহিতা পাঠের অধিকার ছিলো শুধু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের।[১৪] শূদ্রদের জন্য সব শাস্ত্রপাঠই নিষিদ্ধ।

মনুসংহিতায় শূদ্র আর নারী সমতুল্য। এদের সামাজিক অবস্থান সমান। প্রকৃতপক্ষে এদের কোনো মর্যাদাই দেওয়া হয়নি। সংস্কারের অধিকার যেমন শুধু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যদের জন্য তেমনি সামাজিক মর্যাদা তাদেরই প্রাপ্য। এই তিন বর্ণের সেবা করাই নারী আর শূদ্রদের একমাত্র কাজ। তাই তাদের উল্লেখযোগ্য কোনো সংস্কার নেই। নারী আর শূদ্ররা শুধুমাত্র কোনো মঙ্গল কাজের জন্য অনুষ্ঠান করতে পারে।[১৫]

মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের গর্ভাধান থেকে শুরু করে অন্য সংস্কারগুলো বৈদিক নিয়মানুযায়ী পালন করতে বলা হয়েছে।[১৬] কারণ যথাযথভাবে সংস্কার পালন না করলে এই তিনটি

---

[১৩] "সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দে বনদ্যোর্যদন্তরম্। তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥ তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ। বর্ণনাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥ অর্থাৎ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই নদীর মাঝে যেসব দেবনির্মিত দেশ আছে তাকে ব্রহ্মাবর্তদেশ বলে। এই দেশে পরম্পরাগতভাবে যে আচার-ব্যবহার প্রচলিত আছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সংকীর্ণজাতি সেই আচারগুলোকে সদাচার হিসেবে মান্য করবে।" *মনুসংহিতা*, ভরতচন্দ্র শিরোমণি অনূদিত, পৃ. ৭৩।

[১৪] "নিষেকাদিশ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ। তস্য শাস্ত্রেহধিকারোহস্মিন্ জ্ঞেয়ো নান্যস্য কস্যচিৎ॥ অর্থাৎ যারা গর্ভাধান থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত সমস্ত কর্ম মন্ত্রের মাধ্যমে করে, দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের এই গ্রন্থ পাঠের অধিকার রয়েছে।" তদেব, পৃ. ৭১।

[১৫] "যদি স্ত্রী যদ্যবরজঃ শ্রেয়ঃ কিঞ্চিৎ সমাচরেৎ। তৎসর্ব্বমাচরেদ্‌যুক্তো যত্র বাস্য রমেন্মনঃ ॥ যদি নারী বা শূদ্র যে কোনো মঙ্গল কর্মের অনুষ্ঠান করে, ব্রহ্মচারী উদ্যোগী হয়ে সে সকলও করতে পারে বা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নয় কিন্তু যে কাজ করলে তার মন ভালো থাকে সে সব কাজও করতে পারে।" তদেব, পৃ. ১৭৫।

[১৬] "বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাম্। কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ॥ দ্বিজাতি বেদে বর্ণিত মন্ত্র উচ্চারণ কর্মের দ্বারা গর্ভাধানসহ অন্যান্য শারীরিক সংস্কার করবে, যাতে তারা ইহলোকে বেদ অধ্যয়ন দ্বারা এবং পরলোকে লাভকৃত যজ্ঞাদি ফল দ্বারা পবিত্র হবে " *মনুসংহিতা*, ভরতচন্দ্র শিরোমণি অনূদিত, পৃ. ৭৮।

বর্ণ শূদ্র হয়ে যাবে – এমন ভয় দেখানো হয়েছে। সেখানে আরও বলা আছে, বিভিন্ন ধরনের পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এসব সংস্কার তাদের পালন করতে হবে।[১৭]

বেদ অনুযায়ী মানব জীবনকে চারটি পর্যায় বা আশ্রমে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো – ১. ব্রহ্মচর্য, ২. গার্হস্থ্য, ৩. বানপ্রস্থ, ৪. সন্ন্যাস। জীবনের এই পর্যায়গুলোর সাথে বিভিন্ন সংস্কার জড়িত। এই সংস্কারগুলো আবার চার ভাগে বিভক্ত যথা – ১. গার্ভসংস্কার, ২. শৈশব সংস্কার, ৩. কৈশোর সংস্কার, ও ৪. যৌবন সংস্কার। জীবনের প্রথম তিনটি সংস্কারকে বলে গার্ভসংস্কার, পরের তিনটি শৈশব সংস্কার, এর পরের তিনটি কৈশোর সংস্কার এবং শেষেরটি যৌবন সংস্কার।

৩.১ গর্ভাধান

ছান্দোগ দশবিধ সংস্কার অনুযায়ী গর্ভাধান সংস্কারের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে ভবিষ্যৎ সন্তানের মধ্যে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষসাধন করা। ছান্দোগ বিধি অনুসারে পিতা-মাতার শরীরে যেসব সমস্যা থাকে তা সন্তানের মধ্যে সংক্রমিত হয়। তাই ভ্রুণসৃষ্টি ও এর উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করা এবং সন্তান উৎপাদনের সময়ে পিতামাতার ইন্দ্রিয়ে পশুত্বভাব না থেকে যেন বিশুদ্ধ সাত্বিকভাবের সৃষ্টি হয় – এই উদ্দেশ্যে গর্ভাধানের বিধান করা হয়েছে।[১৮] গর্ভাধানে বিভিন্ন মন্ত্রের মাধ্যমে ঈশ্বর ও দেবদেবীদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়।

৩.২ পুংসবন

গর্ভাবস্থার দ্বিতীয় সংস্কারের নাম পুংসবন। ছান্দোগ ও যজুর্বেদীয় দশবিধ সংস্কার অনুযায়ী, গর্ভাবস্থার দিন থেকে চার মাসের মধ্যে পুংসবন সংস্কারের বিধান রয়েছে। পুংসবন শব্দের অর্থ পুত্র সন্তানের উৎপত্তি। পিতা-মাতার কাছে পুত্র হোক অথবা কন্যা যে কোনো সন্তান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তারপরও ছান্দোগ-সংস্কার বিধিতে পুত্র কামনায় পুংসবন সংস্কারের পক্ষে কিছু যুক্তি দেখানো হয়, যা আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কাছে হাস্যকর মনে হতে পারে।[১৯]

---

[১৭] "গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্মচৌড়মঞ্জীনিবন্ধনৈঃ। বৈজিকং গার্ভিকশ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে॥" তদেব, পৃ. ৭৯।

[১৮] অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., *ছান্দোগ-দশবিধ-সংস্কার বিধি*, পৃ. ৪৫।

[১৯] "মায়েরা মেয়ে সন্তানের থেকে বেশিরভাগ ছেলে সন্তান কামনা করেন তাই এই সংস্কারের নাম পুংসবন। এই সংস্কারে যে মন্ত্র পাঠ করা হয় সে মন্ত্রে গর্ভবতী মা অত্যন্ত আনন্দিত হন, গর্ভাবস্থায় আলস্য, ভয়, বমনাদিজনিত অবসাদ দূর হয় এবং গর্ভপোষণের শক্তি বৃদ্ধি পায়।" তদেব, পৃ. ৪৯।

৩.৩ সীমন্তোন্নয়ন

গর্ভাবস্থার তৃতীয় সংস্কারের নাম সীমন্তোন্নয়ন। এই সংস্কারটিও গর্ভাবস্থার জন্য বিশেষ উপকারী বলে স্মৃতিশাস্ত্রগুলোতে উল্লেখ রয়েছে। ছান্দোগ বিধি অনুযায়ী, গর্ভের ছয় থেকে আট মাসে এই সংস্কার করার বিধান আছে।[২০] এই বিধি অনুযায়ী, সংস্কারটির প্রধান কাজ হলো গর্ভবতীর সীমন্ত বা সিঁথি তুলে দেওয়া। পুংসবনের পর শুভসময়ে এই সংস্কারটি পালন করার কথাও বলা আছে। বিধি অনুসারে, সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারটি শুধু প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, বার বার করতে হয় না। বর্তমানে এই সংস্কারটি বিলুপ্ত।

৩.৪ জাতকর্ম

শৈশব সংস্কারের প্রথম সংস্কারকে জাতকর্ম বলে। মনুসংহিতা অনুযায়ী, জাতকর্ম সংস্কারটি সন্তান জন্মদানের সাথে সাথেই করাতে হয়।[২১] তবে বালক বলা হলেও সকল সন্তানের ক্ষেত্রেই এটা সংস্কারটি করা হয়ে থাকে। সকল জাতিবর্ণই এই সংস্কারটি পালন করতে পারে কারণ এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো বর্ণের বা দ্বিজাতির কথা উল্লেখ নেই। জাতকর্মে কোনো পুরোহিতের প্রয়োজন পড়ে না। ছান্দোগ দশবিধ সংস্কার অনুযায়ী, নবজাতকের পিতা যব বা চালের ছাতু এবং ঘি-মধু সদ্যোজাত শিশুর মুখে তুলে দিতে হয়।[২২] তবে বিধি অনুযায়ী বর্তমানে পিতা না করলেও প্রসূতি মায়ের কাছে যারা থাকে তারা ঘি ও মধু নবজাতকের মুখে তুলে দিতে পারে।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে এক ধরনের ব্রাহ্মণ আছে যাদের কাজ কোষ্ঠী রচনা করা, ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ণয় করা, অর্থাৎ এদের পেশা হলো ফলিত জ্যোতিষের চর্চা করা। এই শ্রেণির ব্রাহ্মণদের সাধারণ নাম আচার্য ব্রাহ্মণ। কোথাও কোথাও এদের জ্যোতিষাচার্য বলা হয়। সন্তান জন্মগ্রহণের সম্ভাব্য দিনক্ষণ এই আচার্য ব্রাহ্মণদের আগে থেকে জানিয়ে রাখতে হয়। এরপর নবজাতকের জন্মের পর তার স্থিতাবস্থা, তিথি, নক্ষত্র, তারিখ প্রভৃতি দেখে তারা কোষ্ঠী তৈরি করে। এই কোষ্ঠী অনুযায়ী নামকরণ ও বিবাহ সংস্কার পালন করা হয়ে থাকে।

---

[২০] তদেব, পৃ. ৫৫।

[২১] "প্রাঙাভিবর্দ্ধনাং পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়তে। মন্ত্রবৎ প্রাশনঞ্চাস্য হিরণ্যমধুসর্পিষাম্॥ অর্থাৎ বালক জন্মানোমাত্র নাড়ীচ্ছেদের পূর্বে তার জাতকর্ম নামে সংস্কার করাবে এবং সেই সময়ে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তাকে সুবর্ণ, মধু ও ঘি খাওয়াবে " *মনুসংহিতা*, ভরতচন্দ্র শিরোমণি অনূদিত, পৃ. ৮১।

[২২] অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., *ছান্দোগ-দশবিধ-সংস্কার বিধি*, পৃ. ৬৪।

৩.৫ নামকরণ

শিশু জন্মগ্রহণের পর নামকরণ করা গুরুত্বপূর্ণ একটি সংস্কার হিসেবে পালিত হয়। মনুসংহিতা অনুযায়ী, জন্মগ্রহণের এগারো বা বারোতম দিনে জাতশিশুর নামকরণের নিয়ম রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে করতে না পারলে জ্যোতিষশাস্ত্রে বর্ণিত শুভ তিথি, মুহূর্ত ও নক্ষত্র অনুযায়ী করার কথা বলা হয়েছে।[২৩]

মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক, ক্ষত্রিয়ের বলবাচক, বৈশ্যের ধনবাচক এবং শূদ্রের নিন্দাবাচক নাম রাখার বিধান রয়েছে।[২৪] এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের নাম যথাক্রমে শর্মা, বর্মা, ভূতি এবং দাস পদবিযুক্ত হবে এবং তাদের নামে মঙ্গল, বল, সম্পত্তি ও সেবকসূচক বিশেষণ যুক্ত করতে হবে।[২৫] যেমন, শুভশর্মা, বলবর্মা, বসুভূতি, দীনদাস ইত্যাদি। নামকরণের এই নিয়ম পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য। নারীদের নামকরণের ক্ষেত্রে অন্য নিয়ম রয়েছে। মনুসংহিতা অনুযায়ী, মেয়েদের নাম এমনভাবে রাখতে হবে যেন তা মঙ্গলবাচক হয়।[২৬] যেমন – যশোদা দেবী।

৩.৬ অন্নপ্রাশন

শৈশবস্থার তৃতীয় সংস্কারকে অন্নপ্রাশন বলে। যজুর্বেদীয় দশবিধ সংস্কার অনুযায়ী, পুত্র সন্তান হলে ছয় মাসে এবং কন্যা সন্তান হলে পাঁচ মাসে বা সাত মাসে এই সংস্কার করতে হয়। এই সংস্কারের মাধ্যমে শিশুর খাদ্যদ্রব্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। ছান্দোগ দশবিধ সংস্কার অনুযায়ী পিতাই সন্তানের মুখে প্রথম ভাত তুলে দেবে। লোকাচার অনুযায়ী অনেক জায়গায় শিশুর মামা প্রথম মুখে ভাত তুলে খাওয়ায় অথবা তার অভাবে অন্য কেউ কাজটি করে।[২৭]

---

[২৩] "নামধেয়ং দশম্যান্ত দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ। পুণ্যে তিথৌ মুহূর্ত্তে বা নক্ষত্রে বা গুণান্বিতে॥" *মনুসংহিতা*, ভরতচন্দ্র শিরোমণি অনূদিত, পৃ. ৮২।

[২৪] "মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্। বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্॥" তদেব, পৃ. ৮৩।

[২৫] "শর্ম্মবদ্ব্রাহ্মনস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্। বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রম্য প্রৈষ্যসংযুতম॥" তদেব, পৃ. ৮৪।

[২৬] "স্ত্রীণাং সুখোদ্যমক্রূরং বিস্পষ্টার্থং মনোহরম্। মঙ্গলং দীর্ঘবর্ণান্তমাশীর্ব্বাদাভিধানবৎ॥ যে নাম মুখে উচ্চারণ করা যায়, ক্রুরার্থ বাচক না হয়, অনায়সে যে নামের অর্থ বোঝা যায়, যাতে মনে ভালোবাসা জন্মায়, যে নাম মঙ্গলবাচক হয়, যার শেষে দীর্ঘস্বর থাকে, যা উচ্চারণে আশীর্বাদ বুঝায়, নারীদের এমন নাম রাখা উচিত।" তদেব, পৃ. ৮৫।

[২৭] অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., *ছান্দোগ-দশবিধ-সংস্কার বিধি*, পৃ. ৭৯।

মনুসংহিতা অনুযায়ী, জাতশিশুর চতুর্থমাসে সূর্যদর্শন করানোর জন্য সুতিকাগৃহ থেকে নিষ্ক্রমণ নামক সংস্কার করতে হয়, এরপর ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন নামক সংস্কার করতে হয়। অথবা শিশু যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছে সেই বংশে যে নিয়মে যে সময়ে নিষ্ক্রমণ করা হয়ে থাকে সে অনুযায়ী করবে।[২৮]

৩.৭ চূড়াকরণ

চূড়াকরণ একটি কৈশোর সংস্কার। এটি বাল্যকালে করার কথা থাকলেও এটি কৈশোরেও করা হয়ে থাকে। চূড়াকরণের ক্ষেত্রে জাতিবর্ণভেদে কোনো পার্থক্য নেই। মনুসংহিতা অনুযায়ী, সকল জাতিবর্ণই কুলধর্মানুসারে প্রথম বছরে বা তৃতীয় বছরে চূড়াকর্ম করবে।[২৯] তবে পাঁচ বা বেজোড় বছরেও এই সংস্কার করা হয়। এই সংস্কারের প্রধান কাজ মাথার চুল ফেলে দেওয়া। গর্ভাবস্থায় সন্তানের মাথায় যে চুল গজায় তা ফেলে দেওয়াই এই সংস্কারের উদ্দেশ্য।

৩.৮ উপনয়ন

হিন্দু সংস্কারগুলোর মধ্যে অন্যতম উপনয়ন।[৩০] উপনয়ন নারী ও শূদ্রদের জন্য প্রযোজ্য নয়। মনুসংহিতা অনুসারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পুরুষদের জন্য এটি অবশ্য পালনীয় একটি সংস্কার। উপনয়নের জন্যই এই তিন জাতিবর্ণকে দ্বিজ জাতি বলা হয়।

ব্রাহ্মণের নয়গুণ, ক্ষত্রিয়ের ছয়গুণ এবং বৈশ্যের তিনগুণ সুতার পৈতা নিতে হয়। পৈতার সুতায় নয়গুণ, ছয়গুণ বা তিনগুণ প্যাঁচের কারণ এতগুলো গুণের সমষ্টি। শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা – ব্রাহ্মণেরা এ সমস্ত গুণ ও কাজের অধিকারী হবেন। পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য, কার্যকুশলতা, যুদ্ধে অপারঙ্মুখতা, দানে মুক্তহস্ততা, শাসন-ক্ষমতা,

---

[২৮] "চতুর্থে মাসি কর্ত্তব্যং শিশোর্নিষ্ক্রমণং গৃহাৎ। ষষ্ঠেহন্নপ্রাশনং মাসি যদ্বেষ্টং মঙ্গলং কুলে॥" *মনুসংহিতা*, ভরতচন্দ্র শিরোমণি অনূদিত, পৃ. ৮৬।

[২৯] "চূড়াকর্ম্ম দ্বিজাতীনাং সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মতঃ। প্রথমেহব্দে তৃতীয়ে বা কর্ত্তব্যং শ্রুতিচোদনাৎ॥" তদেব, পৃ. ৮৭।

[৩০] "উপনয়নকে বর্ণধর্মও বলা হয়। মনুসংহিতায় বর্ণগুলোর পাঁচটি ধর্মের কথা বলা হয়েছে। বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, গুণধর্ম ও নৈমিত্তিকধর্ম। উপনয়নকে বলে বর্ণধর্ম, উপনীত বর্ণের ভিক্ষাদণ্ডাদি ধারণকে আশ্রমধর্ম বলে, তাদের মুঞ্জময়ী মেখলাদি ধারণকে বর্ণাশ্রমধর্ম বলা হয়, অভিষিক্ত রাজার প্রজাপালনকে গুণকর্ম এবং পাপক্ষয়সাধন প্রায়শ্চিত্তকে নৈমিত্তিক ধর্ম বলা হয়।" *মনুসংহিতা*, ভরতচন্দ্র শিরোমণি অনূদিত, পৃ. ৭৭।

এগুলো ক্ষত্রিয়ের গুণ ও কর্ম। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য বৈশ্যদের গুণ।[৩১] এছাড়া এই তিনটি বর্ণের পৈতা পড়ার পদ্ধতিও আলাদা। কেউ ঘাড়ের ডান দিক থেকে বাম দিকে আবার কেউ বাম দিক থেকে ডান দিকে পৈতা পরে।

মনুসংহিতা অনুসারে, গর্ভের সময় থেকে আট বছরে বা অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ার ছয় বছর তিন মাসের পর থেকে সাত বছর তিন মাসের মধ্যে ব্রাহ্মণের উপনয়ন দেওয়া উচিত। ক্ষত্রিয়দের একাদশ বছরে উপনয়ন করা উচিত। অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ার নয় বছর তিন মাস থেকে দশ বছর তিন মাসের মধ্যে ক্ষত্রিয়দের উপনয়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। বারো বছরে অর্থাৎ দশ বছর তিন মাসের পর থেকে ১১ বছর তিন মাসের মধ্যে বৈশ্যের উপনয়ন করার নিয়ম রয়েছে।[৩২] এভাবে উপনয়ন করতে না পারলে মনুসংহিতায় বিকল্প আরও একটি নিয়ম রয়েছে।[৩৩] পাশাপাশি উপনয়ন গ্রহণের নির্দিষ্ট সময়সীমাও দেওয়া হয়েছে।[৩৪]

---

৩১ "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ। কর্মানি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভোবৈর্গুণৈঃ ॥ শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নম্। দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্। পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ *শ্রীমদ্ভগবদগীতা*, জগদীশ চন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত (পুনর্মুদ্রণ; কলকাতা: প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, ২০১২), পৃ. ৪৩৬-৪৩৭।

৩২ "গর্ভাষ্টমেহব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্। গর্ভদেকাদেশে রাজ্ঞো গর্ভাত্ত দ্বাদশে বিশঃ॥" তদেব, পৃ. ৮৮।

৩৩ "ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে। রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোহষ্টমে॥ অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবর্চ্চস অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন ও তদর্থগ্রহণ ও প্রকর্ষ কামনা করেন, তার গর্ভের সময়সহ পঞ্চম বছরে অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি তিন বছর তিন মাস থেকে চার বছর তিন মাসের মধ্যে উপনয়ন দেওয়া উচিত। যে ক্ষত্রিয় হাতি বা ঘোড়ার ন্যায় বিপুল শক্তির অধিকারী হতে ইচ্ছুক তার গর্ভকালীন সময় থেকে ছয় বছরে অর্থাৎ জন্মের পর চার বছর তিন মাস থেকে পাঁচ বছর তিন মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উপনয়ন করানোর নিয়ম রয়েছে। বাণিজ্য করতে ইচ্ছুক বৈশ্যের আট বছরে অর্থাৎ জন্মের ছয় বছর তিন মাস থেকে সাত বছর তিন মাস পর্যন্ত উপনয়ন দেওয়ার বিধি আছে। " তদেব, পৃ. ৮৯।

৩৪ "অত উর্দ্ধং ত্রয়োহপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ। সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥ ব্রাহ্মণের ষোলো বছর পর্যন্ত অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে চৌদ্দ বছর তিন মাস থেকে পনের বছর তিন মাস পর্যন্ত উপনয়নের সময় নির্দিষ্ট। ক্ষত্রিয়ের বাইশ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ জন্মের পর থেকে একুশ বছর তিন মাস পর্যন্ত এবং বৈশ্যের জন্মের পর থেকে তেইশ বছর তিন মাস পর্যন্ত অর্থাৎ চব্বিশ বছর পর্যন্ত উপনয়নের সর্বশেষ সময়কাল। এই তিন বর্ণ যদি এই সময়ের মধ্যে সংস্কার গ্রহণ না করে তাহলে তারা গায়ত্রীভ্রষ্ট হয়েছে বলে মনে করা হয়, ব্রাহ্মণদের (মহাত্মাদের) নিন্দনীয় হয় এবং তাদেরকে ব্রাত্য বলা হয়" তদেব, পৃ. ৯০।

মনুসংহিতা অনুযায়ী, যারা সঠিক সময়ে উপনয়ন করে না তারা ব্রাত্য হিসেবে পরিচিতি পায়। ব্রাত্যদের অপবিত্র মনে করা হয়, তখন তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। শাস্ত্র অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত না করলে এই অপবিত্রদের বিপদকালেও কোনো ব্রাহ্মণ বেদপাঠ না করানোর এবং তাদের সাথে মেয়ের বিয়ে না দেওয়ার পরামর্শ রয়েছে।[৩৫]

শাস্ত্রে উপনয়নের নির্দিষ্ট পোশাকও রয়েছে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী রুরু নামের কালো হরিণের চামড়ার উত্তরীয় ও ক্ষৌমবস্ত্রের পোশাক পরার বিধান রয়েছে। ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী রুরুনামক হরিণের চামড়ার উত্তরীয় ও রেশমের কাপড় পরার এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারীর ছাগলের চামড়ার উত্তরীয় ও মেষলোমের পোশাক পরার নিয়ম রয়েছে।[৩৬]

মনুসংহিতা অনুযায়ী, উপনয়নে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের জন্য নির্দিষ্ট বিভিন্ন ধরনের ঘাস ও লতা দিয়ে এক ধরনের কোমরবন্ধনী তৈরি করে পরতে হয়।[৩৭] এছাড়া এই তিন বর্ণের বিশেষ ধরনের উপাদানে তৈরি পৈতা পরার বিধান রয়েছে।[৩৮] ব্রাহ্মণেরা চুল পর্যন্ত, ক্ষত্রিয়েরা কপাল পর্যন্ত এবং বৈশ্যেরা নাকের সমান চিকন লাঠি হাতে রাখবে। ব্রাহ্মণের হাতের লাঠি সোজা হবে এবং কোনো ক্ষতস্থান থাকবে না, ছালযুক্ত হবে, আগুনে পোড়া হবে না; দেখতে এমন সুন্দর হবে যেন দেখার পর মানুষের মনে কোনো ভয় তৈরি না হয়।

---

[৩৫] "নৈতৈরপূতৈর্ব্বিধিবদাপদ্যপি হি কর্হিচিৎ। ব্রাহ্মান্ যৌনাংশ্চ সম্বন্ধান্নাচরেদ্‌ব্রাহ্মণঃ সহ ॥" তদেব, পৃ. ৯১।

[৩৬] "কার্ষ্ণ রৌরববাস্তানি চর্ম্মাণি ব্রহ্মচারিণঃ। বসীরন্নানুপূর্ব্বেণ শাণক্ষৌমাবিকানি চ ॥" তদেব।

[৩৭] "মৌঞ্জী ত্রিবৃৎ সমা শ্লক্ষ্ণা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা। ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বী জ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী ॥ মুঞ্জালাভে তু কর্ত্তব্যাঃ কুশাশ্মান্তক বল্বজৈঃ। ত্রিবৃতা গ্রন্থিনৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেব বা। ব্রাহ্মণদের সমান গুণত্রয়ে নির্মিত সুখস্পৃশ্য, মুঞ্জময়ী মেখলা ধারণ করতে হয়। ক্ষত্রিয়দের মুর্ব্বাময়ী ধনুকের ছিলার মতো তিনগুণের এবং বৈশ্যদের শণতন্তুর তৈরি মেখলা করতে হয়। এসব না পেলে ব্রাহ্মণের বুশের মেখলা, ক্ষত্রিয়ের অশ্মান্তক নামে এক ধরনের ঘাসের এবং বৈশ্যরা বল্বজ ঘাসের মেখলা করার কথা। ত্রিগুণা মেখলা করার ক্ষেত্রে জাতিবর্ণগুলোর নিজ নিজ রীতি অনুযায়ী এক, তিন বা পাঁচ গিঁট দ্বারা বাধবেন" তদেব, পৃ. ৯২।

[৩৮] "কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ। শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকম্ ॥ ব্রাহ্মণো বৈল্বপালাশৌ ক্ষত্রিয়ো বাটখাদিরৌ। পৈলবৌদুম্বরৌ বৈশ্যো দণ্ডানর্হন্তি ধর্ম্মতঃ ॥ অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা কার্পাসের তৈরি যজ্ঞোপবীত ধারণ করবে, ক্ষত্রিয় শণ-সুতার তৈরি উপবীত এবং বৈশ্য মেষলোমের উপবীত ধারণ করবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী বেল অথবা পলাশের দণ্ড, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী বট বা খদিরের দণ্ড আর বৈশ্য ব্রহ্মচারী পীলু বা ডুমুরের দণ্ড ধারণ করবে" তদেব, পৃ. ৯৩।

এরকম লাঠি ধারণ করে সূর্যদেবের পূজা করবে, পরে অগ্নি প্রদক্ষিণ করে বিধি অনুযায়ী ভিক্ষা করবে।[৩৯] যারা আয়ু বৃদ্ধি করতে চায় তারা পূর্ব দিকে, যশ বৃদ্ধি প্রত্যাশীদের দক্ষিণ দিকে, সম্পদকামী ব্যক্তিকে পশ্চিম দিকে এবং সত্যফলকামী ব্যক্তিকে উত্তর দিকে ভোজন করানোর নিয়ম। খাওয়ার আগে ও পরে ব্রহ্মচারীরা হাতমুখ ধুয়ে নেবে, শাস্ত্র অনুযায়ী এই বিশেষ ধরনের মুখ ধোয়া আচমন নামে পরিচিত।[৪০]

ব্রাহ্মণেরা আচমনে এতোটা পরিমাণ জল পান করবে, যা বুক পর্যন্ত যেতে পারে। ক্ষত্রিয়েরা কণ্ঠ পর্যন্ত যেতে পারে এমন জলে আচমন করবে। বৈশ্যেরা কেবল মুখের ভেতরে যেতে পারে এমন জলে আচমন করবে। শূদ্ররা শুধু জিহ্বা ও ঠোঁটের প্রান্ত স্পর্শ করতে পারে এমন জলে আচমন করবে। [৪১]

মনুসংহিতা অনুযায়ী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যারা জাতকর্ম থেকে উপনয়ন পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্কার করেছে তারা বেদগ্রহণের জন্য গুরুকুলে বাস করে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য তপস্যার অনুষ্ঠান করতে পারে।[৪২]

মনুসংহিতায় আরও পাওয়া যায়, এই ত্রিবর্ণ প্রথমত মায়ের কাছ থেকে জন্মগ্রহণ করে, উপনয়ন হলে তাদের দ্বিতীয় জন্ম হয়, জ্যোতিষ্টোম্যাদি যজ্ঞে দীক্ষিত হলে তাদের তৃতীয় জন্ম

---

[৩৯] "সমাহৃত্য তু তদ্ভৈক্ষ্যং যাবদন্নমমায়য়া। নিবেদ্য গুরবেহশ্নীয়াদাচম্য প্রাঙ্ম খঃ শুচিঃ ॥ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করতে গিয়ে 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' এই কথা বলবে। ক্ষত্রিয়েরা 'ভিক্ষাং ভবতি দেহি' বলবে এবং বৈশ্যেরা 'ভিক্ষাং দেহি ভবতি' বলবে। এরা প্রথমে মা বা বোন অথবা মাসী বা যে নারী ব্রহ্মচারীকে প্রত্যাখ্যান বা অবমাননা না করেন তাদের কাছে ভিক্ষা চাইবে। এইভাবে ভিক্ষা করে যে পরিমাণ অন্নে তৃপ্তি হতে পারে, ছলশূন্য মনে সেই পরিমাণ অন্ন গুরুকে নিবেদন করবে। এরপর আচমন করে পূর্বমুখে শুদ্ধভাবে ভোজন করবে।" তদেব, পৃ. ৯৪-৯৫।

[৪০] "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মচর্যের পরও আচমন করে খাবার গ্রহণ করবে, খাওয়ার শেষেও আচমন করবে এবং জল দিয়ে চোখ, কান ও নাকের ছয়টি ছিদ্র স্পর্শ করবে। ব্রাহ্মণ সবসময় ব্রাহ্মতীর্থ দিয়ে আচমন করবে অথবা প্রজাপতিতীর্থ বা দেবতীর্থ দিয়েও আচমন করবে কিন্তু কখনও পিতৃতীর্থ দিয়ে আচমন করবে না। বৃদ্ধাঙ্গুলের মূলকে বলে ব্রাহ্মতীর্থ, কনিষ্ঠা আঙ্গুলের মূলের নাম প্রজাপতিতীর্থ, বাকি সব আঙ্গুলের অগ্রভাগ দেবতীর্থ, তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলের মধ্যভাগ পিতৃতীর্থ। " তদেব, পৃ. ৯৯-১০০।

[৪১] "হৃদগাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিস্তু ভূমিপঃ। বৈশ্যোহদ্ভিঃ প্রাশিতাভিস্তু শূদ্রঃ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ ॥" তদেব, পৃ. ১০১।

[৪২] "অনেন ক্রমযোগেন সংস্কৃতাত্মা দ্বিজঃ শনৈঃ। গুরৌ বসন্ সঞ্চিনুয়াদ্ব্রহ্মাধিগমিকং তপঃ ॥" তদেব, পৃ. ১৪৮।

হয়।[৪৩] উপনয়নের আগে ত্রিবর্ণ শ্রাদ্ধীয় মন্ত্র ছাড়া অন্য কোনো বেদ পাঠ করতে পারবে না। উপনীত হয়ে বেদ পাঠের মাধ্যমে দ্বিতীয় জন্ম লাভ না করলে ত্রিবর্ণ শূদ্রের মতো থেকে যায়।[৪৪]

হিন্দু শাস্ত্রে নারীরা হলো দাস। তাই তাদের জন্য বিবাহ-সংস্কারই হলো উপনয়ন নামের বৈদিক সংস্কার; স্বামীর সেবাই গুরুকুলে বাসের সমান আর গৃহকর্মের মধ্য দিয়ে তারা সকাল-সন্ধ্যা হোমরূপ অগ্নিসেবা করছে এটা মনে করবে।[৪৫]

ছান্দোগ দশবিধ সংস্কার অনুযায়ী, ব্রাহ্মণের জন্মের পর ষোলো বছরে কেশান্ত নামে সংস্কার করতে হয়। ক্ষত্রিয়ের বাইশ বছরে এবং বৈশ্যের চব্বিশ বছরে এই সংস্কার করার বিধান রয়েছে। তবে শাস্ত্রে পুরুষদের মতো নারীদেরও দেহশুদ্ধির জন্য এই সংস্কার মন্ত্রবিহীনভাবে করার কথাও বলা আছে।[৪৬]

৩.৯ সমাবর্তন

মনুসংহিতা অনুযায়ী, গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা সমাপ্ত হলে ব্রহ্মচারীর সমাবর্তন সংস্কার করানো হয়। যাদের সমাবর্তন সংস্কার শেষ হয়েছে তাদেরকে স্নাতক বলা হয়।[৪৭] স্নাতক তিন প্রকার: বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক ও বিদ্যাব্রতস্নাতক। যে ব্রহ্মচারী ব্রত শেষ না করে বেদ শেষ করে বিখ্যাত হন তিনি বিদ্যাস্নাতক, যে বেদ শেষ না করে ব্রত শেষ করে সে ব্রতস্নাতক আর যে বিদ্যা ব্রত দুটোই শেষ করে বিখ্যাত হয় সে বিদ্যাব্রত স্নাতক। স্নাতক ব্যক্তি এবং রাজা সবার থেকে সম্মানিত হবে; কোথাও গেলে সবাই তাদের পথ ছেড়ে দেবে এবং রাজার নিকট থেকে স্নাতক ব্যক্তি বেশি সম্মান পাবে। গুরু অনুমতি দিলে সমাবর্তনের পরে বিধান অনুযায়ী ব্রতাঙ্গ স্নান শেষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য এই তিনটি জাতিবর্ণ নিজেদের বর্ণের নারী বিয়ে করতে পারবে।[৪৮]

---

[৪৩] "মাতুরগ্রেহধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে। তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ ॥" তদেব, পৃ. ১৫২।

[৪৪] "নাভিব্যাহারয়েদ্ ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদৃতে। শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্যাবদ্বেদে ন জায়তে ॥" তদেব, পৃ. ১৫৩।

[৪৫] "বৈবাহিকো বিধি স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ। পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোহগ্নিপরিক্রিয়া॥" তদেব, পৃ. ১০৪।

[৪৬] "অমন্ত্রিকা তু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ। সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমম্ ॥" তদেব, পৃ. ১০৩।

[৪৭] "তেষান্তু সমবেতানাং মান্যৌ স্নাতকপার্থিবৌ। রাজস্নাতকয়োশ্চৈব স্নাতকো নৃপমানভাক্ ॥" তদেব, পৃ. ১৩৯।

[৪৮] তদেব, পৃ. ১৮৯।

৩.১০ বিবাহ

দশবিধ সংস্কারের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হলো বিবাহ। এটা যৌবনের একমাত্র সংস্কার। চতুর্বর্ণ হোক বা সংকর জাতিবর্ণ সকলেরই এই সংস্কারে অধিকার রয়েছে।[৪৯] সমাজে বিবাহহীন কোনো সম্পর্ককে সামাজিক বলে স্বীকার করা হয় না। বিবাহকে একটি যজ্ঞের সাথে তুলনা করা হয়; যে ব্যক্তি বিবাহ করে গার্হস্থ্য কর্মে প্রবেশ করেনি, সে অযজ্ঞীয় বা যজ্ঞহীন হিসেবে নিন্দিত হয়। বিবাহ সংস্কারে শাস্ত্রীয় ও লৌকিক বিধির মিলন ঘটেছে। যেমন, বর-বধূর মঙ্গলসূত্র ধারণ, মালাবদল, গ্রন্থিবন্ধন ইত্যাদি প্রচলিত অত্যাবশ্যক আনুষঙ্গিক কর্মের উল্লেখ গৃহ্যসূত্রে না থাকলেও গৃহ্যসূত্রানুসারী প্রয়োগ পদ্ধতিতেও এসব লৌকিক রীতি গ্রহণ করা হয়।[৫০]

বিবাহ আট ধরনের; এগুলো হলো: ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। কিন্তু সব বিবাহ সব বর্ণের জন্য শাস্ত্রসম্মত সংস্কার নয়। ব্রাহ্মণদের জন্য ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব – এই ছয় ধরনের বিবাহ ধর্মসঙ্গত বলা হয়েছে। ক্ষত্রিয়দের জন্য আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ – এই চার ধরনের বিবাহ ধর্মসঙ্গত এবং বৈশ্যের জন্য আসুর, গান্ধর্ব ও পৈশাচ – এই তিন ধরনের বিবাহ ধর্মসঙ্গত।[৫১]

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য একাধিক বিবাহ করতে পারবে কিন্তু প্রথম বিবাহ নিজ বর্ণের মধ্যেই করতে হবে। শূদ্র শুধুমাত্র শূদ্রকেই বিবাহ করতে পারবে, বৈশ্য বৈশ্যকে ও শূদ্রকে বিবাহ করতে পারবে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কে, বৈশ্যকে ও শূদ্রাকে বিবাহ করতে পারবে, আর ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে, ক্ষত্রিয়কে, বৈশ্যকে ও শূদ্রকে – চারটি বর্ণের নারীকেই বিবাহ করতে পারবে।[৫২] শাস্ত্রে অনুলোম

---

[৪৯] অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., *ছান্দোগ-দশবিধ-সংস্কার বিধি* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০২), পৃ. ১২৩।

[৫০] তদেব, পৃ. ট।

[৫১] "চতুর্ণামপি বর্ণনাং প্রেত্য চেহ হিতাহিতান্। অষ্টাবিমান্ সমাসেন স্ত্রীবিবাহান্নিবোধত ॥ ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ। গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ ॥ যো যস্য ধর্ম্মো বর্ণস্য গুণদোষৌ চ যস্য যৌ। তদ্বঃ সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি প্রসবে চ গুণাগুণান্ ॥ ষড়ানুপূর্ব্বা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোহবরান্। বিট্‌শূদ্রয়োস্তু তানেব বিদ্যাদ্ধর্ম্ম্যানরাক্ষসাম্ ॥" *মনুসংহিতা*, ভরতচন্দ্র শিরোমণি অনূদিত, পৃ. ২০১।

[৫২] "শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা বিশঃ স্মৃতে। তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুঃ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥" তদেব, পৃ. ১৯৭।

বিবাহ অনুযায়ী ব্রাহ্মণ শূদ্র নারীকে বিবাহ করতে পারে কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ একেবারেই নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়া গৃহস্থ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের শূদ্র স্ত্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুৎসাহিত করা হয়েছে।[৫৩]

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রগুলো পুরুষতান্ত্রিক। এসব শাস্ত্র পুরুষদের অনুকূল এবং নারীদের জন্য যথেষ্ট প্রতিকূল। মনুসংহিতাও এর ব্যতিক্রম নয়।[৫৪] মনুসংহিতায় বিবাহ প্রসঙ্গে এমন কিছু আলোচনা রয়েছে, যা আধুনিক দৃষ্টিতে যে কোনো নারীর জন্যই অসম্মানজনক।[৫৫] আবার কোন নারীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা যাবে, আবার কোন নারীকে একেবারেই বিবাহ করা যাবে না – সংশ্লিষ্ট নারীর জন্য এসব বিধান খুবই অপমানজনক।[৫৬]

৩.১১ অশৌচ

মসুসংহিতায় বিভিন্ন ধরনের অশৌচের বর্ণনা রয়েছে। যেমন, জন্মজনিত অশৌচ, মরণজনিত অশৌচ, শবস্পর্শজনিত অশৌচ, গর্ভস্রাবাশৌচ প্রভৃতি। বালকের দাঁত গজালে, চূড়াকরণ হলে

---

[৫৩] "ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ। কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে ॥" তদেব, পৃ. ১৯৮।

[৫৪] "মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোহজাবিধনধান্যতঃ। স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্ ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারিশ্বিত্রিকুষ্ঠিকুলানি চ ॥ অর্থাৎ গরু, মেষ, ছাগল ও ধনধান্য দিয়ে সমৃদ্ধ মহাবংশ হলেও বিবাহের ক্ষেত্রে এই দশটি বংশ ত্যাগ করা উচিত। এগুলো হলো – জাতকর্ম থেকে শুরু করে অন্যান্য সংস্কারবিহীন, শুধুমাত্র কন্যাসন্তানের জনক, যাদের গায়ে প্রচুর লোম, অর্শ, রাজযক্ষা, মন্দাগ্নি, অপস্মার, শ্বিত্রি অথবা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত এইসব রোগে আক্রান্ত বংশে বিয়ে করা যাবে না। এসব পরিবারে বিবাহ করলে সন্তানও এসব রোগে আক্রান্ত হয়।" তদেব, পৃ. ১৯১-১৯২।

[৫৫] "নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগীণীম্। নাহলোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্ ॥ অর্থাৎ যে নারীর মাথার চুল, চোখ হলুদ আভাযুক্ত, যার ছয়টি আঙ্গুল বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেশি, যে চিরকাল অসুস্থ, যার শরীরে বেশি লোম বা যার একটুও লোম নেই, যে কটু কথা বলে এমন নারীকে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে।" তদেব, পৃ. ১৯৩।

[৫৬] "নর্ক্ষ বৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্ব্বতনামিকাম্। ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাম্ ॥ অর্থাৎ নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, ম্লেচ্ছ, পর্বত, পাখি, সাপ ও দাসের নামে যে সব নারীর নাম তাকে বিবাহ না করার পরামর্শ রয়েছে। কিন্তু যে নারী অঙ্গহীনা নয়, যার নাম অনেক সুখে উচ্চারণ করা যায়, হাঁস ও হাতির মতো মনোহর যার হাঁটার ধরন, যার লোম ও চুল মৃদুল, দাঁত ছোটো – এমন কোমলাঙ্গী নারীকে বিবাহ করতে হবে।" তদেব, পৃ. ১৯৪।

অথবা উপনয়ন হলে যদি ঐ বালকের মৃত্যু হয়, তাহলে তার পরিবার ও জ্ঞাতি সকলেই অশুচি হয় এবং জন্মালেও অশুচি হবে।[৫৭] জ্ঞাতির মরণে যেমন অশুচি হয় তেমনি সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হতে চাইলে জন্মেও একইভাবে অশৌচ পালন করতে হয়। সকল মরণ জনিত অশৌচে অস্পৃশ্যস্বরূপ অশৌচ সমান, কিন্তু জন্ম জনিত অশৌচে শুধু মাতা-পিতাই অস্পৃশ্য হন; এই অস্পৃশ্যত্ব অশৌচ মাতার দশ রাত হয়ে থাকে কিন্তু পিতা স্নান করলেই শুদ্ধ হন।

জ্ঞাতির মরণজনিত অথবা জন্মজনিত অশৌচে ব্রাহ্মণ দশ দিনে, ক্ষত্রিয় বারো দিনে, বৈশ্য পনেরো দিনে এবং শূদ্ররা একমাসে শুদ্ধ হয়।[৫৮]

৪. কৈবর্তের পালনীয় সংস্কার

সংস্কৃতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হলো সংস্কারসমূহের পরিবর্তন। সংস্কারের মাধ্যমেই বোঝা যায় কোনো জাতিবর্ণ জনজাতি থেকে জাতিবর্ণে পরিণত হয়েছে কিনা। কৈবর্ত জাতিবর্ণের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই নামকরণ, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি এই আচার-অনুষ্ঠানগুলো পালন করা হয়। কিন্তু হিন্দুধর্মে সংস্কারগুলো যেভাবে আছে কৈবর্তরা তা কখন থেকে গ্রহণ করলো? কৈবর্তদের সংস্কারের মধ্যে এই পরিবর্তনটা কিভাবে হয়েছে? – এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্য দিয়ে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া উপলব্ধি করা সহজ হতে পারে।

মাহিষ্য আন্দোলনের নেতারা মনে করেন, প্রাচীন ভারত প্রায় চারশো বছর বৌদ্ধ শাসনের অধীনে ছিলো; এ সময়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রথা, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, সমাজ-সংস্কৃতি প্রভৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে, মাহিষ্যরাও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে সচেতনভাবে চাষি কৈবর্ত তথা মাহিষ্য জাতিবর্ণের সংস্কারের পরিবর্তন শুরু হয়েছিলো ১৮৯১ সালের পর থেকে। এদিক থেকে জেলে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কার পরিবর্তন শুরু হয়েছে খুব সম্প্রতিক কালে।

---

[৫৭] "পিতৃপক্ষের ছয় পুরুষ পূর্ব এবং পুত্রাদি ছয় পুরুষ, পিণ্ডদাতা এরা সপিণ্ড, ঐ কুলের উত্তরপুরুষ যতদূর পর্যন্ত জানা যায় এসকল পুরুষকে সমনোদক বলে।"তদেব, পৃ. ৪২৬।

[৫৮] "শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ। বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥" *মনুসংহিতা*, ভরতচন্দ্র শিরোমণি অনূদিত (কলকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৮৯৮), পৃ. ৪৩৭।

কৈবর্ত জাতিবর্ণের প্রচলিত সংস্কার এবং পরিবর্তিত সংস্কার আলোচনার ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। সেটি হলো এই জাতিবর্ণের বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রচলিত সংস্কারগুলো নির্ভর করে সেই শাখা জাতিবর্ণটি নিজেদের কোন জাতিবর্ণ হিসেবে দাবি করে। আবার ভদ্রলোক শ্রেণি কৈবর্ত জাতিবর্ণকে কোন জাতিবর্ণের স্বীকৃতি দেয় সেটাও বিবেচ্য। কারণ জাতিবর্ণের তারতম্যের সাথে এসব দিক থেকে কৈবর্ত জাতিবর্ণকে নিয়ে তিনটি জাতিবর্ণের দাবি দেখা যায়।

১. ক্ষত্রিয়;

২. বৈশ্য; এবং

৩. শূদ্র।

মাহিষ্য আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মাহিষ্যকে খাঁটি ক্ষত্রিয় হিসেবে প্রমাণ করানোর প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সুনামগঞ্জ মাহিষ্য সমিতির সম্পাদক পেয়ারি মোহন দাসের একটি বইয়ে সামাজিক মর্যাদা ক্রমানুযায়ী হিন্দু জাতিবর্ণগুলোর শ্রেণিগত অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে। নিচে একটি তালিকার মাধ্যমে শ্রেণিগুলো প্রদর্শিত হলো –

সারণি ৪.১:
মাহিষ্য নেতৃবৃন্দের জাতিবর্ণগত বিন্যাসে মাহিষ্যদের অবস্থান

শ্রেণি	জাতিবর্ণের নাম
১.	ব্রাহ্মণ
২.	প্রাচীন যোদ্ধা জাতি : রাজপুত, খণ্ডাইত, মাহিষ্য, আগুরি অন্যান্য পেশাজীবী: বৈদ্য, কায়স্থ, করণ
৩.	নবশাখ: বাড়ুই, গন্ধবণিক, কলিতা, কামার, কাঁসারি, কুমার, কুড়ি, মধুনাপিত, মালাকার, ময়রা, নাপিত, সদপোগ, শাঁখারি, তামলি, তাঁতী, তেলি, তিলি, কাস্থা, পাতিয়াল।
৪.	গোয়ালা, শূদ্র, গোলাম, কোচ
৫.	সুবর্ণবণিক, যুগী, সূত্রধর, শুঁড়ি, সাহা, সূর্যবংশী, স্বর্ণকার, লোহাইত কুরি, নাথ।
৬.	বাগদি, চাষা-ধোপা, ধোপা, জালিয়া কৈবর্ত, কাওয়ালি, ঝালো, মালো, নমঃশূদ্র, পাটনি, পোদ, তিয়র, কাপালি, কোটাল, হাজং প্রভৃতি।

উৎস: Pyari Mohan Das, *The Mahishyas* (Kolkata: The Buckland Press, 1909), pp. 78-79.

মাহিষ্য নেতৃবৃন্দ নিজেদের ক্ষত্রিয় হিসেবে দাবি করলেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের লিখিত বইগুলোতে মাহিষ্যদের বৈশ্য বা শূদ্র হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এসব দাবির পেছনে থাকে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র থেকে প্রাপ্ত উক্তিসমূহ। জাতিতত্ত্ব নামক বইয়ে মাহিষ্য জাতিবর্ণকে বৈশ্য জাতিবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৯] একই বইয়ে কৈবর্ত জাতিবর্ণকে অন্ত্যজ বলা হয়েছে। এমনকি কৈবর্তদের পুরোহিতের সাথে যে ব্রাহ্মণ একই পঙ্‌ক্তিতে খাবার গ্রহণ করে তাদের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের নিয়ম করা হয়েছে।[৬০]

কৈবর্ত ও মাহিষ্য জাতিবর্ণ কোন বর্ণের এর বিবরণ পাওয়া যায় প্রকাশচন্দ্র সরকারের 'বৃহৎ মাহিষ্যকারিকা' বইয়ে। সেখানে বলা হয়েছে – ব্রহ্মার উরু থেকে উৎপন্ন বৈশ্যকে মাহিষ্য বলা যায়। লেখক এই উক্তিটি মনুসংহিতার থেকে পেয়েছেন বলে মনে করেন। লেখক 'মাহিষ্য প্রকাশ' গ্রন্থের বরাত দিয়ে বলেন, পৃথিবীতে কলিযুগ আরম্ভ হওয়ার আগে এদের গোপ নামে অভিহিত করা হতো। যদিও এর আগে মাহিষ্য সম্পর্কে এমন দাবি আর কোথাও পাওয়া যায়নি। প্রকাশচন্দ্র সরকার মনে করেন, বৌদ্ধ অবতারের পর কৃষিজীবী মাহিষ্যরা ক্ষত্রিয় বংশ ত্যাগ করে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলো।[৬১] এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ মাতৃধর্মাবলম্বী অর্থাৎ বৈশ্য জাতিবর্ণের আচার নিয়ম পালন করেন। এরা কৈবর্ত নামে অভিহিত।

স্থানভেদে কৈবর্ত ও মাহিষ্য জাতিবর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই তিন বর্ণের সংস্কার পালিত হতে দেখা যায়। ক্রমান্বয়ে কৈবর্ত জাতিবর্ণের মধ্যে প্রচলিত সংস্কারগুলো আলোচনা করা হলো।

৪.১ গার্ভসংস্কার

যজুর্বেদীয় বিধি অনুসারে গার্ভসংস্কার দিয়ে সংস্কারের শুরু হয়। বিবাহ হলো সব শেষের সংস্কার। কিন্তু বর্তমানে মাহিষ্য বা জেলে কৈবর্তদের গার্ভসংস্কারগুলো বার বার না করে বিবাহের সাথে একবারেই করা হয়ে থাকে। বিবাহের দুইটি অংশ, একটি রাত্রে অনুষ্ঠিত হয়, আর একটি ভোরে

---

[৫৯] শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি, *জাতিতত্ত্ব: বৈদ্য, যোগী, মাহিষ্য ও কায়স্থো* (কলকাতা: ভিক্টোরিয়া প্রেস, ১৯২৬), পৃ. ৪৪।

[৬০] তদেব, পৃ. ৮৮।

[৬১] প্রকাশচন্দ্র সরকার, বৃহৎ *মাহিষ্যকারিকা* (কলকাতা: ফিনিক্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯৩১), পৃ. ৩১-৩২।

বা সকালে অনুষ্ঠিত হয়, এটা বাসি বিবাহ হিসেবে পরিচিত। বাসি বিবাহের সাথেই পুরোহিতরা গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারগুলো করেন। সেগুলোতে সবসময়ে বেদ বা সংহিতার নিয়ম পুরোপুরি অনুসরণ করা হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গার্ভসংস্কারগুলো নামে মাত্র পালন করা হয়ে থাকে।

জাতকর্ম সংস্কারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সন্তান জন্মগ্রহণের পর সদ্যোজাত সন্তানের পিতার হাত দিয়েই নবজাতককে ঘি-মধু খাওয়ানোর নিয়ম থাকলেও কৈবর্ত বা মাহিষ্য সমাজে এই সংস্কারটি শাস্ত্রে বর্ণিত নিয়ম মেনে করানো হয় না। পিতার পরিবর্তে প্রসূতি মাতার নিকটবর্তী যেসব ব্যক্তি উপস্থিত থাকে, তারাই এ কাজটি করে থাকে। সাধারণত প্রসূতির মা বা বোন অথবা শাশুড়ি বা ননদ এ কাজটি করে। তবে এক্ষেত্রে কোনো মন্ত্র পাঠ করা হয় না।

বাংলাদেশের কৈবর্ত ও মাহিষ্যদের মধ্যে কোষ্ঠীবিচার করানোর প্রচলন নেই।[৬২] ধারণা করা হয়, যেসব জ্যোতিষাচার্য কোষ্ঠী তৈরি করতো তারা পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হয়েছে। খানিকটা সেই কারণে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক কারণে জেলে কৈবর্ত, মালো কৈবর্ত ও গুড়ি কৈবর্ত সমাজে কোষ্ঠীবিচারের প্রচলন নেই। পশ্চিমবঙ্গে অনেক মাহিষ্যদের মধ্যে কোষ্ঠীবিচার করানোর প্রচলন রয়েছে।[৬৩] বিবাহের সময়ে এই কোষ্ঠীর প্রয়োজন হয়। পাত্র-পাত্রীর কোষ্ঠী মিল করাকে বলা হয় যোটক বিচার। কলকাতায় প্রচুর জ্যোতিষী রয়েছে যারা এই পেশায় যুক্ত। আজকাল ইন্টারনেটেও কোষ্ঠী তৈরি করা যায়। তবে অধিকাংশ মানুষ যোটক বিচারের মাধ্যমে বিবাহ আয়োজনকে আজকাল আর গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, তাই এর চলও কৈবর্ত বা মাহিষ্য সমাজ থেকে উঠে গেছে।

৪.২ শৈশব সংস্কার

ছান্দোগ দশবিধ সংস্কার বিধি, মনুসংহিতা প্রভৃতি সবগুলো শাস্ত্রগ্রন্থেই এগারো বা বারোতম দিনে নামকরণ সংস্কার করার কথা বলা আছে। যজুর্বেদীয় দশবিধ সংস্কার বিধি অনুযায়ী দশদিন পার হলে বা একশো দিন পার হলে অথবা এক বছর পূর্ণ হলে নামকরণের বিধান রয়েছে। এই

[৬২] মোবাইলে গৃহীত সাক্ষাৎকার: বিনয় কুমার চক্রবর্তী (৬৫), অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও মাহিষ্য পুরোহিত, কচুয়া, আত্রাই, নওগাঁ। তারিখ: ২১.০৬.২০২০।

[৬৩] অনলাইন সাক্ষাৎকার: তিমির হালদার (৫০), সম্পাদক, বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি, ফুলবাগান, কলকাতা, তারিখ: ২০.০৬.২০২০।

সংস্কারেও বিবাহের মতো যজ্ঞ করার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এটি স্বতন্ত্র সংস্কার হিসেবে পালন করা হয় না। স্থানভেদে কোথাও সূর্য দেবতার অর্ঘ্য দেওয়ার সময়ে অথবা অন্নপ্রাশনের সময়ে এই সংস্কারটি করা হয়। শাস্ত্র অনুযায়ী ব্রাহ্মণ সন্তানের মঙ্গলবাচক নাম রাখার বিধান, যেমন – দ্বিজেন্দ্রনাথ, গিরিন্দ্রনাথ ইত্যাদি। অন্যদিকে শূদ্রদের দীনদাস, মুকুন্দদাস ইত্যাদি। কৈবর্তদের শেষোক্ত শ্রেণির বিবেচনায় তাদের নামের সঙ্গে দাস যুক্ত থাকার রীতি। কিন্তু বাস্তবে শাস্ত্রের এই নামকরণ বিধি কেউ অনুসরণ করে না, না ব্রাহ্মণ সমাজ, না শূদ্র বা কৈবর্ত সমাজ। তাই ব্রাহ্মণের নামের সঙ্গেও রামদাস পাওয়া যায়, আবার কৈবর্তের সঙ্গে দীননাথ পাওয়া যায়।[৬৪]

বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ স্থানে শিশুর নামকরণ অন্নপ্রাশনের সাথে করা হয়। বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের মাহিষ্যরা সপ্তম বা অষ্টম দিনে পুরোহিত ডেকে সূর্য দেবতার অর্ঘ্য দেওয়ার সাথে শিশুর নামকরণ করে থাকে। স্থানীয়ভাবে এই সংস্কারটিকে তারা 'সূর্যাগ্রি' দেওয়া বলে। এক্ষেত্রে অন্নপ্রাশন পরে করা হয়। ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে জন্মের পর থেকে জোড়া মাসে অর্থ ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এবং মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে সপ্তম বা নবম মাসে অন্নপ্রাশন সংস্কার করা হয়। সংস্কার মানেই সেখানে অবশ্যই হোম বা যজ্ঞ করতে হয়। আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারগুলো যজ্ঞের ব্যয়ভার বহন করতে পারে। এছাড়া আত্মীয়স্বজন নিয়ে উৎসবও পালন করে থাকে। কিন্তু আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারে অনেক সময়ে যজ্ঞের পরিবর্তে শুধু নারায়ণ-পূজা করা হয়। এরপর সাধারণত শিশুর মামা শিশুর মুখে অন্ন তুলে দেয়।

৪.৩ কৈশোর-সংস্কার

৪.৩.১ চূড়াকরণ

চূড়াকরণ সংস্কারটি আলাদাভাবে করার নিয়ম থাকলেও এটা এখন আর আলাদাভাবে করা হয় না। বিবাহের আগে ছেলের কর্ণভেদ সংস্কার করে অর্থাৎ একটি কান ফুটো করে তার মাথার সামান্য চুল ফেলে দেওয়া হয়। এটিও নামেমাত্র সংস্কার পালনের মতো।

---

[৬৪] নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার আমরুল কসবা গ্রামে গবেষক কর্তৃক আয়োজিত দলীয় আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য। তারিখ: ২৪.০৭.২০১৯। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকৃত ব্যক্তিদের নাম: ১. সুবালা দাস (৮০), ২. নন্দন কুমার দাস (৬৬), ৩. লক্ষ্মী রানী দাস (৫৫), ৪. আনন্দ কুমার দাস (৬০), ৫. বিভা রানী দাস (৫০), ৬. নিত্য দাস (৩৫), ৭. মিনু রানী দাস (২৮), ৮. নমিতা রানী দাস (৩১), ৯. সুশান্ত কুমার প্রামাণিক (৪৫), ১০. রেখা রানী প্রামাণিক (৩২)।

৪.৩.২ উপনয়ন

প্রাচীন জনজাতিগুলোর মধ্যে উপনয়ন সংস্কার ছিলো না। ব্রিটিশ আমলেও কোনো শ্রেণির কৈবর্তদের পৈতা গ্রহণ করতে দেখা যায় না। হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা দ্বিজ জাতিবর্ণ অর্থাৎ এরা উপনয়ন সংস্কারের অধিকারী। যেহেতু মাহিষ্য আন্দোলনের সময়ে চাষি কৈবর্ত জাতিবর্ণ নিজেদেরকে কখনো ক্ষত্রিয় আবার কখনো বৈশ্য পরিচয়ের দাবি জানিয়েছে, তাই এই দাবির ভিত্তিতে শাস্ত্র অনুযায়ী তাদের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার করার একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিলো।

আন্দোলনের সময়ে মাহিষ্যরা পৈতা ধারণ করবে কিনা এ নিয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমহলে মধ্যে দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। একটি পক্ষের মতে, সংস্কারের অভাবে মাহিষ্যরা ব্রাত্য হয়েছে তাই তারা পৈতা ধারণ করতে পারে না। আরেকটি পক্ষে ছিলেন পুরীর পণ্ডিতবর্গ, যাঁরা তাঁদের মত প্রকাশে একটু কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁদের মতে, উপনয়ন সংস্কারের অভাবেও মাহিষ্যরা ব্রাত্য হয়নি অর্থাৎ তারা শূদ্র হয়ে যায়নি।[৬৫] অর্থাৎ তাঁরা মাহিষ্যদের সরাসরি নাও করেননি, আবার পৈতা নিতেও বলেননি। তাই পৈতা ধারণ করবেন নাকি করবেন না এই সংস্কারটি নিয়ে মাহিষ্য নেতারা একটা দ্বিধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন।

দ্বিজ জাতিবর্ণ হওয়ার সুযোগ তৈরি হলেও বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে মাহিষ্যরা পৈতা গ্রহণ করেনি। মাহিষ্যদের সমসাময়িক বাংলায় কিছু জাতিবর্ণ পৈতা গ্রহণ করেছে আবার অনেকে করেনি। কায়স্থ জাতিবর্ণের উদাহরণ দিয়ে মাহিষ্য নেতারা বলেন, কায়স্থ জাতিবর্ণ পৈতা নেওয়া নিয়ে বড়ো হুলস্থুল বাধিয়েছিলো, কিন্তু বর্তমানে তাদের সে আন্দোলন শেষ হয়ে গেছে। যারা পৈতা নিয়েছে এবং যারা নেয়নি, তাদের মধ্যে বৈবাহিক এবং সামাজিক সম্পর্ক চালু আছে। সমাজে এ নিয়ে কোনো আপত্তিও নেই। তাঁরা আরও মনে করেন, সমাজে পৈতা এখন আর উচ্চতার মাপকাঠি নয়। গলায় পৈতা, মাথায় টিকি আর কপালে তিলক নয় বরং বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ ও চরিত্র – এগুলো সমাজে মানুষকে উচ্চস্থান এনে দিতে পারে।[৬৬] তাই পৈতা নেওয়ার জন্য বিচলিত হওয়ার তাঁদের কোনো প্রয়োজন নেই। পশ্চিমবঙ্গে মাহিষ্যদের মধ্যে অনেকেই দাবি করেন, তাঁদের উপনয়ন হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মাহিষ্য গবেষক ড. শিশুতোষ সামন্তের কথা। বাংলাদেশের একজন

---

[৬৫] গোপালচন্দ্র সরকার, *মাহিষ্য-নামোদ্ধারের ইতিবৃত্ত* (কলকাতা: বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি, ১৯৯৭), পৃ. ৬৯।

[৬৬] তদেব, ৭০।

মাহিষ্য পুরোহিত ৬৫ বছর আগে তার ছোটবেলায় একজন মাহিষ্যকে পৈতা ধারণ করতে দেখেছেন। উক্ত মাহিষ্যের বাড়ি ছিলো নওগাঁ জেলার রাণীনগর উপজেলায়, নাম কৃষ্ণসুন্দর জোয়ার্দার।[৬৭] এ রকম দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া কৈবর্তদের পৈতা নিতে দেখা যায় না। তাই বলা যায় উপনয়নের ক্ষেত্রে কৈবর্তদের সংস্কারে দৃশ্যমান কোনো পরিবর্তন হয়নি।

৪.৪ যৌবন-সংস্কার

৪.৪.১ বিবাহ

মনুসংহিতায় আট ধরনের বিবাহের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বিবাহগুলোর মধ্যে প্রাজাপত্য বিবাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। বর্তমানে হিন্দুসমাজের সকল জাতিবর্ণের মধ্যে প্রাজাপত্য বিবাহ প্রচলিত। কিন্তু শাস্ত্রে সমর্থিত বিভিন্ন রকম বিবাহের সবগুলোই আর্যসংস্কৃতির কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। এসব বিবাহের মধ্যে দুই একটি বিবাহের সঙ্গে বাংলার আদি জনজাতির বিবাহ প্রক্রিয়ার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে হয়তো হিন্দুশাস্ত্র এগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যেমন, আসুর বিবাহ। এ বিবাহে বরপক্ষ কনের বাবা-মা বা অভিভাবককে কনের উপযুক্ত পণ দিয়ে বিবাহ করে।[৬৮] সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগেও মাহিষ্যদের মধ্যে এ ধরনের বিবাহ দেওয়া হতো।[৬৯]

আসুর বিবাহ ছাড়াও জনজাতিগুলোর মধ্যে আর এক ধরনের বিবাহ প্রচলিত ছিলো যেখানে বিবাহের কন্যাকে বরের বাড়িতে নিয়ে আসা হতো, এরপর তাদের বিবাহ হতো। স্থানভেদে এর বিভিন্ন নাম ছিলো। বাংলার একাধিক জনজাতির মধ্যে এই বিবাহের চর্চা লক্ষ করার মতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গঞ্জু জনজাতির কথা।[৭০] প্রায় একই ধরনের এই বিবাহকে রাজশাহী

[৬৭] সাক্ষাৎকার: বিনয় কুমার চক্রবর্তী (৬৫), অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও মাহিষ্য পুরোহিত, কচুয়া, আত্রাই, নওগাঁ। তারিখ: ২১.০৬.২০২০।

[৬৮] "জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ। কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে ॥ *মনুসংহিতা*, ভরতচন্দ্র শিরোমণি অনূদিত, পৃ. ২০৫।

[৬৯] সাক্ষাৎকার: সুবালা দাস (৮৭), গৃহিণী, আমরুল কসবা, আত্রাই, নওগাঁ। তারিখ: নওগাঁ সদর, ০১.০৩.২০২০।

[৭০] হরেন্দ্রনাথ সিং, "গঞ্জু জাতিসত্তার আত্মপরিচয়," স্বরোচিষ সরকার সম্পা., *আদিবাসী জাতিসত্তার আত্মপরিচয়* (রাজশাহী: আইবিএস, ২০১৮), পৃ. ১১৬; চট্টগ্রামের বড়ুয়া সমাজেও এ ধরনের বিবাহ পদ্ধতি

অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে বলা হয় 'মেয়ে তুলে নিয়ে বিয়ে'। এই বিবাহে প্রাজাপত্য রীতিই অনুসরণ করা হয়, পার্থক্য শুধু বিবাহের স্থানে। যে বিবাহ কনের বাবার বাড়িতে হওয়ার কথা তা বরের বাড়ির পাশেই পরিচিত কারো বাড়িতে আয়োজন করা হয়। কন্যাপক্ষ কন্যাসহ কয়েকজনকে নিয়ে বিবাহের আগের দিন সেখানে উপস্থিত হন, পরের দিন বিবাহের পর সন্ধ্যায় বরের বাড়িতে নববধূর গৃহপ্রবেশ করানো হয়।

কৈবর্তদের মধ্যে এ ধরনের বিবাহের প্রচলন রয়েছে। কলকাতার জানবাজারের রানি রাসমণির বিবাহ এ পদ্ধতিতেই হয়েছিলো।[৭১] তবে এ বিবাহের চর্চা সাধারণত গ্রামে অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের মধ্যে দেখা যেত। বর্তমানে মাহিষ্য ও জেলে কৈবর্ত জাতিবর্ণের বিবাহ পুরোপুরি প্রাজাপত্য বিবাহে রূপ নিয়েছে।

বিবাহের পূর্বে বর ও কনের গায়েহলুদ বাঙালি সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অথচ এটি কোনো আর্যসংস্কৃতি নয়। বাংলার জনজাতি বা আদি অধিবাসীদের বিবাহ রীতিগুলোর মধ্যে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি রীতি। বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতে, কালক্রমে গায়েহলুদের প্রচলনটি জনজাতিদের মধ্যে থেকে হিন্দুসমাজে আত্তীকৃত হয়েছে। চাষি ও জেলে কৈবর্ত সমাজেও বিবাহে গায়েহলুদ দেওয়া হয়।

চাষি কৈবর্তরা সাধারণ শ্রেণির হিন্দু হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পূর্বে তাদের সঙ্গে জেলে কৈবর্তদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিলো। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ব্রিটিশ কর্মচারী হাটন-এর লেখায়।[৭২] তাঁর মতে, একই জাতিবর্ণ হওয়ার পরও হালিয়া কৈবর্তরা জালিয়া কৈবর্তদের পেশাকে ঘৃণা করতো। সময়ের সাথে সাথে হালিয়া কৈবর্তদের মধ্যে একটা চর্চা শুরু হলো। তারা নিজেদের মেয়েদের জালিয়া কৈবর্তদের সাথে বিবাহ দেওয়া সময়ে মোটা পণ দাবি করতো, কিন্তু নিজেরা জালিয়া কৈবর্ত মেয়েদের বিবাহ করতে অস্বীকার করতো। ক্রমে হেলে কৈবর্তরা জেলে কৈবর্তদের সঙ্গে আন্তঃবিবাহ পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। বিবাহ-সম্পর্ক বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে স্বতন্ত্র জাতিবর্ণ হিসেবে তাদের মাহিষ্য পরিচয় স্পষ্টতা পায়।[৭৩]

রয়েছে, যাকে বলা হয় 'নামন্ত বিবাহ'। স্বরোচিষ সরকার, *গিরিশচন্দ্র বড়ুয়া* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪) পৃ. ৯৯।

[৭১] শিশুতোষ সামন্ত, *রানী রাসমণির অন্তহীন জীবনবৃন্তে*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: সৌরজ্যোতি সামন্ত, ২০০৭), পৃ. ২৯।

[৭২] Yogesh Atal, *Building a Nation* (1981; New Delhi: Abhinav Publications, 2004), p. 118.

[৭৩] Ibid.

হাটনের উক্তির যথার্থতা এখনও পাওয়া যায়। সংস্কৃতায়িত হওয়ার পর থেকে কৈবর্তদের মধ্যে নিজ জাতিবর্ণের বাইরে বিবাহ হতো না। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জেলে কৈবর্তদের মধ্যে এখনও নিজ জাতিবর্ণের বাইরে অন্য জাতিবর্ণের সাথে বিবাহ হয় না। তবে সম্প্রতি কৈবর্তদের মধ্যে অন্যান্য জাতিবর্ণের সঙ্গে বিবাহের প্রবণতা লক্ষ করা যায়।[৭৪] অব্রাহ্মণ সৎশূদ্রাদি এমনকি ব্রাহ্মণ পরিবারেও কৈবর্তদের বিয়ে হচ্ছে। অবশ্য এক্ষেত্রে পূর্ব পরিচয়, পছন্দ, শিক্ষা, চাকরি প্রভৃতি প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। বিয়ের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনটা গ্রামের থেকে শহরেই বেশি হয়ে থাকে।

৪.৫ অশৌচ ও শ্রাদ্ধ

হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থে অশৌচ এবং শ্রাদ্ধ বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে বলা হয় পারলৌকিক ক্রিয়া। যজুর্বেদীয় দশবিধ সংস্কারে অশৌচ এবং শ্রাদ্ধ নেই। উপনয়ন বা অশৌচ পালন ছাড়া অন্যান্য সব সংস্কার সকল জাতিবর্ণের জন্য প্রায় একই রকম। তাই সময়ের সাথে সাথে অন্যান্য সংস্কার পালনের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণসহ সব জাতিবর্ণের সংস্কারে যে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, কৈবর্ত জাতিবর্ণের ক্ষেত্রেও সেই পরিবর্তনগুলো সাধিত হয়েছে। কিন্তু কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কার পালনের ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি পরিবর্তন হয়েছে অশৌচ পালনের ক্ষেত্রে আর এটা শুরু হয়েছিলো মাহিষ্য আন্দোলনের সময়ে।

চাষি কৈবর্ত বা মাহিষ্যরা যেমন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে প্রচলিত ছিলো ঠিক তেমনি তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অশৌচবিধিও প্রচলিত ছিলো। স্থানভেদে তাদের মধ্যে অশৌচকাল ১০ দিন, ১২ দিন, ১৫ দিন এবং ৩০ দিন প্রচলিত ছিলো। মাহিষ্য আন্দোলনের শুরুতে চাষি কৈবর্তদের অশৌচকালের বৈষম্য দূর করার জন্য তাজপুরের জমিদার নরহরি জানা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ব্যবস্থা প্রাপ্তির জন্য একটি সভা আহ্বান করেন। এভাবে দুই তিন বছর আরও কয়েকটি সভা করা হয়। সব সভাতেই পণ্ডিতরা চাষি কৈবর্তদের ১৫ দিন অশৌচ পালনকে শাস্ত্রানুমোদিত হিসেবে উল্লেখ করেন। সর্বশেষ সভায় পুরী মুক্তিমণ্ডপের প্রধান পণ্ডিত হরিহর রথ শাস্ত্রীও তাঁর ব্যবস্থাপত্রে চাষি কৈবর্তদের ১৫ দিনের জন্মজনিত ও মরণজনিত অশৌচকাল নির্দেশ করেন।

---

[৭৪] সাক্ষাৎকার: চাঁনসোনা দাস (৬০), ব্যবসায়ী, করের পাড়া, সিলেট, তারিখ: সিলেট, ২৩.০৫.২০১৯।

মেদিনীপুরের ক্ষেত্রমোহন বেরা পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মুক্তিমণ্ডপের পণ্ডিতদের দিয়ে চাষি কৈবর্তদের সংস্কার নির্ণয়ের জন্য একটি সভার আহ্বান করেছিলেন। সভাটিকে ৫৬ জন পণ্ডিতের স্বাক্ষরযুক্ত ব্যবস্থাপত্রে চাষি কৈবর্তদের বৈশ্যদের ন্যায় পনেরো দিনের অশৌচ পালনের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়। সেখানে শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, চাষি কৈবর্ত অনুলোমজাত। পণ্ডিতদের যুক্তি ছিলো, সমানবর্গের সন্তানেরাই কেবল সবর্ণ হতে পারে তাই ক্ষত্রিয় পিতার সন্তান হলেও ক্ষত্রিয়দের মতো নয় বরং বৈশ্য মাতার সন্তান হিসেবে বৈশ্যদের মতো সংস্কার পালন করাই বিধেয়।

পণ্ডিতদের এই মতের সাথে পার্থক্য দেখা যায় কাশীধামের দুই একজন পণ্ডিতের। তাদের মতে, ক্ষত্রিয় পিতার সন্তানেরা ক্ষত্রিয়দের মতো সংস্কারাদি পালন করবে, বৈশ্য মায়ের মতো নয়। ক্ষত্রিয়দের অশৌচকাল ১২ দিন, সুতরাং চাষি কৈবর্তরা ১২ দিনের অশৌচ পালন করবে। কাশীর ত্রিশূল নামক একটি পত্রিকায় এই মতের পক্ষে একটি লেখা প্রকাশ করা হয়। ফলে অশৌচ পালন নিয়ে চাষি কৈবর্ত সমাজে মতানৈক্য দেখা দেয়। চাষি কৈবর্ত সমাজে তখনও প্রথা অনুযায়ী ৩০ দিনের অশৌচকাল পালন করা হতো। তবে পণ্ডিতদের ব্যবস্থাপত্র পাওয়ার পর তাদের মধ্যে ১২ দিন অশৌচ পালনের সুযোগ তৈরি হয়ে যায়।

চাষি কৈবর্ত বা মাহিষ্যদের মধ্যে বর্তমানে ১২ দিনের অশৌচ পালন করতে দেখা গেলেও জেলে কৈবর্তদের মধ্যে এখনও তিন ধরনের অশৌচবিধি বিদ্যমান রয়েছে। এগুলো হলো ১২, ১৫ ও ৩০ দিনের অশৌচ।[৭৫] শিক্ষিত ও শহরে বসবাসকারী জেলে কৈবর্তরা ১২ দিন অশৌচ পালন করে। গ্রামে এবং যেসব পরিবারে বয়স্ক ব্যক্তি রয়েছে তারা এখনও ৩০ দিনের অশৌচ পালন করে থাকে।[৭৬]

মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর ‘চতুর্বর্ণে দশাচার’ বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কৈবর্ত জাতিবর্ণের মধ্যে অনেকে ১০ দিনের অশৌচ ও ১১ দিনে শ্রাদ্ধ করা যৌক্তিক বলে মনে করেন।[৭৭] কিন্তু বাস্তবে কোনো

[৭৫] সাক্ষাৎকার: শ্রীকান্ত দাস (৬৫), মুক্তিযোদ্ধা, শাল্লা, সুনামগঞ্জ, তারিখ: সিলেট, ২৫.০৫.২০১৯।

[৭৬] সিলেট শহরের হালদারপাড়ায় গবেষক কর্তৃক আয়োজিত দলীয় আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য। তারিখ: ২৩.০৫.২০১৯, দলীয় আলোচনায় যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের নাম: ১. পরেশ দাস (৭৭), ২. প্রেমতোষ দাস (৬২), ৩. রবীন্দ্র কুমার দাস (৭০), ৪. চাঁনসোনা দাস (৬০), ৫. শ্রীকান্ত দাস (৬৫), ৬. শিরীষ চন্দ্র দাস (৫৫)।

[৭৭] তদেব।

অঞ্চলের কৈবর্ত বা মাহিষ্যরা এই বাণী অনুসরণ করে না। এরা সাধারণত ১৩ দিনে শ্রাদ্ধ করে অর্থাৎ ক্ষত্রিয় রীতি মেনে ১২ দিনের অশৌচ পালন করে থাকে।

৬. অন্যান্য সংস্কার

সামবেদ ও যজুর্বেদে বর্ণিত দশবিধ সংস্কারের বাইরেও কৈবর্ত জাতিবর্ণের মধ্যে আরও কিছু সংস্কার প্রচলিত আছে। সময়ের সাথে এসব সংস্কার পরিবর্তিত হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমেও কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়ন অনেকটা বোঝা যাবে।

৬.১ অস্পৃশ্যতা

হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী কৈবর্তদের অস্পৃশ্য মনে করা হতো। একশো বছর আগেও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাদের হাতে খাবার তো দূরে থাক, জল পর্যন্ত গ্রহণ করতো না। কৈবর্তদের শিক্ষার অধিকার ছিলো না। বেদপাঠও তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিলো। লঞ্চে, ট্রেনে ব্রাহ্মণ বৈদ্য প্রভৃতি ভদ্রলোক শ্রেণির জন্য রিজার্ভ কেবিন থাকতো।[৭৮] কৈবর্তরা অন্যান্য পুরোহিত তো বটেই নিজেদের পুরোহিতদের বাড়িতে বা ঘরেও ঢুকতে পারতো না। কৈবর্ত নারীদের অবস্থা ছিলো আরও খারাপ। সব দিক থেকে তারা ছিলো উপেক্ষিত।

চাষি কৈবর্তরা মাহিষ্য হিসেবে সমাজে সাধারণ হিন্দু হিসেবে পরিচিত হলে হিন্দু সমাজে তাদের অবস্থান পরিবর্তিত হয়ে যায়। অস্পৃশ্য শূদ্র থেকে তারা স্পৃশ্য হয়। অর্থাৎ এভাবে তারা দ্বিতীয় পর্যায়ে সংস্কৃতায়িত হওয়ার সুযোগ পায়। তাদের এই নতুন সংস্কৃতায়ন তাদের এই ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য পরিচয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই কিছুদিন আগেও যারা নিজেরাই অস্পৃশ্য ছিলো, তারাই তখন জেলে কৈবর্ত ও অন্যান্য শূদ্রদের অস্পৃশ্য জ্ঞান করতে থাকে। ক্রমে তাদের সংস্কার এবং আচরণে ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈশিষ্ট্য প্রবেশ করতে শুরু করে, যা ক্রমবর্ধমান। তাদের কাছে মৎস্যজীবী কৈবর্তরা এখনও অস্পৃশ্য।[৭৯] এর মূল কারণ তারা চাষি কৈবর্তদের মতো পরিচয় বদল করতে ব্যর্থ হয়েছে, সংস্কৃতায়নের দৌড়ে তারা পিছিয়ে পড়েছে।

---

[৭৮] সাক্ষাৎকার: সুব্রত কুমার চক্রবর্তী (৬৩), মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, সিলেট ইউনিট, পুরান সিলেট, তারিখ: সিলেট, ২৫.০৫.২০১৯।

[৭৯] সাক্ষাৎকার: পরেশ দাস (৭৭), সাবেক ইঞ্জিনিয়ার, পিডব্লিউডি, করের পাড়া, সিলেট, তারিখ: ২৩.০৫.২০১৯।

চট্টগ্রামের সাধারণ হিন্দুরা এখনও জেলে কৈবর্তদের অস্পৃশ্য মনে করে। যদিও ধীরে ধীরে এই প্রবণতা কমতে শুরু করেছে। তিরিশ বছর আগেও সাধারণ হিন্দুরা জেলে কৈবর্তদের হিন্দু বলেই মনে করতো না। কখনও বিশেষ কারণে খেতে দিলে কলার পাতায় খেতে দেওয়া হতো। গ্লাসে জল খেতে দিলে সেটা ফেলে দেওয়া হতো। যদি ফেলে দেওয়া সম্ভব না হতো সেক্ষেত্রে বাম হাতের দুটো আঙুল দিয়ে ধরে সাথে সাথে কলতলা বা বাড়ির বাইরে কোথাও পরিষ্কার করে সেটাতে তুলসী জল ছিটিয়ে নিতো।[৮০]

সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে এই অস্পৃশ্যতা নতুন মাত্রা পায়। পূর্বে সাধারণ হিন্দুরা চাষি কৈবর্তের সঙ্গে যে আচরণ করতো, সংস্কৃতায়িত হয়ে চাষি কৈবর্ত শুধু মাহিষ্য নামই গ্রহণ করে, তাই নয়; সঙ্গে সঙ্গে সে জেলে কৈবর্তকে প্রায় অভিন্ন কায়দায় অস্পৃশ্য মনে করতে শুরু করে। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সব জায়গাতেই এই ধরনের অস্পৃশ্যতা এখনো বলবৎ। ফলে বিষয়টা এমন দাঁড়িয়েছে যে, 'যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ'। হয়তো এ কারণেই বাংলার অসংখ্য জাতিবর্ণ নিজেদের পরিচয়ের জন্য, মর্যাদার জন্য লড়াই করেছিলো। অন্যদের কাছে অস্পৃশ্য না হয়ে নিজেরা যাতে অন্যদের অস্পৃশ্য মনে করতে পারে, সেই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলো। জাতিবর্ণের নাম পরিবর্তন বা পদবি পরিবর্তনের প্রচেষ্টার মধ্যে সেই প্রবণতাই খুঁজে পাওয়া যায়।[৮১]

প্রসঙ্গত রাজশাহী অঞ্চলের একটি উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। প্রায় একশো বছর আগে নওগাঁ জেলার বদলগাছিতে একটি শূদ্র পাড়া ছিলো, তারা ব্রাহ্মণদের অস্পৃশ্যতার হাত থেকে বাঁচার জন্য সেখানকার সবাই মৈত্র পদবি গ্রহণ করে।[৮২] ফলে শূদ্র পাড়াটি রাতারাতি মৈত্র পাড়া হয়ে যায়। এরা এখন নিজেদের কাশ্যপ গোত্রের ব্রাহ্মণ দাবি করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময়ে জেলে কৈবর্তদের মতো বহু জাতিবর্ণ শরণার্থী শিবিরে অর্থাৎ ভারতে গিয়ে নিজেদের জাতিবর্ণ ও পদবি বদল করেছে। পরে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিবাহের মধ্য দিয়ে তারা পুরোপুরি ব্রাহ্মণ হয়ে গেছে। এমনকি বলা হয় থাকে, সংস্কার পালনের ক্ষেত্রে তারা প্রকৃত ব্রাহ্মণদের থেকেও বেশি কঠোর। অস্পৃশ্যতা এভাবে তাদের সংস্কৃতায়িত হতে বাধ্য করেছে, বলা যায়।

[৮০] সাক্ষাৎকার: হরিশংকর জলদাস (৬৭), অধ্যাপক ও কথাসাহিত্যিক, ডিসি হিল আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম, তারিখ: চট্টগ্রাম, ১২.০৮.২০১৯।

[৮১] তদেব।

[৮২] সাক্ষাৎকার: অরুণ চক্রবর্তী (৭০), সাবেক রাজনীতিবিদ, বদলগাছী, নওগাঁ, তারিখ: ২১.০৭.২০১৯।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকেই অস্পৃশ্যতার কারণ হিসেবে শাস্ত্রকে নয়, কৈবর্তদের জীবিকার উপর দোষারোপ করে। তারা মনে করে, মৎস্যপেশার সঙ্গে যুক্ত কৈবর্তরা শিক্ষা আর সচেতনতার অভাবে অপরিচ্ছন্ন জীবন-যাপন করতো। জীবনের কঠিন বাস্তবতায় তারা ছিলো পর্যুদস্ত। তাই হয়তো তাদের অস্পৃশ্য মনে করা হতো।[৮৩] বাস্তবতাবিমুখ এই ধরনের যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল আর অসার। ব্রাহ্মণ বা তথাকথিত উচ্চবর্ণের মধ্যে যারা এমন যুক্তি দিয়ে অস্পৃশ্যতা বিরুদ্ধে কথা বলে, সেটাকে লোক দেখানো বলে মনে হয়। কারণ কৈবর্ত বা শূদ্ররা যতোই যোগ্যতাসম্পন্ন হোক না কেন, তাদের সাথে ব্রাহ্মণরা কখনোই নিজেদের সন্তান-সন্ততির বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী থাকে না।[৮৪]

অস্পৃশ্যতা সংস্কারের পালনের ক্ষেত্রে কৈবর্তদের মধ্যে সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। তাদের সংস্কারে ব্যাপক হারে পরিবর্তন ঘটেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে। আরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে নব্বইয়ের দশকে এসে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কৈবর্ত জাতিবর্ণের লোকজন অস্পৃশ্যতাকে সংস্কার নয় কুসংস্কার মনে করে।[৮৫] অবশ্য মনোভাবের এই ইতিবাচক পরিবর্তন গ্রামের তুলনায় শহরাঞ্চলে বেশি লক্ষ করা যায়।

৬.২ খাদ্যাভাস

অন্যান্য বাঙালি জাতিবর্ণগুলোর খাদ্যাভাসের সাথে কৈবর্ত জাতিবর্ণের খাদ্যাভাসের কোনো অমিল নেই। কিন্তু তারপরও চাষি কৈবর্তরা যখন মাহিষ্য আন্দোলন করলো, তখন তাদের হিন্দুত্বের প্রমাণ দিতে হয়েছিলো। এমনকি খাদ্যাভাসের বর্ণনাও দিতে হয়েছিলো। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের কাছ থেকে তারা যে ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করেছিলো আদমশুমারি কর্তৃপক্ষকে

---

[৮৩] সাক্ষাৎকার: শরদিন্দু ভট্টাচার্য (৪৮), অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, তারিখ: ২৪.০৫.২০১৯।

[৮৪] সাক্ষাৎকার: হরিশংকর জলদাস (৬৭), অধ্যাপক ও কথাসাহিত্যিক, ডিসি হিল আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম। তারিখ: চট্টগ্রাম, ১২.০৮.২০১৯।

[৮৫] গবেষক কর্তৃক আয়োজিত ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (দলীয় আলোচনা) থেকে প্রাপ্ত তথ্য। তারিখ: ২৩.০৫.২০১৯। স্থান: সিলেট শহরের হালদারপাড়া। উপস্থিত ছিলেন: ১. পরেশ দাস (৭৭), ২. প্রেমতোষ দাস (৬২), ৩. রবীন্দ্র কুমার দাস (৭০), ৪. চাঁনসোনা দাস (৬০), ৫. শ্রীকান্ত দাস (৬৫), ৬. শিরীষ চন্দ্র দাস (৫৫)।

দেওয়ার জন্য, সেখানে শাস্ত্রের উদাহরণ দিয়ে লিখিয়ে নিতে হয়েছিলো যে, যেসব আদিম জাতি গোমাংস ভক্ষণ করে, চাষি কৈবর্তরা তাদের মধ্যে পড়ে না।[৮৬]

শুধু তাই নয় চাষি কৈবর্ত নারীদের দেখাতে হয়েছিলো যে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নারীরা যেসব সংস্কার পালন করে, তারাও সেসব পালন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিধবারা নিরামিষ আহার করে, মাছ-মাংস, মসুর ডাল, আমিষের হাঁড়ি-পাতিলে রান্না করা খাবার গ্রহণ করে না, একাদশী পালন করে প্রভৃতি।[৮৭] এভাবে বিভিন্ন সংস্কারের মধ্য দিয়ে তারা তাদের দাবির পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে। এ সময়ে মাহিষ্যদের বেশ কিছু পত্রিকাও সংস্কার প্রতিপালন ও পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো।

মাহিষ্য ও জেলে কৈবর্ত জাতিবর্ণের খাদ্যাভাস এখন বাঙালি হিন্দু সমাজের অন্যান্য জাতিবর্ণের অনুরূপ। তাই সংস্কৃতায়নের পাশাপাশি তাদের খাদ্যাভ্যাসেও বিশ্বায়নের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। তথ্য-প্রযুক্তির কল্যাণে পুরো বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপাদেয় সব খাবার এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। তাই অনেকে যেমন নিরামিষ খাবার খাচ্ছেন, আবার অনেকে বিদেশি খাবারও খাচ্ছেন। থাই, চায়নিজ, আমেরিকান, ফ্রেন্স প্রভৃতি দেশের অনেক রকম খাবার এখন সহজেই পাওয়া যায়। বার্গার, পিৎজা, ফ্রেন্স ফ্রাই, নুডুলস প্রভৃতি বর্তমানে অত্যন্ত জনপ্রিয় খাদ্যের ধরন। উচ্চবিত্ত কৈবর্তদের মাসে একদিন রেস্টুরেন্টে খাবার খাওয়ার বিষয়টি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। অবশ্য এই পরিবর্তন অন্য যে কোনো বাঙালি জাতিবর্ণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৬.৩ ধর্ম-সংস্কার

রাজশাহী অঞ্চলে কৈবর্ত জাতিবর্ণের মধ্যে বৈষ্ণবদের প্রভাব বেশি। অতীতে সিলেটেও কৈবর্তদের মধ্যে বৈষ্ণবপ্রভাব বেশি ছিলো।[৮৮] এখনও সিলেটের বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর আখড়া রয়েছে, যেখান থেকে কৈবর্তরা দীক্ষা গ্রহণ করে। হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে বিতলং নামে সুবিশাল একটি আখড়া রয়েছে।

---

[৮৬] গোপালচন্দ্র সরকার, *মাহিষ্য-নামোদ্ধারের ইতিবৃত্ত* (কলকাতা: বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি, ১৯৯৭), পৃ. ৭৫-৭৮।

[৮৭] সাক্ষাৎকার: বেবী রায় (৫৯), গৃহিণী, নলদীঘি, রাণীনগর, নওগাঁ, তারিখ: নওগাঁ, ২৩.০৭.২০১৯।

[৮৮] সাক্ষাৎকার: রবীন্দ্র কুমার দাস (৭০), সাবেক ইঞ্জিনিয়ার, পানি উন্নয়ন বোর্ড, হালদার পাড়া, সিলেট, তারিখ: ২৩.০৫.২০১৯।

বাংলাদেশে অধিকাংশ কৈবর্তদের গলায় তুলসীর মালা দেখা যায়। তাদের বিশ্বাস, এটা গলায় থাকতে মৃত্যু হলে মৃত্যুর পর তারা স্বর্গবাসী হবে। বর্তমানে কৈবর্তদের বিভিন্ন গুরুর আদর্শ অনুসারীদের নিকট থেকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে দেখা যায়। এদের মধ্যে সৎসঙ্গ, রামকৃষ্ণ মিশন অন্যতম।[৮৯] এছাড়া সম্প্রতি আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইস্‌কনের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়।[৯০] কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে ইসকনের জেলে কৈবর্ত পুরোহিতরাই কৈবর্তদের ইসকন মতের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিয়ে থাকে। যদিও এসব অঞ্চলের ব্রাহ্মণ জাতিবর্ণের লোকেরা সাধারণত ইসকনের ঘোর বিরোধিতা করে।[৯১]

সম্প্রতি বিভিন্ন স্থানে হরিনাম-সংকীর্তন বা নামযজ্ঞের ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এসব অনুষ্ঠান সাধারণত রাধাকৃষ্ণের মন্দির বা গোবিন্দ মন্দিরের সামনে আয়োজিত হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানের সময়ে মন্দিরে যে পূজার আয়োজন করা হয়, বৈষ্ণব মত অনুযায়ী তাতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। বৈষ্ণব ভক্তরাই এখানে পূজার নৈবেদ্য সাজাতে পারে।

নামযজ্ঞ ছাড়া কৈবর্তদের আয়োজিত অন্য সব পূজায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। যেমন – দুর্গাপূজা, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, শিবপূজা প্রভৃতি। উনিশ-বিশ শতকে জেলে কৈবর্ত সমাজে শুধু মনসা পূজার প্রচলন ছিলো। বিশ শতকের শেষ দিক থেকে কালীপূজা, দুর্গাপূজা এবং আরও পরে সরস্বতী প্রভৃতি পূজার প্রচলন শুরু হয়েছে।

লৌকিক পূজার ক্ষেত্রেও পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। এসব পূজা সাধারণত ব্রত নামে পরিচিত। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে কৈবর্ত নারীরা এসব ব্রত পালন করে থাকে। এসব ব্রতের মধ্যে মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত, বিপদ-নাশিনীর ব্রত, ষষ্ঠী দেবীর ব্রত উল্লেখযোগ্য। লৌকিক পূজাগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য এতে পাঁচালি পাঠ করা হয়। কৈবর্ত নারীরা লক্ষ্মীপূর্ণিমা ছাড়াও প্রতি বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজা করে এবং এ উপলক্ষে পাঁচালি পাঠ করে।

---

[৮৯] তদেব।

[৯০] সাক্ষাৎকার: প্রেমতোষ দাস (৬২), সাবেক সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএডিসি, ঢাকা, ঠিকানা: সৌদামিনী কুটির, ১০৬, মোহনা বি, করেরপাড়া, সিলেট, তারিখ: সিলেট, ২৪.০৫.২০১৯।

[৯১] গবেষক কর্তৃক আয়োজিত দলীয় আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য। তারিখ: ২৮.০৫.২০১৯, স্থান: হরিণবেড় গ্রাম, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকৃত ব্যক্তিদের নাম: ১. রমাকান্ত দাস (১০১), ২. হেমন্ত চন্দ্র দাস (৭০), ৩. গিরিশ চন্দ্র দাস (৭২), ৪. হীরালাল দাস (৭৫), ৫. নিত্য দাস (৪২), ৬. ছন্দ কুমার দাস (৩০), ৭. নগেন্দ্র চন্দ্র দাস (৭৫), ৮. উত্তম কুমার দাস (৪৮), ৯. রতন কুমার দাস (৩৫), ১০. অনিমেষ চন্দ্র দাস (৩৭)।

৬.৪ কৈবর্ত পুরোহিত

মাহিষ্য ও জেলে কৈবর্তদের পুরোহিত হলো চক্রবর্তী পদবির ব্রাহ্মণ।[৯২] ব্রাহ্মণদের মধ্যে যারা পৌরোহিত্য করে না কিংবা কায়স্থ/ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্য করে, তাদের মতে কৈবর্তদের পুরোহিত আলাদা, তারা অন্য কোনো জাতিবর্ণের যজমানি করে না, এবং যারা কৈবর্তদের যজমানি করে ব্রাহ্মণ সমাজে তাদের স্থান নিচে। বছরের পর বছর এই ধারণা চলে এসেছে।

কৈবর্ত জাতিবর্ণের প্রবীণ ব্যক্তিদের মতে, কৈবর্তরা মূলত শূদ্র এবং এরা বাংলার আদি বাসিন্দা। অন্যদিকে সাধারণ শ্রেণির ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যরা হলো বহিরাগত। কায়স্থ ও বৈদ্যরাও শূদ্র। তবে স্থানীয় শূদ্রদের থেকে জাতিগতভাবে তারা আলাদা, তাই তাদের ব্রাহ্মণও আলাদা। একই কারণে কায়স্থ-বৈদ্যদের পুরোহিতরা কৈবর্তদের পৌরোহিত্য করে না। সমাজে কৈবর্ত পুরোহিতদের তারা পতিত ব্রাহ্মণ মনে করে।[৯৩]

রাজশাহী অঞ্চলে চক্রবর্তী পদবি ব্যতীত অন্য পদবির ব্রাহ্মণ এবং বরেন্দ্র শ্রেণির ব্রাহ্মণ সাধারণত কৈবর্তদের পৌরোহিত্য করে না। কৈবর্ত জাতিবর্ণ সম্পর্কে এবং তাদের পুরোহিতদের সম্পর্কেও উল্লিখিত ব্রাহ্মণরা বহু ধরনের আপত্তিকর মন্তব্য করে। যেমন, নওগাঁ অঞ্চলের একজন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ধারণা, মাহিষ্যরা অতীতে জেলে ছিলো কিন্তু যখন দেখলো মাছ ধরা সমাজে নিন্দনীয় কাজ, তখন এরা পূর্বপুরুষের পেশা বাদ দিয়ে হাল চাষ করতে শুরু করলো। তার বক্তব্য অনুযায়ী, কৈবর্তদের পুরোহিতরা খুব নিম্নমানের ব্রাহ্মণ, যাদের মূল পেশা শূকর চরানো।[৯৪] কৈবর্ত জাতিবর্ণ সম্পর্কে এমন ধারণা বল্লাল সেনের 'ভ্রান্তি বিজয়' বইয়ের মাধ্যমে সংক্রামিত হওয়া সম্ভব। বইটি যারা পড়েনি তারাও হয়তো বংশানুক্রমিক স্মৃতিতে মূল কাহিনিকে ধরে রাখে এবং নিজেদের মতো তাতে রং চড়িয়ে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। মানবঘৃণা এভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

বর্তমানে চক্রবর্তী পদবিধারী ব্রাহ্মণ যেমন কৈবর্তদের পাশাপাশি অন্যান্য জাতিবর্ণের পৌরোহিত্য করে, পাশাপাশি কিছু কিছু এলাকায় ভট্টাচার্য ও বন্দ্যোপাধ্যায় পদবিধারী ব্রাহ্মণরাও কৈবর্তদের পৌরোহিত্য করে থাকে। এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে কৈবর্তদের অর্থ ও প্রভাব-

---

[৯২] সাক্ষাৎকার: পরেশ দাস (৭৭), সাবেক ইঞ্জিনিয়ার, পিডব্লিউডি, করের পাড়া, সিলেট, তারিখ: ২৩.০৫.২০১৯।

[৯৩] তদেব।

[৯৪] সাক্ষাৎকার: অরুণ চক্রবর্তী (৭০), সাবেক রাজনীতিবিদ, বদলগাছী, নওগাঁ, তারিখ: ২১.০৭.২০১৯।

প্রতিপত্তি।[৯৫] সিলেটে কৈবর্ত ছাড়াও মৎস্যজীবী নমঃশূদ্র জাতিবর্ণ রয়েছে, তাদের ব্রাহ্মণও আলাদা। নমঃশূদ্রের পুরোহিত এই ব্রাহ্মণদের পদবি শর্মা।[৯৬]

পুরোহিতদের যজমানদের বাড়িতে খাদ্যগ্রহণের বিষয়টি একেক এলাকায় একেক রকম। মাহিষ্য জাতিবর্ণের পুরোহিত বা জেলে কৈবর্তদের পুরোহিতরা অতীতে এদের বাড়িতে খাদ্য গ্রহণ করতো না। কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে পুরোহিতরা জেলে কৈবর্তদের বাড়িতে এখনও কোনো খাদ্য গ্রহণ করে না।[৯৭] বরেন্দ্র অঞ্চলেও একই ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। এলাকাভেদে কিছু কিছু পুরোহিত ব্রাহ্মণ মাহিষ্য যজমানদের বাড়িতে সরাসরি ভাত না খেলেও লুচি, মিষ্টি, চিড়া, মুড়ি, দই-দুধ, বিভিন্ন রকম ফল গ্রহণ করে এবং চা পান করে। আবার অনেক পুরোহিত ব্রাহ্মণ প্রভাবশালী মাহিষ্য জাতিবর্ণের বাড়িতে অন্নও গ্রহণ করে থাকে। সিলেট অঞ্চলে পুরোহিত ব্রাহ্মণরা উভয় ধরনের কৈবর্তদের হাতে চা-জল পান করে এবং কৈবর্তরাও তাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণদের বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে।[৯৮]

৭. উপসংহার

সংস্কার হলো হিন্দুদের অবশ্য পালনীয় ধর্মসংস্কার। একটি জাতিবর্ণের পরিচয় দাবি করার পর সেই জাতিবর্ণটির সংস্কার গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় জাতিবর্ণটি সংস্কৃতায়িত হয়েছে কিনা। কৈবর্ত জাতিবর্ণের প্রচলিত সংস্কারগুলোর মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনগুলো সচেতনভাবে শুরু হয়েছিলো প্রায় দুইশো বছর আগে চাষি কৈবর্ত জাতিবর্ণের মাহিষ্য আন্দোলনের

---

[৯৫] সাক্ষাৎকার: বিধান চন্দ্র চক্রবর্তী (৫৭), কৈবর্ত পুরোহিত ও হোমিও চিকিৎসক, হালদার পাড়া, সিলেট, তারিখ: ২৩.০৫.২০১৯।

[৯৬] সাক্ষাৎকার: সুব্রত কুমার চক্রবর্তী (৬৩), মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, সিলেট ইউনিট, পুরান সিলেট, তারিখ: সিলেট, ২৫.০৫.২০১৯।

[৯৭] গবেষক কর্তৃক আয়োজিত দলীয় আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য। তারিখ: ২৮.০৫.২০১৯, স্থান: হরিণবেড় গ্রাম, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকৃত ব্যক্তিদের নাম: ১. রমাকান্ত দাস (১০১), ২. হেমন্ত চন্দ্র দাস (৭০), ৩. গিরিশ চন্দ্র দাস (৭২), ৪. হীরালাল দাস (৭৫), ৫. নিত্য দাস (৪২), ৬. ছন্দ কুমার দাস (৩০), ৭. নগেন্দ্র চন্দ্র দাস (৭৫), ৮. উত্তম কুমার দাস (৪৮), ৯. রতন কুমার দাস (৩৫), ১০. অনিমেষ চন্দ্র দাস (৩৭)।

[৯৮] সাক্ষাৎকার: বিধান চন্দ্র চক্রবর্তী (৫৭), কৈবর্ত পুরোহিত ও হোমিও চিকিৎসক, হালদার পাড়া, সিলেট, তারিখ: ২৩.০৫.২০১৯।

মাধ্যমে। জাতিবর্ণগুলোর সংস্কারের বৈচিত্র্য সবথেকে বেশি দেখা যায় উপনয়ন গ্রহণ আর অশৌচ পালনে। জেলে কৈবর্তদের সংস্কার পালনে পরিবর্তন শুরু হয়েছে খুব সম্প্রতি। তবে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বাংলাদেশে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কারগুলোতে বেশি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে। উনিশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের শুরুতে সংস্কার পরিবর্তনে সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে আত্তীকরণ ও পাশ্চাত্যীকরণও সক্রিয় থাকে, যেখানে শিক্ষা ও অর্থের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাজ করে প্রভাবক হিসেবে।

পঞ্চম অধ্যায়

কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়ন: সামাজিক জঙ্গমতা প্রসঙ্গ

১. ভূমিকা

সামাজিক জঙ্গমতা বলতে একটি সমাজে কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর সামাজিক স্তরগত পরিবর্তনকে বোঝায়।[১] অর্থাৎ সমাজের মধ্যে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সমাজে বর্তমান বা প্রচলিত অবস্থান থেকে তার সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তনই হলো সামাজিক জঙ্গমতা।[২] এই অধ্যায়ে জাতিবর্ণগত পরিবর্তন, পেশা-বৃত্তিগত পরিবর্তন, স্থানান্তর, ধর্মবিশ্বাসগত পরিবর্তন প্রভৃতি বিবেচনার মধ্য দিয়ে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামাজিক জঙ্গমতাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সামাজিক জঙ্গমতা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। একই সামাজিক স্তরে আয়, জীবনযাত্রার মান, মর্যাদা, পেশাগত অবস্থান, শিক্ষাগত সুবিধা প্রভৃতির মধ্যে যখন পরিবর্তন ঘটে তখন সেটা অনুভূমিক জঙ্গমতা তৈরি করে। অন্যভাবে বলা যায়, যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো আন্দোলন, স্থানান্তর বা সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ ঘটে তখন সেটাকে অনুভূমিক জঙ্গমতা বলে।[৩] উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কৈবর্ত জাতিবর্ণের বর্ণহিন্দুতে রূপান্তর। উল্লম্ব জঙ্গমতা ঘটে যখন একটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের স্তরগত পরিবর্তন ঘটে যা ঊর্ধ্বগামী বা নিম্নগামী হতে পারে। অর্থাৎ সামাজিক জঙ্গমতা যেমন ঊর্ধ্বগামী হতে পারে আবার তেমনি নিম্নগামীও হতে পারে।[৪] যেমন চাষি কৈবর্ত বা মাহিষ্যদের ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য সংস্কার গ্রহণ ঊর্ধ্বগামী সামাজিক জঙ্গমতার উদাহরণ। জঙ্গমতা সমাজের অভ্যন্তরে হতে পারে, অন্য সমাজের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কেও হতে পারে।

---

[১] Nicholas Abercrombie et al., *Dictionary of Sociology* (England: Penguin Books, 1994), p. 386.

[২] Pitirim A. Sorokin, *Social and Cultural Mobility* (Illinois: The Free Press of Glencoe, 1959), p. 3.

[৩] Vinod Kumar Baidya, "Social Mobility in Scheduled Castes: A Sociological Study in Ballia Districts (U.P)" (PhD Dissertation, Mahatma Gandhi Kashi Vidhyapeet, Varanasi, 1999), p. 141.

[৪] Melvin M. Tumin, *Social Stratification: The Forms Functions and Inequality* (New Delhi: The Prentice Hall of India, 1994), p. 132.

২. কৈবর্ত জাতিবর্ণের জঙ্গমতা

সংস্কৃতায়নের প্রভাবে কৈবর্ত সমাজে নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের কারণে সামাজিক জঙ্গমতার সৃষ্টি হয়েছে। কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামাজিক জঙ্গমতাকে জাতিবর্ণগত পরিবর্তন, পেশা-বৃত্তি পরিবর্তন, স্থানান্তরগত পরিবর্তন, ধর্মাবিশ্বাসগত পরিবর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায়।

২.১ জাতিবর্ণগত পরিবর্তন

উনিশ শতকের শেষভাগে এবং বিশ শতকের প্রথমভাগে জাতিবর্ণের প্রভাব উপমহাদেশের রাজনীতিতে নতুনভাবে তাৎপর্য লাভ করে। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও ক্ষমতা সবসময়ই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো। বাংলার আদি জনজাতিগুলো যারা তথাকথিত নিম্নবর্ণ হিসেবে পরিচিত তারা এবং মুসলমানরা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বাইরে ছিলো। এর ফলে তারা ক্ষমতা থেকে দূরে ছিলো।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই তিন জাতিবর্ণই ছিলো 'ভদ্রলোক' শ্রেণির। এর বাইরে কেউই ভদ্রলোক নয়। অন্য কোনো জাতিবর্ণের মানুষ অনেক ধন-সম্পত্তি অর্জন করলে 'ভদ্রলোক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, কিন্তু সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের সাথে তাদের পার্থক্য থাকবেই। যদিও ব্রিটিশ ভদ্রলোকের সাথে উপমহাদেশের ভদ্রলোকের পার্থক্য ছিলো। বাঙালি ভদ্রলোকদের প্রথম পরিচয়ই ছিলো জাতের পরিচয়।[৫] অবিভক্ত বাংলায় এই তিন জাতিবর্ণই ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলো। এই শিক্ষার ফলে তারা কোম্পানির চাকরি করে সমাজে যথেষ্ট মান্যতা পেয়েছিলেন। এরাই ভদ্রলোক শ্রেণি যারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল-ব্যারিস্টার প্রভৃতি পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।

শিক্ষার সূত্র ধরেই জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় – যা এই ভদ্রলোক শ্রেণিই নিয়ে আসে। ১৯০৫ সালে যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হলো তখন তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলো বাংলার বিভিন্ন এলাকার জমিদারগণ। কিন্তু গণআন্দোলন তো কেবল মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের শিক্ষিত

[৫] অমিয় কুমার সামন্ত, "বাঙ্গালী ভদ্রলোকের উন্নাসিকতা," *মাহিষ্য সমাজ*, সংখ্যা: মার্চ ২০১৮ (কলকাতা: মাহিষ্য ভবন, ২০১৮), পৃ. ১২।

লোকদের দিয়ে হয় না। শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নেতারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, জেলেদের কোনো সমর্থন পায়নি।

বর্ণহিন্দুদের কাছে তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিবর্ণগুলো এবং মুসলমানেরা প্রায় সমার্থক। বর্ণহিন্দুরা যেমন তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের অস্পৃশ্য করে রেখেছে একইভাবে মুসলমানদেরও অস্পৃশ্য করে রেখেছে। ফলে বর্ণহিন্দুদের পরিচালিত ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায় ও অস্পৃশ্য জাতিবর্ণ এবং মুসলমানরা অংশগ্রহণ করতে আপত্তি জানিয়েছিলো। বহু বছর ধরে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের অমানুষিক ঘৃণা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের মূল কারণ হিসেবে বলা যায়। এটা বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (১৯০৭) প্রবন্ধে বলেছেন –

> আমরা জানি বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমান বসে না – ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।
>
> তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কি করা যায়, শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোনো বিধান দেখি না। যদি-বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয় তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি-স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনোদিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশের ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহার পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই।[৬]

একইভাবে বর্ণহিন্দুদের অস্পৃশ্যতার শিকার বহু জাতিবর্ণ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগ না দিয়ে ব্রিটিশদের সমর্থন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নমঃশূদ্র জাতিবর্ণের কথা। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠন করলে এবং নতুন প্রদেশে জনসংখ্যার ভিত্তিতে চাকরি দেওয়া হবে ঘোষণা করা হলে নমঃশূদ্র সম্প্রদায় তাকে স্বাগত জানিয়েছিলো।[৭] নমঃশূদ্র আন্দোলনের নেতা গুরুচাঁদ ঠাকুর এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর উপলব্ধি

---

[৬] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ব্যাধি ও প্রতিকার," https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/16056, accessed 15 October 2020.

[৭] স্বরোচিষ সরকার, "অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনের পটভূমি", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ১১৬।

অনেকটা এরকম, 'যারা দেশের খবর রাখে, দেশকে চেনে তারাই স্বদেশী করুক, আমরা দরিদ্র, দেনার দায়ে অবসন্ন, দেশ ভাগ হোক বা জুড়ে যাক তাতে আমাদের কোনো কিছু আসে যায় না; দেশের কথা বলে কিন্তু আমাদের কি দেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, জমিদারেরা কতো অত্যাচার করে, ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা অস্পৃশ্য বলে,... এর থেকে ব্রিটিশরা ভালো, তারা অন্তত সাম্যের সাধক'।[৮] অসহযোগ আন্দোলনেও গুরুচাঁদ ঠাকুর অভিন্নভাবে ব্রিটিশদের সমর্থন করেন।[৯]

ব্রিটিশ উপনিবেশে শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলার বঞ্চিত জাতিবর্ণগুলোর মধ্যে সচেতনতা, অধিকার চেতনা, প্রত্যাশা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। ফলে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর মধ্যে নতুন উদ্যম তৈরি হয়। বিশেষ করে সামাজিক মর্যাদার বিষয়টি নিয়ে তারা গুরুত্বের সাথে ভাবতে শুরু করে। এ চেতনার জন্যই জাতিবর্ণের পরিচয় রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলো। এটাই ছিলো পিছিয়ে পড়া জাতিবর্ণগুলোর সামগ্রিক চিত্র।

কিন্তু উনিশ-বিশ শতকে যে সকল জাতিবর্ণ (যেমন, নমঃশূদ্র বা রাজবংশী) মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করেছে, তাদের সাথে চাষি কৈবর্ত জাতিবর্ণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পার্থক্য ছিলো। বিষয়টিকে দুইটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

এর কারণ হিসেবে 'ভদ্রলোক' শ্রেণির জাতিবর্ণের রাজনীতি যুক্ত থাকতে পারে। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা নিশ্চয়ই ভেবেছিলো বাংলার সবথেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিবর্ণটিকে দুইভাগ করে দিতে পারলে তাদের শোষণ করতে সুবিধা হবে। এজন্য কৈবর্তদের দুইভাগে ভাগ করে একটি অংশকে নামমাত্র সাধারণ হিন্দু শ্রেণিতে জায়গা করে দেয়, আর একটি অংশকে তফসিলি হিসেবে রেখে দেয়। এদিকে মাহিষ্যরা না হতে পেরেছে ক্ষত্রিয় না হতে পেরেছে বৈশ্য। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছে শূদ্র

---

[৮] তদেব, পৃ. ১১৮।

[৯] এসময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে গুরুচাঁদ ঠাকুরের কাছে অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে চিঠি দিলে, তাঁর জবাবে গুরুচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য ছিলো এরকম, "বিদ্যাশিক্ষা তারা কিছু বেশি শিখে নাই। রাজকার্যে অধিকার তাতে নাহি পাই ॥ রাজনীতি ক্ষেত্রে তারা কভু নাহি ছোটে। স্বাধীনতা কি পদার্থ বোঝে নাকো মোটে ॥ রাজনীতি সঙ্গে যার যোগাযোগ নাই। অসহযোগের প্রশ্ন তার কিবা ভাই ॥... আর এক মহাদুঃখ ইহাদের মনে। উচ্চহিন্দু ইহাদিগে অস্পৃশ্য বাখানে ॥ কি কবো দুঃখের কথা তোমার গোচরে। দেবতারে ভাগ হিন্দু করেছে মন্দিরে ॥... ইংরাজের সাথে যোগ আমাদের কই। হাল গরু নিয়ে মোরা পাড়াগাঁয়ে রই ॥ চাকুরী করিনা মোরা কাছারি না যাই। অসহযোগের প্রশ্ন আমাদের নাই ॥ উচ্চ হিন্দু কর্মচারী যতো বঙ্গে আছে। এই মতো কথা কন তাহাদের কাছে ॥"... তদেব, পৃ. ১১৯।

শূদ্রই, তা সে কৈবর্তই হোক আর নমঃশূদ্রই হোক। বর্তমানে কৈবর্ত জাতিবর্ণের অবস্থা বিবেচনা করলে সেটা খুব সহজেই বোঝা যায়।

আঠারো উনিশ শতকের প্রায় সকল শুমারি প্রতিবেদনে দেখা যায়, চাষি কৈবর্তদের মাহিষ্য আন্দোলনের বিষয়টি নিয়ে বলা হয়েছে। যেমন, ১৯০১ সালে প্রতিবেদনে পাওয়া যায়, চাষি কৈবর্তরা নিজেদের জেলে কৈবর্তদের থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা বলে দাবি করে। যদিও তাদের সম্পর্কে সাধারণ ধারণা এই যে এ দুটি জাতিবর্ণ একই জাতিবর্ণ থেকে উদ্ভূত। মর্যাদার জন্য কৈবর্তদের এ লড়াইটা ব্রিটিশ কর্মকর্তারা সন্দেহের চোখে দেখে।[১০] রিজলির মতে, কৈবর্ত, কোচ, বাগদি, বাওরি এগুলো অনার্য জাতিবর্ণ এবং এদের মধ্যে কৈবর্তরা বল্লাল সেনের আনুকূল্য পেয়েছে। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, হিন্দুধর্মের চার বর্ণের মধ্যে সবাই নিজেদের দেখতে চায়, যেমন – কায়স্থরা ক্ষত্রিয় হতে চায়, শূদ্ররা বৈশ্য হতে চায় ইত্যাদি।[১১]

বাংলা এবং আসামে মাহিষ্য আন্দোলন সফলতা লাভ করেছে। ব্রিটিশ উপনিবেশে বাংলা ছিলো ভারতের রাজধানী। বাংলার জনগণ শিক্ষায়-দীক্ষায়, চিন্তা-চেতনায় আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের তুলনায় এগিয়ে ছিলো। তাই বাংলার মাহিষ্য আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আসামের দাস বা হালিয়া দাস, চাষি কৈবর্ত এবং হেলে বা হালিয়া কেওটরা জেলেদের তুলনায় নিজেদের উচ্চস্থান দাবি করে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের চাষি কৈবর্তদের মতো তারাও নিজেদের বর্ণহিন্দু দাবি করে। আদমশুমারি রিপোর্টে দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এরা মাহিষ্য নামেই অন্তর্ভুক্ত হয়।[১২]

তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিবর্ণগুলোই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে তফসিলি অন্তর্ভুক্ত হয়।[১৩] এ তালিকায় জেলে কৈবর্তরাও ছিলো। জেলে কৈবর্তরা কৈবর্ত শিরোনামে তফসিলি শ্রেণিভুক্ত হয়। পরবর্তী কালে ১৯৫০ সালে তফসিলি হিসেবে ভারতের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়।[১৪]

---

[১০] *Census of India 1901* (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1902), p. 353.

[১১] Ibid., pp. 360-369.

[১২] Assam, *Census of India 1921,* vol. III, part I (Shillong: Government Press, Assam, 1923), p. 144-145.

[১৩] স্বরোচিষ সরকার, *অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ* (ঢাকা: প্রতীক, ২০০৫), পৃ. ২৫।

[১৪] Bhanitasri Kalita, “A Study on Occupational Change among the Kaibartas and Banias of Barpeta Town, Assam” (PhD Dissertation, University of Gauhati, 2015), p. 60.

২০১১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী, আসামের মোট জনসংখ্যা হলো ৩,১১,৬৯,২৭২ জন। এদের মধ্যে তফসিলি জাতিবর্ণ ২২,৩১,৩২১ জন যা মোট জনসংখ্যার ৭.১৬%।[১৫] তালিকাটিতে ১৬টি জাতিবর্ণ তফসিলি তালিকাভুক্ত রয়েছে।[১৬] তালিকাটি নিচে দেওয়া হলো:

সারণি ৫.১

আসামে তফসিলি জাতিবর্ণের তালিকা

ক্রম	তফসিলি জাতিবর্ণের নাম	পুরুষ	নারী	সর্বমোট
আসাম		১১,৪৫,৩১৪	১০,৮৬,০০৭	২২,৩১,৩২১
১.	কৈবর্ত, জালিয়া	৩,৫৩,১৭৭	৩,৪০,০৪২	৬,৯৩,২১৯
২.	নমঃশূদ্র	৩,২৬,৭৫৩	৩,০৪,৭৮৯	৬,৩১,৫৪২
৩.	পাটনি	৯৩,৫৯৯	৮৮,৩০৪	১,৮১,৯০৪
৪.	ঝালো, মালো	৪১,৬২০	৩৮,৭৫৬	৮০,৩৭৬
৫.	মুচি ঋষি	৩৯,৮৭৫	৩৭,৭৬৮	৭৭,৬৪৩
৬.	ভূঁইমালী	৩৫,৬২১	৩৩,৯১৪	৬৯,৫৩৫
৭.	সূত্রধর	৩৪,১২১	৩২,১৮২	৬৬,৩০৩
৮.	হীরা	২৭,৮৬০	২৭,৪৪০	৫৫,৩০০
৯.	ধুপি ধোবি	২৭,০২৯	২৫,৪০২	৫২,৪৩১
১০.	বৃত্তাল বানিয়া	২৫,৭৭৭	২৪,৮২১	৫০,৫৯৮
১১.	জালকেওট	১২,৬২৬	১২,১৪৮	২৪,৭৭৪
১২.	বাঁশফোড়	৮,১৮৯	৮,১৭০	১৬,৩৫৯
১৩.	মাহতার, ভাঙ্গি	৪,৪৮৯	৪,৩৪৬	৮,৮৩৫
১৪.	দুগলা ধোবি	৪,০৯১	৩,৯০০	৭,৯৯১
১৫.	মাহারা	১,০২০	৮০২	১,৮২২
১৬.	লালবেগি	৪০৪	৩৮৬	৭৯০

উৎস: Bhanitasri Kalita, “A Study on Occupational Change among the Kaibartas and Banias of Barpeta Town, Assam” (PhD Dissertation, University of Gauhati, 2015), p. 60.

[১৫] Md Chirajul Haque, “A Socio-cultural Study of the Kaibarta Community of Nalbari District with Special Reference to Fish Lore and Fishing Practices” (PhD Dissertation, University of Science and Technology, Meghalaya, 2017), p. 4.

[১৬] Bhanitasri Kalita, “A Study on Occupational Change among the Kaibartas and Banias of Barpeta Town, Assam” (PhD Dissertation, University of Gauhati, 2015), p. 60.

আসামের এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে, জনসংখ্যা অনুযায়ী, কৈবর্ত জাতিবর্ণ প্রথম এবং দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে নমঃশূদ্র। তবে পাটনি এবং ঝালোমালো জাতিবর্ণ স্বতন্ত্র তফসিলি জাতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে, এদেরকে কৈবর্তের মধ্যে ধরা হয়নি। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মতো আসামেও কৈবর্ত, কেওট, পাটনি, ঝালোমালো প্রভৃতি সমার্থক কিনা এ বিষয়ে জনমনে একটি অস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। কোনো অঞ্চলে এদেরকে আলাদা জাতিবর্ণ হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা দেখা যায়, আবার কোনো অঞ্চলে সমার্থক বলে মনে করা হয়। আসামের মতো পশ্চিমবঙ্গেও জেলে কৈবর্তরা তফসিলি শ্রেণিভুক্ত কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমানে তফসিলি শ্রেণির কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই বাংলাদেশে মাহিষ্য এবং জেলে কৈবর্তদের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য থাকলেও সরকারি সংরক্ষণ সুবিধার কোনো বিষয় নেই।

কৈবর্ত জাতিবর্ণের জাতিবর্ণগত পরিবর্তন স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য এদের জনসংখ্যাগত বিন্যাসটা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। নিচে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ১৮৭২, ১৮৮১ এবং ১৮৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী কৈবর্ত জনসংখ্যার বিন্যাস দেখানো হলো:

সারণি ৫.২

১৮৭২, ১৮৮১, ১৮৯১ সালের আদমশুমারিতে কৈবর্ত জাতিবর্ণের জনবিন্যাস ও জঙ্গমতা

জেলার নাম	**১৮৭২**	**১৮৮১**	**১৮৯১**
বর্ধমান	৫৬,৭০২	৩১,৫৯২	২৬,৬৫৬
বাঁকুড়া	১২,৬৪৪	২৫,২৫০	১৮,৪৩৪
বীরভূম	১১,০৮১	৯,১২৯	৭,১৭২
মেদিনীপুর	৬,৯২,১৪০	৭,৫৩,৪৩৫	৮,০৩,৯৯৮
হুগলী	২,৮৮,৬২০	১,৪২,৫২৬	১,৪৩,৭৮০
হাওড়া	-	১,৫৫,৬৫৩	১,৭৮,১৫৫
২৪ পরগনা	১,৮২,৪৮৬	১,৭৯,৭৫৮	১,৬৩,৯৭০
নদীয়া	১,১৪,৮৫৭	১,২৬,০৬৩	৯৯,৪১৯
যশোর	৪৪,০০১	৩২,৫০৫	৫০,৩৬৫
মুর্শিদাবাদ	১,০২,৫১৭	১,০০৩,৫৫	৯১,৯০০
খুলনা	-	২৫,৮৯৫	২৪,৪৮৭
দিনাজপুর	৩৮,৩০১	৩৭,৭৮৫	৩৯,৭৬৫

রাজশাহী	৬০,৪৪০	৬৩,১৩৪	৫০, ৫০৫
রংপুর	৩৫,৩৯৬	৩০,৬১২	২৮,৬৪৪
বগুড়া	১৪,৮৩৩	১৫,৫৬৬	১৮,৭৯৪
পাবনা	১৯,২৫৫	২৩,৩০৬	২৩,৫৪৪
দার্জিলিং	২৪	২১৯	১,৪১৯
জলপাইগুড়ি	২,৯৭০	৫,৮৩৮	৩, ৬৫৫
ঢাকা	৩৩,৩১৭	৪০,৪২২	৫২,৬৮৯
ফরিদপুর	১৩,৬৪৯	২৪,০১০	২৪,১৬৬
বরিশাল	২৯,৩৪১	১৮,০৮০	১১,০৫৭
ময়মনসিংহ	৭৭,৭৯৮	৯৪,২১৭	১,১০,৫৩০
চট্টগ্রাম	৩,৬৯২	৪,৫৪৩	৬,৩০৩
নোয়াখালী	২০,২৬৩	১৬,১৫১	২৩,০৩৯
ত্রিপুরা	৫৩,৮৫৬	৫০,২৩০	৬০,৫৪৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম	-	৭	১৮
মালদা	২৭,৫৬৬	২৩,৫৫৬	৩৭,৭৪৪
পূর্ণিয়া	৫৬,৩২১	৪৪,২২১	৫৮,৭২৪
সাঁওতাল পরগনা	২,৯০৪	১০,৭৪৯	২,৯৪৫
ভাগলপুর	৩১১	২০৭	৯৬৮
কটক	-	৫১২৯	৪,৮২৮
পুরী	-	-	৫,৪৫৮
বালাসোর	-	৮৬১	১৭,৯০৫
অঙ্গুল ও খান্দামাল	-	-	১০
মানভূম	-	৫,১৪০	৩,৮৬৭
সিংভূম	-	৮০০	৮৬৮
হাজারীবাগ	-	-	২৭

উৎস: H. H. Risley, *Tribes and Castes of Bengal,* vol.1 (1891; Reprint; Kolkata: Firma KLM Private Limited, 1998), p. 382; *Census of India 1891,* vol. V, The Caste Tables (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1893), pp. 1-126; *Census of The Lower Provinces of Bengal 1891*, The Provincial Tables (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1893), pp. 226-389; Prasenjit Biswas, “Social Mobility and the Dynamics of Caste; The Mahishyas of South-Western Bengal (1901-1931)” (PhD Dissertation, University of Calcutta, 2016), pp. 101-102.

৫.২ নং সারণি থেকে বোঝা যাচ্ছে, ১৮৭২ সাল থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে কৈবর্ত জনসংখ্যার সংখ্যাগত পরিবর্তন ঘটেছে। কিছু কিছু জেলা যেমন, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় কৈবর্তদের সংখ্যা বেড়েছে। আবার অন্যদিকে বর্ধমান, বীরভূম, চব্বিশ পরগনা, রংপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় কমেছে। স্থানান্তর গমনের জন্যও এমনটা হয়ে থাকতে পারে।

সারণি ৫.৩

বাংলার সর্বমোট জনসংখ্যার অনুপাতে চাষি কৈবর্তদের শতকরা হার

বাংলা (১৯০১)	সর্বমোট জনসংখ্যা	চাষি কৈবর্ত	শতকরা হার
ব্রিটিশ রাজ্য			
বর্ধমান	৮২,৪০,০৭৬	১১,৮১,৬০৭	১৪.৩৪
প্রেসিডেন্সি	৮৯,৯৩,০২৮	৪,২২,৪০৩	৪.৭০
রাজশাহী	৮৪,৯৫,১৫৯	১,৩৩,২৩৪	১.৫৭
ঢাকা	১,০৭,৯৭,৯৮৮	১,৩৮,৮৯৯	১.২৯
চট্টগ্রাম	৪৭,৩৭,৭৩১	৬০,৭০৮	১.২৮
পাটনা	১,৫৫,১৪,৯৮৭	-	-
ভাগলপুর	৮৭,২৬,৩১৮	১৬,৭৫৪	০.১৯
উড়িষ্যা	৪৩,৪৩,১৫০	২,৯৮৩	০.০৭
ছোটনাগপুর বিভাগ	৪৯,০০,৪২৯	১,১৭৪	০.০২
সামন্ত প্রদেশসমূহ	৩৭,৪৮,৫৪৪	১,৬৪১	০.০৪

উৎস: *Census of India 1901,* vol. VIA, part II, The Imperial Tables (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1902), pp. 3 & 222.

উপরের সারণিতে ১৯০১ সালের শুমারি অনুযায়ী বাংলার সর্বমোট জনসংখ্যার অনুপাতে চাষি কৈবর্তদের শতকরা হার দেখা যাচ্ছে। এর সাথে যদি ১৯১১ সালের শুমারির তুলনা করা হয় তাহলে দেখা যায়, ১৯০১ সালের তুলনায় ১৯১১ সালে মাহিষ্য বা চাষি কৈবর্তদের সংখ্যা শতকরা ৭৮.৮৬ থেকে ৮৩.৯২ ভাগ বেড়েছে, জালিয়া বা জেলে কৈবর্তদের সংখ্যা শতকরা ১০.৭৩ থেকে ১২.৮১ ভাগ বেড়েছে। এর কারণ হিসেবে শুমারিতে বলা হয়েছে, ১৮৭২ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত অনির্ধারিত কৈবর্তের সংখ্যা বেশি ছিলো। ১৯১১ সালে এই অনির্ধারিত কৈবর্ত, চাষি কৈবর্ত এবং জেলে কৈবর্তদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়।

নিচের সারণিতে (সারণি ৫.৪) ১৯৩১ সালের শুমারি রিপোর্টে বিভিন্ন জাতিবর্ণ সর্বমোট জনসংখ্যায় প্রতি হাজারে কত হারে এবং হিন্দু জনসংখ্যায় প্রতি হাজারে কত হারে রয়েছে তার তুলনামূলক বিবরণ দেওয়া হলো:

সারণি ৫.৪

১৯৩১ সালে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নমঃশূদ্র, মাহিষ্য এবং রাজবংশীদের অনুপাত

প্রদেশ বা বিভাগ	সর্বমোট জনসংখ্যায় প্রতি হাজারে					হিন্দু জনসংখ্যায় প্রতি হাজারে				
	ব্রাহ্মণ	কায়স্থ	নমঃশূদ্র	মাহিষ্য	রাজবংশী	ব্রাহ্মণ	কায়স্থ	নমঃশূদ্র	মাহিষ্য	রাজবংশী
বাংলা	২৮	৩০	৪১	৪৭	৩৫	৬৫	৭০	৯৪	১০৭	৮১
ব্রিটিশ রাজ্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বর্ধমান	৬৪	২১	৯	১৫৯	৬	৭৭	২৫	১০	১৯২	৭
প্রেসিডেন্সি	৪২	৩৫	৫১	৬১	১১	৮৩	৬৮	১০০	১২০	২১
রাজশাহী	১০	৮	১১	১৪	১১৮	২৯	২৪	৩১	৩৯	৩৩৭
ঢাকা	১৮	৩৮	৮৭	১২	৫	৬৪	১৩৩	৩০৬	৪১	১৮
চট্টগ্রাম	১৪	৫৮	২৪	১১	১	৬৩	২৫৬	১০৮	৪৮	২
বাংলা প্রদেশসমূহ	১০	১৩	৯	৩	৩২৮	১৫	২০	১৪	৮	৪৯৭
কোচবিহার	৯	৯	৬	৩	৫৪০	১৪	১৫	১০	৫	৮৩৯
ত্রিপুরা	১১	১৯	১৩	৩	০	১৬	২৮	১৯	৫	০.৩

উৎস: *Census of India 1931*, vol. V, part. 1, Report (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1933), p. 453; Prasenjit Biswas, “Social Mobility and the Dynamics of Caste; The Mahishyas of South-Western Bengal (1901-1931)” (PhD Dissertation, University of Calcutta, 2016), p. 118.

উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে মাহিষ্য জাতিবর্ণ সর্বমোট জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো। পাশাপাশি হিন্দু অন্যান্য জাতিবর্ণ যেমন, বাহ্মণ, কায়স্থ, নমঃশূদ্র এবং রাজবংশীদের মধ্যেও সংখ্যাগরিষ্ঠ।

২.১.১ কৈবর্ত জাতিবর্ণে অনুপ্রবেশ

চাষি কৈবর্তরা যেমন মাহিষ্য নাম নিয়ে সাধারণ হিন্দু জাতিবর্ণে পরিণত হয়েছে অথবা জেলে কৈবর্ত বা পাটনিরা যেমন মাহিষ্য নাম নিতে চেয়েছে, ঠিক একই প্রক্রিয়ায় আরও অনেক জাতিবর্ণ কৈবর্ত জাতিবর্ণে পরিণত হয়েছে বা কৈবর্ত পরিচয় নিতে চেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ডোমদের কথা। আসামে কৈবর্তদের ডোম বলার বিষয়টি বেশ রহস্যজনক। বাংলার আদমশুমারি রিপোর্ট বা গেজেটিয়ারে কোথাও ডোমদের কৈবর্ত বলা হয়নি, কিন্তু আসামের আদমশুমারি রিপোর্টে দেখা যায়, ডোমরা নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কৈবর্ত পরিচয় নিয়েছে।[১৭]

জাতিগত এবং বৃত্তিগত অসম্মান দূর করতে প্রথম ১৯০০ সালে আসামের ডোমরা নিজেদের পরিচয় বদলের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন করে। প্রথমে তারা নদীয়াল পরিচয় দাবি করেছিলো। কিন্তু ১৯০১ সালে শুমারি রিপোর্টে তারা নতুন পরিচয় নিতে পারেনি। ১৯১১ সালে ডোমদের নদীয়াল এবং পাটনিদের সাথে দেখানো হয়েছিলো। এভাবে ডোমরা নদীয়াল এবং পাটনিদের সাথে মিশে যায়। ১৯২১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে বলা হয়েছে ডোমরা সংখ্যায় ৩১০০০ থেকে কমে গিয়েছে এর কারণ খুব অল্প সংখ্যক অসমিয়া ডোম এই পরিচয় দিয়েছে। ১৯২১ সালের শুমারিতে দেখা যায় শিবসাগর এবং লখিমপুরে বসবাসরত অর্ধেকের বেশি অসমিয়া ডোম জাতিবর্ণ হিসেবে নদীয়াল বা কৈবর্ত নাম গ্রহণ করেছে।[১৮]

পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে ডোমদের বৃত্তি মৃতদেহ সংকারের কাজ করলেও আসামের ডোমরা মাছ ধরার কাজ করে। হয়তো এজন্যই তারা জেলে কৈবর্তদের সাথে মিশে যেতে পেরেছে। অনেক ব্রিটিশ লেখকের মতে, অসমিয়া ডোমরা হলো রংপুরের পাটনি ডোম।[১৯] আসামের অনেক জায়গাতে ডোমরা চা-বাগানের কুলি হিসেবে কাজ করে। কুলবৃত্তি ছেড়ে ডোমরা অন্য পেশায় চলে যাওয়ার উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯১১ সালে চা-বাগান শ্রমিকের জাতি তালিকায় মোট সংখ্যার মধ্যে এরা অর্ধেক ছিলো। ১৯২১ সালে চা-বাগানের ২৫,০০০ শ্রমিকের মধ্যে এদের সংখ্যা হয় ২০,০০০ অর্থাৎ পঞ্চাশ শতাংশ থেকে বেড়ে গিয়ে প্রায় আশি শতাংশে পৌঁছে গেছে।

---

[১৭] Assam, *Census of India 1921,* vol. III, part I (Shillong: Government Press, Assam, 1923), p. 144.

[১৮] তদেব।

[১৯] তদেব।

এভাবে কৈবর্ত জাতিবর্ণে অনুপ্রবেশকারী জাতিবর্ণগুলোর জাত্যন্তর বা পেশান্তরের বিষয়টি উল্লম্ব জঙ্গমতাকেই নির্দেশ করে।

২.১.২ আত্মপরিচয়ের পরিবর্তন

আত্মপরিচয়ের পরিবর্তন চাষি কৈবর্ত জাতিবর্ণের ক্ষেত্রে যতোটা হয়েছে আর কোনো জাতিবর্ণের ক্ষেত্রে এতোটা হয়নি।[২০] বর্তমানে মাহিষ্যদের মধ্যে পরিচয় প্রত্যাবর্তনের যে প্রবণতা লক্ষ করা যায়, সে বিষয়ে নিচে আলোচনা করা হবে। নিচের রেখাচিত্রটি বিষয়টিকে কিছুটা স্পষ্ট করবে –

কৈবর্ত

↓

জেলে কৈবর্ত | গুড়ি কৈবর্ত | চাষি কৈবর্ত | তুঁতে কৈবর্ত | মালো কৈবর্ত | পাটনি কৈবর্ত

চাষি কৈবর্ত ↓

মাহিষ্য

↓

চাষি কৈবর্ত

২.১.৩ পরিচয়ের প্রত্যাবর্তন

সাম্প্রতিক সময়ে কলকাতায় মাহিষ্যদের একটি অংশ তাদের পুরাতন পরিচয়ে ফেরার চেষ্টা করছে। এরা নিজেদের চাষি কৈবর্ত-মাহিষ্য সমাজ নাম নিয়ে আন্দোলন করছে। এর পেছনে তাদের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। ব্রিটিশ আমলে চাষি ও জেলে উভয় জাতিবর্ণ কৈবর্ত নামে পরিচিত ছিলো। সেখান থেকে চাষি কৈবর্তরা মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক আন্দোলন করে মাহিষ্য নাম গ্রহণ করলো।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে মাহিষ্যরা সাধারণ হিন্দু এবং জেলে কৈবর্তরা তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত হয়। স্বাধীন ভারতে এই তফসিলি জাতিবর্ণগুলো ওবিসি তালিকাভুক্ত হলো। ওবিসি তালিকাভুক্ত জাতিবর্ণগুলো সরকারের কাছ শিক্ষা, চাকরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ সুবিধা পেয়ে

[২০] পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

থাকে, যা তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তিকে মজবুত করার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সাধারণ হিন্দু হওয়ার কারণে মাহিষ্য তথা চাষি কৈবর্ত জাতিবর্ণ এই বিশেষ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে দুই বাংলাতেই বর্ণগত বৈষম্য পূর্বের থেকে অনেকটাই কমে আসে। বরং প্রযুক্তিগত উত্তরণের সাথে সাথে শিক্ষা সংস্কৃতি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের যোগ্যতার মাপকাঠিতে তার অবস্থান তৈরি হতে শুরু করেছে। তাই এই সময়ে ওবিসি হওয়ার বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা একটি জাতিবর্ণকে আরও এগিয়ে দিতে পারে। যার কারণে মাহিষ্যদের মধ্যে একটি অংশ পুনরায় চাষি কৈবর্ত নাম নিয়ে ওবিসি তালিকাভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে।

মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাধারণ হিন্দু বা ভদ্রলোক শ্রেণি হওয়ার জন্য চাষি কৈবর্তরা যে বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির তৈরি করলো, দুই যুগ নিরলসভাবে আন্দোলন পরিচালনা করলো সেই মাহিষ্য সমিতির উদ্দেশ্য এখন পরিবর্তিত হয়েছে। কারণ একটি জাতিবর্ণের উন্নতির জন্য শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন বিশেষ প্রয়োজন। সমিতির সংবিধানে লক্ষ্য হিসেবে রয়েছে মাহিষ্য সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, সামাজিক উন্নতি, মাহিষ্য সমাজের মধ্যে ঐক্য সাধন করা, সম-মনোভাবাপন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা, সদস্য বৃদ্ধি, সমিতির সম্পত্তি বৃদ্ধি করা ও রক্ষা করা, শাখা সংগঠন গড়ে সমিতির কর্মধারাকে বিভিন্ন জেলায় ও অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া।[২১]

পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি বহুদিন ধরে মাহিষ্যদের 'অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনের' অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মাহিষ্য সমিতির সদস্য বাসুদেব মণ্ডল এবং শ্রী মধুসূদন জানার প্রচেষ্টায় 'অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনের প্রদত্ত নতুন ফর্ম অনুসারে সমস্ত তথ্যসহ ১৮৭ পাতার একটি দরখাস্তের সাথে ৩৫০ পাতার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনে জমা দেওয়া হয়। এই দরখাস্তের ভিত্তিতে অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন মাহিষ্যদের দাবি পুনর্বিবেচনার প্রক্রিয়া চালু রেখেছে।

মাহিষ্যদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা সমীক্ষা করার জন্য কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো। ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রসেনজিৎ দেববর্মণ ২০১৫ সালের ১২ই আগস্ট বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির প্রতিনিধি দলের সাক্ষ্য ও বক্তব্য গ্রহণ করেন।[২২] বঙ্গীয় মাহিষ্য

[২১] তিমির রঞ্জন হালদার, "সম্পাদকের প্রতিবেদন," *মাহিষ্য সমাজ*, সংখ্যা: মার্চ ২০১৮ (কলকাতা: মাহিষ্য ভবন, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৭।

[২২] তদেব, পৃ. ৯।

সমিতির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন অমিয় কুমার সামন্ত, বাসুদের মণ্ডল, ধীরেন্দ্রনাথ আদক, অশোক কুমার হাজরা এবং তিমির রঞ্জন হালদার।[২৩]

পরবর্তী কালে মাহিষ্য সমিতির একজন প্রতিনিধি শিবশংকর মণ্ডল অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর মাধ্যমে জানা যায় কমিশন বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতিকে পুনরায় এই বিষয়ে সাক্ষ্যগ্রহণের সুযোগ দেবে। কিন্তু ২০১৭ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি 'এই সময়' নামে একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয় যে, মাহিষ্যদের ওসিবির দাবি নাকচ করা হয়েছে।[২৪] ২০১৭ সালের ৫ই জুন বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি এ বিষয়টি নিয়ে সংবাদপত্রের প্রতিলিপিসহ ওবিসি কমিশনকে চিঠি প্রদান করে। কমিশনের আরও দুইজন সদস্যের সঙ্গে সমিতি আলোচনা করে। তারা জানান, 'মাহিষ্য' প্রসঙ্গে সমীক্ষার কাজ চলছে, শেষ হয়ে গেলে হিয়ারিং হবে। বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি ওবিসি তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে।

২.২ পেশা ও বৃত্তিগত পরিবর্তন

পেশা এবং বৃত্তি এই দুটি বিষয় সমার্থক মনে করা হলেও এ দুইয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে, বেঁচে থাকার জন্য বা জীবিকার জন্য মানুষ যে কাজের মাধ্যমে আয় উপার্জন করে তা হলো বৃত্তি। বৃত্তির সাথে শিক্ষা বা দক্ষতার কোনো সম্পর্ক নেই, বৃত্তির সাথে এগুলো থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। অন্যদিকে পেশা হলো মানুষের সেই কাজ যার সাথে জড়িত উচ্চ বা উচ্চতর ডিগ্রি, আয়, দক্ষতা এবং সামাজিক মর্যাদা।[২৫]

হিন্দু জাতিবর্ণ প্রথা অনুযায়ী, প্রত্যেকটি জাতিবর্ণের জন্য একটি নির্দিষ্ট বৃত্তি থাকতো। জন্মগতভাবে বা উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষ সেই বৃত্তি অনুযায়ী জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য থাকতো। শতাব্দীর পর শতাব্দী পুরোহিতের ছেলে পুরোহিত, জেলের ছেলে জেলে, চাষির ছেলে চাষি, নাপিতের ছেলে নাপিত, ঘরামির ছেলে ঘরামি, ব্যবসায়ীর ছেলে ব্যবসায়ী হয়েছে। এরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকে কুলবৃত্তির বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।[২৬]

---

[২৩] তদেব।

[২৪] তদেব, পৃ. ১০।

[২৫] https://www.difference.wiki/occupation-vs-profession/, accessed in 5 July 2020.

[২৬] গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (ঢাকা: অবসর, ২০০৬), পৃ. ১৫১।

বৃত্তিনির্ভর জাতিবর্ণগুলোর উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ধোপা, গোয়ালা, কামার, কুমার প্রভৃতি জাতিবর্ণ। কিন্তু কৈবর্ত, রাজবংশী, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিবর্ণকে বৃত্তিনির্ভর বলাটা কঠিন। এই জাতিবর্ণগুলো বাংলার স্বাধীন জনজাতি ছিলো। প্রাচীনকালে এসব জনজাতির অনেকেরই নিজেদের রাজ্যের কথা জানা যায়। এদের মধ্যে রাজা ছিলো, মন্ত্রী ছিলো, করণিক ছিলো, সৈনিক ছিলো, কৃষক ছিলো, ঘরামি ছিলো, করাতি ছিলো, তাঁতি ছিলো, জেলে ছিলো, কামার ছিলো, কুমার ছিলো – অর্থাৎ সব ধরনের বৃত্তিই তাদের পালন করতে হতো।[২৭]

প্রাচীন যুগে বিশেষ করে পাল আমলে কৈবর্তদের আমরা জনজাতি হিসেবেই দেখতে পাই। তারও আগে অর্থাৎ বৈদিক যুগে মৎস্যজীবী অর্থে কৈবর্ত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যদিও বৈদিক যুগের কৈবর্ত পরবর্তী কালের কৈবর্ত জনজাতি কিনা সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় না।

আধুনিক যুগে এসে কৈবর্তদের বৃত্তি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি আদমশুমারি রিপোর্ট, গেজেটিয়ার এবং ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের লেখা থেকে। নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, রাজবংশীদের মতো কৈবর্তরাও বাংলার আদি জনজাতি, যারা হিন্দুকরণের মধ্য দিয়ে হিন্দু জাতিবর্ণে পরিণত হয়েছে। ফলে জনজাতি হিসেবে কৈবর্ত জাতিবর্ণের যে সমৃদ্ধ অতীত ছিলো, আত্মপরিচয় পরিবর্তনের ফলে সেই উজ্জ্বল গৌরবটা আর তার থাকলো না। বরং হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তারা শূদ্র জাতিবর্ণে পরিণত হয়ে গেলো, হিন্দুসমাজে যে শূদ্র বর্ণের স্থান একেবারে নিচে।

উপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে অর্থনৈতিক সম্পদের বন্টন ব্যবস্থা এবং জাতিবর্ণ প্রথার প্রভাবে হিন্দু সমাজে পরিবর্তন আসতে থাকে। আঠারো শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকে কুলবৃত্তি বাদ দিয়ে অন্য পেশা গ্রহণের বিষয়টি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। বিশেষ করে ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার পঞ্চাশ-ষাট বছর পর থেকেই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতিবর্ণ অন্য কাজ করতে শুরু করে। ব্রাহ্মণরা যেমন কৃষিকাজ, ব্যবসা, সৈনিক প্রভৃতি পেশায় আসতে লাগলো। তেমনি কৈবর্ত জাতিবর্ণ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপনা প্রভৃতি পেশা বেছে নিতে শুরু করলো।

---

[২৭] স্বরোচিষ সরকার, "হরিচাঁদ ঠাকুরের বর্ণবাদ বিরোধী চিন্তা" *মতুয়া মাহাত্ম্য* (যশোর), ২০১৭, পৃ. ৯।

কৈবর্ত জাতিবর্ণের পেশান্তরের বিষয়টি কিছুটা হলেও বোঝা যাবে ব্রিটিশ আমলে ভারতের জনসংখ্যার পেশাগত বিন্যাস লক্ষ করলে। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ১৯০১-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারত অবিভক্ত ছিলো।

সারণি ৫.৫

১৯০১-১৯৮১ সাল পর্যন্ত ভারতের কর্মজীবী মানুষের পেশাগত বিন্যাস

বিভিন্ন পেশাগত বিভাগ	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১
১. কৃষিক্ষেত্র	৭১.৭	৭৪.৯	৭৬.০	৭৪.৮	৭২.১	৭১.৮	৭২.১	৬৮.৭
কৃষক	৫০.০	৪০.৮	৫৪.৪	৫৪.১	৫০.০	৫২.১	৪৩.৪	৪১.৬
কৃষি দিনমজুর	১৬.৯	২০.৬	১৭.৪	২৪.৮	১৬.৭	১৬.৭	২৬.৩	২৪.৯
গবাদি পশু পালন, বনায়ন, মৎস্য প্রভৃতি	৪.২	৪.৫	৪.২	৪.৯	২.৬	২.৩	২.৪	২.২
২. শিল্পক্ষেত্র	১২.০	১১.১	০.৫	১০.২	১০.৭	১২.২	১১.২	১৩.৫
পাথর ও খনি	০.১	০.২	০.৩	০.৩	০.৬	০.৫	০.৫	০.৫
বড়ো ও ছোট শিল্প	১১.৭	৯.০	৯.৩	৮.৯	৯.০	১০.৬	৯.৫	১১.৩
নির্মাণ কাজ	০.৮	১.০	০.৯	১.০	১.১	১.১	১.২	১.৬
৩.সেবামূলক ক্ষেত্র	১৬.৭	১৪.০	১৩.৫	১৫.০	১৭.২	১৬.০	১৬.৭	১৭.৮
ব্যবসাবাণিজ্য	০.১	৫.৫	৫.৭	৫.০	৫.২	৪.০	৫.৬	৬.৩
যোগাযোগ, যানবাহন, সংরক্ষণাগার	১.১	১.১	০.৯	১.০	১.৫	১.৬	২.৪	২.৭
অন্যান্য চাকরি	৮.৫	৭.৪	৬.৯	৮.৪	১০.৫	১০.৪	৮.৭	৮.৮
সর্বমোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস: *India Pocket Book of Economic Information: 1972 and 1973; Pocket Book of Population Statistical Outline of India 1989-90;* Cited in Vinod Kumar Baidya, "Social Mobility in Scheduled Castes: A Sociological Study in Ballia Districts (U.P)" (PhD Dissertation, Mahatma Gandhi Kashi Vidhyapeet, Varanasi, 1999), p. 167.

বিশ শতকে এদেশের সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে পেশাগত একটা পরিবর্তন শুরু হয়। মাহিষ্য ও কৈবর্ত জনগোষ্ঠী বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিবর্ণ ছিলো, তাই এ তালিকা থেকে তাদের পেশাগত কতটুকু পরিবর্তন হয়েছিলো তা অনুমান করা যাবে।

বিভিন্ন আদমশুমারি রিপোর্টে কৈবর্তদের পেশা পরিবর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯০১ সালের রিপোর্টে দেখানো হয়েছে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এবং কৈবর্ত জাতিবর্ণ কৃষি এবং মৎস্য এ দুটি পেশায় বিভক্ত।[২৮] সময়ের সাথে সাথে কৈবর্তদের নতুন পেশাও গ্রহণ করতে দেখা যায়, যেমন মিষ্টি তৈরি, স্বর্ণের কাজ প্রভৃতি।[২৯]

সারণি ৫.৬

১৯০১ সালে বাংলার বিভিন্ন বিভাগে মাহিষ্যদের পেশাগত বৈচিত্র্য

পেশাগত বৈচিত্র্য	বর্ধমান বিভাগ	কলকাতা	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	রাজশাহী বিভাগ	ঢাকা বিভাগ	চট্টগ্রাম বিভাগ
সরকারি কর্মচারী	০	২	০	০	১	০
অফিস সহকারী, পরিদর্শক এবং অন্যান্য	৬২	১৯৬	৩৮	৩৮	১৩	১
স্থানীয় প্রসাশনের অধীনে সেবাদানকারী/পিয়ন	০	১৬	৬	০	১	০
খাজনা/ভাড়া গ্রহণকারী	১৯০৭	১০০	৪২৮৭	২৯২৮	১১৯৯	১৮৭
বাড়ি বেচাকেনার এজেন্ট	১৯১	১০০	১৩১	৪৪	৭	-
অধ্যাপক, শিক্ষক এবং অন্যান্য	৭৭০	১০	২০০	১০৩	৪৯	২৩
আইনজীবী ও আইনকর্মী (এজেন্ট)	৩৯	২২	৩৭	১৪	১৯	৪
চিকিৎসক	৩৯২	১৫	১৩২	৯৯	১০৫	৪৪

উৎস: “The Imperial Tables,” *Census of India 1901,* vol. VIA, part II (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1903), pp. 502-503.

---

[২৮] *Census of India 1901* (Kolkata: Secretariat Press, 1903), p. 353.

[২৯] *Census of India 1901*, pp. 360-369.

কৈবর্ত জাতিবর্ণ বাংলার হিন্দু জাতিবর্ণগুলোর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ।[৩০] অধিকাংশ আদমশুমারি রিপোর্ট, গেজেটিয়ার এবং ব্রিটিশ দলিল দস্তাবেজে কৈবর্তদের প্রধান দুটি পেশা অর্থাৎ কৃষিজীবী এবং মৎস্যজীবীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আসামে কৈবর্ত জাতিবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম (বৃহত্তম কলিতা) এবং তফসিলি শ্রেণির মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী।[৩১] কৈবর্ত জাতিবর্ণ পুরো আসামের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও অধিকাংশই ব্রহ্মপুত্র এবং বরাক উপত্যকার সমতলে বসবাস করে। এখানে কৈবর্তদের মূল বৃত্তি হলো মাছ ধরা। এছাড়া কৃষিজীবী এবং তাঁতি কৈবর্তও রয়েছে।[৩২] বাংলায় রেশম শিল্পের সাথে জড়িত কৈবর্তদের তুঁতে কৈবর্ত বলা হয়। আসামে অন্যান্য জাতিবর্ণের মধ্যে রয়েছে নমঃশূদ্র, নাপিত, কামার, কুমার, বানিয়া প্রভৃতি জাতিবর্ণ।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হলো, আদমশুমারি রিপোর্টে আসামের কোনো তথ্য থাকলে সেখানে বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের তথ্য নির্দেশ করবে। আর ত্রিপুরার কোনো তথ্য বাংলাদেশের কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের তথ্যকে নির্দেশ করবে।

আসামের কামরূপ জেলায় কেওট আর কৈবর্ত একই জাতিবর্ণ। যদিও আসামের সকল জেলায় এই ধারণা এক রকম নয়। কামরূপে কেওটদের ৬টি উপবর্ণ রয়েছে। এগুলো হলো: ১. মালী (কৃষিজীবী), ২. হালোয়া, ৩. সিউলি, ৪. নিউলি, ৫. কাথারোয়া, ৬. ভারী।[৩৩] প্রাচীনকালে জাতিগুলোর নামকরণ তাদের বৃত্তি অনুযায়ী করা হতো। যেমন, যে ভার বহন করে সে ভারী, যে হাল বায় বা কৃষিকাজ করে সে হালোয়া প্রভৃতি।

১৮৯১ সালে আসামের আদমশুমারি রিপোর্টে কৈবর্ত এবং হালিয়া দাসের বর্ণনা রয়েছে। উড়িষ্যার সব থেকে বড়ো যে কৃষিজীবী জাতিবর্ণ রয়েছে এরা হালিয়া দাস হিসেবে পরিচিত। আসামের হালিয়া দাসের অধিকাংশই বাগানের কুলি।[৩৪] এ রিপোর্টে কেওট জাতির বর্ণনায় আছে, কেওট ও কৈবর্তের উৎপত্তি একই উৎস থেকে কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বাংলা ও মধ্য প্রদেশে

---

[৩০] *Report on the Census of Bengal 1872,* p. CXIX.

[৩১] Bhanitasri Kalita, "A Study on Occupational Change among the Kaibartas and Banias of Barpeta Town, Assam" (PhD Dissertation, University of Gauhati, 2015), p. 60.

[৩২] তদেব, ৫৮-৫৯।

[৩৩] তদেব।

[৩৪] *Census of India 1891* vol. I part II (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1893), p. 219.

কেওটদের কাজ মাছ ধরা কিন্তু আসামে কেওটরা উচ্চ শূদ্র জাতিবর্ণ, যার বড়ো একটা অংশ কৃষিকাজ করে।

সিলেট, গোয়ালপাড়া, কাছাড়, কামরূপে অধিকাংশই মৎস্যজীবী কেওটেরা বসবাস করতো। কৃষিজীবী ও জেলে ছাড়াও কেওটদের অনেক উপবর্ণ রয়েছে। কামরূপে মালী কেওট এবং কিছু তেলি কেওট রয়েছে। নওগাঁওয়ে কেওটদের বলা হয় সরু কেওট, এদের একটা উপবর্ণ উত্তরী, যারা পেশায় কৃষিজীবী। ব্রিটিশ কর্মচারী ম্যাকসুয়ানি (McSwiney) তাঁর রিপোর্টে কৈবর্ত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

> মাহিষ্য নেতাদের নির্দেশনাগত অবহেলার জন্য ১৯১১ সালে দাস বা হালুয়া দাস জাতিবর্ণ বা উপজাতিবর্ণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। রিপোর্টে মাহিষ্যদের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগকে দেখানো হয়েছে। একটি সারণিতে দাস সম্প্রদায়কে মাহিষ্যদের অধীনে দেখানো হয়েছে এবং একটি বৃহৎ অংশ নিজেদের দাস জাতিবর্ণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু পাটনিদের মাহিষ্য নাম ধারণ দাসদের বিরক্তির কারণ ছিলো। সুমামগঞ্জ মহকুমার এক ভদ্রলোক জানান, তিনি একজন দাস এবং তাঁর সাথে মাহিষ্যদের কোনো সম্পর্ক নেই, যদিও কয়েকবছর আগে তিনি স্থানীয় মাহিষ্য সমিতি কর্তৃক আয়োজিত একটি সভায় সভাপতিত্ব করেন। সম্ভবত, কিছু পাটনিও নিজেদেরকে 'দাস' জাতিবর্ণ হিসেবে চেয়েছিলো কিন্তু মনে করি না এদের সংখ্যাটা বড়ো।[৩৫]

এ পর্যায়ে বিভিন্ন জাতিবর্ণের পেশাগত উপশ্রেণির তুলনামূলক আলোচনা করা করা হলো। এর মাধ্যমে যেমন মাহিষ্য ও জেলে কৈবর্তদের পেশাগত বৈচিত্র্যের পার্থক্য বোঝা যাবে, তেমনি এই দুই জাতিবর্ণের সঙ্গে অন্য জাতিবর্ণের পেশাগত পার্থক্যটা স্পষ্ট হবে।

---

[৩৫] "Das or Halwa Das did not appear as a caste or sub-caste name at the last census, owing to neglect of directions, as explained by Mr. McSwiney under Kaibartta on pages 131-132 on his report. The differences between the sections of the Mahishyas in the Surma Valley appear to have been made up; and the Dases have been classed under Mahishya in the tables, as the majority of those returning the name of Das for caste seem to have done so in disgust at the assumption of the name Mahishya by Patnis. One gentleman of position in the Sunamganj subdivision informed me that he was a Das and he has no connection with the Mahishyas; yet he has presided at a meeting of the local Mahishya Samiti held a few years before. Probably some Patnis also gave Das as their caste, But do not think the number of these was great." *Census of India 1921,* vol. III, part I, Assam Report (Shillong: Government Press, Assam, 1923), p. 144.

সারণি ৫.৭

বিভিন্ন জাতিবর্ণের ১০০০ জন উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদের পেশাগত উপশ্রেণির বিন্যাস

পেশাগত উপশ্রেণির বিন্যাস	বিভিন্ন জাতিবর্ণ					
	বৈদ্য	ব্রাহ্মণ	জেলে কৈবর্ত	কায়স্থ	মাহিষ্য	নমঃশূদ্র
সকল উপশ্রেণি	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
গবাদিপশুপালন ও শাকসবজি চাষ	২৫০	৩৩৪	২৫২ (৬০১)	৩৭৬	১৯৮ (৫৮৮)	৮২৪
পশুশিকার/পশুবলি	১০	৫	৩	৭	১	২
শিল্পখাত	৬৫	৭০	৪৫	৭৪	৬৩	৫২
পরিবহন	৩৭	৩০	৯	২৩	১০	১৪
বাণিজ্য	৫৯	৬৩	২২	১০৬	৪২	৩১
জনশক্তি	২১	১৪	১	১৩	২	২
জনপ্রশাসন	৮৩	২৭	১	৪০	২	২
শৈল্পিক পেশা	১৩৬ (১৮৮)	৯০ (১৬৬)	৮	৭৬	১২	১২
আত্মনির্ভরশীল	২০	২১	৪	১৩	৪	৯
গৃহকর্ম	৩৩	৭৫	২৫	৫৬	৪০	২২
পেশা (অসম্পূর্ণ বিবরণ)	৮৮	৯২	১৮	৭৮ (১২৭)	৩০	১৯
অনুৎপাদনশীল	১০	১৩	১১	১১	৮	১১

টীকা: বন্ধনীর মধ্যে রয়েছে জাতিবর্ণ প্রথা অনুযায়ী বৃত্তি বা কুলবৃত্তির সংখ্যা। বন্ধনী ছাড়া সংখ্যাগুলো দ্বারা বিভিন্ন পেশাগত উপশ্রেণিতে বিভক্ত।

উৎস: *Census of India 1931*, vol. V, part I, Report (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1933), Subsidiary Table, p. 300.

সারণিটি লক্ষ করলে দেখা যায়, বিভিন্ন জাতিবর্ণ কুলবৃত্তি পরিত্যাগ করে বিভিন্ন পেশায় প্রবেশ করছে। এদের মধ্যে জেলে কৈবর্ত এবং মাহিষ্য জাতিবর্ণের অধিকাংশই ঐতিহ্যিক বৃত্তিতে যুক্ত থাকলেও তাদের মধ্যে পেশাগত জঙ্গমতা শুরু হয়েছে বলা যায়।

উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের শুরুতে বাংলায় কৈবর্ত ও মাহিষ্য জাতিবর্ণের মধ্যে আর্থিক উন্নয়ন ঘটে। এর কারণ হিসেবে বলা যায় তাদের ব্যবসা, চাকরি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের পেশাগ্রহণ। জাতিবর্ণগুলোর পেশা পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক বলা যায় শিক্ষাকে।

২.২.১ জঙ্গমতায় শিক্ষার প্রভাব

উনিশ শতকে বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাবিস্তার শুরু হয় যা জাতিবর্ণগুলোর পেশাগত ক্ষেত্রে এবং সামাজিক অবস্থানে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে। কৈবর্ত জাতিবর্ণের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বগামী জঙ্গমতার উৎস হলো শিক্ষা। শিক্ষা এই জাতিবর্ণের সামাজিক জঙ্গমতাকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। শিক্ষার হারের পরিসংখ্যানকে আমরা সামাজিক জঙ্গমতার সূচক হিসেবে উল্লেখ করতে পারি।

ঔপনিবেশিক বাংলায় শিক্ষাক্ষেত্রটি তথাকথিত উচ্চবর্ণ যেমন – ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতিবর্ণের নিয়ন্ত্রণে ছিলো। কৃষিজীবী জাতিবর্ণগুলোর মধ্যে সদ্‌গোপ এবং মাহিষ্যদের শিক্ষার হার সমগ্র রাজ্যের তুলনায় উপরে ছিলো। ১৮৯১ সালের শুমারি অনুযায়ী, কৈবর্তরা কৃষিজীবী শ্রেণিভুক্ত ছিলো। ঐ বছর কৈবর্তদের মধ্যে ৯৭,৪৯০ জন পুরুষ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। এছাড়া ১,২৩,৭৬৪ জন পুরুষ অন্যান্য ভাষায় শিক্ষিত। যেখানে মহিলাদের মধ্যে ১,২৮৪ জন শিক্ষিত। এদের মধ্যে ৫৪ জন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, ৩,২৪৪ জন অন্যান্য ভাষায় শিক্ষিত। আর কোনো কৃষিজীবী জাতিবর্ণের মধ্যে এই পরিমাণ শিক্ষিত ব্যক্তি দেখা যায় না।

১৯০১ সালের শুমারি অনুযায়ী, জাতিবর্ণগুলোর মধ্যে আগের থেকে পিছিয়ে পড়া জাতিবর্ণগুলো থেকে নিজেদের পৃথক করার প্রবণতা দেখা যায়। ই এ গেইট বলেন, এক্ষেত্রে শিক্ষা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯০১ সালে বাংলার ৫.৫% জনগণ ছিলো শিক্ষিত, যার মধ্যে ১০.৪ জন পুরুষ এবং .৫ ছিলো নারী। যেখানে মাহিষ্য ছিলো ১৩% এবং জালিয়া কৈবর্ত ছিলো ৪.৩%। আরও দুইটি বৃহৎ জাতি, নমঃশূদ্রদের মধ্যে শিক্ষার হার ৩.৩%, রাজবংশী ৩.১%। কৃষিজীবী জাতিবর্ণগুলোর মধ্যে সদ্‌গোপদের শিক্ষার হার ছিলো সবথেকে বেশি ১৩.৯%।

১৯১১ সালের শুমারিতে দেখা যায়, মাহিষ্যদের শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২,২০,০৯২ জন (পুরুষ ২,১১,৯৯৩ জন, নারী ৮,০৯৯ জন)। একই সাথে ইংরেজি শিক্ষিতের হার বেড়ে দাঁড়ায় ১৪,৭৪৮ জন (পুরুষ ১৪,৬২৬, নারী ১২২ জন)। এই শুমারিতে গত শুমারির তুলায় ইংরেজি শিক্ষার হার বেড়ে দাঁড়ায় .৫২% থেকে .৭২%। কিন্তু সাধারণ শিক্ষিতের হার কমে দাঁড়ায় ১৩% থেকে ১০.৮%। এই সংখ্যা কমার কারণ হলো জালিয়া কৈবর্তরা শুমারিতে নিজেদের চাষি কৈবর্ত হিসেবে লিপিবদ্ধ করে। সবোপরি মাহিষ্যদের শিক্ষার হারই ছিলো বেশি, ৭.৭%।

১৯৩১ সালের শুমারি অনুযায়ী বাংলায় মাহিষ্যদের সাত বছরের উর্ধ্বে শিক্ষার হার ছিলো ১৮.৬% (পুরুষ ৩২.৪%, নারী ৩.৯%)। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ২.৫২% (পুরুষ ৪.৭৩%, নারী ১.৯%)। ১৯৩১ সালের ইমপেরিয়াল সারণি ১৪ অনুযায়ী, সর্বমোট শিক্ষিত ৩,৬৩,৫৫২ জন (পুরুষ ৩,২৬,০০১, নারী ৩৭,৫৫১ জন) অথবা ১৫.২৯%। এদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত সর্বমোট ৪৯,৩৩৬ জন (পুরুষ ৪৭,৪৯৯ জন, নারী ১,৮৩৭ জন) অথবা ২.০৭%। ১৯০১ থেকে ১৯৩১ সালের শুমারিতে দেখা যায়, পুরুষের তুলনায় নারীদের শিক্ষিত হওয়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৩১ সালে মোট শিক্ষিত জনগণের মধ্যে মাহিষ্য শিক্ষিতের হার শুধু ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থদের থেকে পিছিয়ে।

বিশ শতকের শুরুতে, অন্যান্য জাতিবর্ণের থেকে মাহিষ্য জাতিবর্ণের শিক্ষার হার অধিক ছিলো, যারা শহর ও গ্রামে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গড়ে ওঠে। এই অংশটি মধ্যম এবং নিম্ন আয়ের মাহিষ্যদের নিয়ে গঠিত, যারা মাহিষ্য আন্দোলন এবং রাজনৈতিক জঙ্গমতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাহিষ্যদের পেশা পরিবর্তনেও শিক্ষা অন্যতম একটি প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে।

২.২.২ সাম্প্রতিক সময়ে কৈবর্তদের পেশা

কৈবর্তরা শুধু মৎস্যজীবী নয় তারা কৃষিজীবীও বটে। বর্ষাকালে এদের প্রধান জীবিকা মাছ শিকার, শীতকালে কৃষিকাজ। গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ কৈবর্তদের নিজস্ব জমি নেই আর থাকলেও তার পরিমাণ খুব কম। গ্রামের কৈবর্তদের সঙ্গে শহরের কৈবর্তদের পেশাগত পার্থক্য রয়েছে। পেশাগত এই পার্থক্যের কারণ মূলত শিক্ষা। কৈবর্তদের মধ্যে শিক্ষিত অংশটির মধ্যে গ্রাম ছেড়ে শহরে

এসে বসবাস করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। শুধু শহরে নয় পেশাগত কারণে বর্তমানে দেশের বাইরেও স্থানান্তরিত হচ্ছে।

সিলেটে কৈবর্তদের মধ্যে তিনটি শ্রেণিবিভাগ লক্ষ করা যায়। যথা: মাহিষ্য-দাস, দাস এবং কৈবর্ত। প্রথম দুটি শ্রেণি কৃষিজীবী, তৃতীয়টি মৎস্যজীবী। সিলেটের মাহিষ্য-দাসরা নিজেদের পাটনি বলে পরিচয় দেয়। এদের পূর্বপুরুষ খেয়া পারাপারের কাজ করত। আধুনিক কালে নদী-নালা, খাল বিল কমে যাওয়ায় এবং ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ হওয়ার ফলে এই পেশাটি বিলুপ্তির পথে।

নওগাঁ জেলার মাহিষ্য পুরোহিতদের মতে, নওগাঁতে চার ধরনের কৈবর্ত ছিলো। স্থানীয় ভাষায় এদের ১. হলধর, ২. জলধর, ৩. মাইজ্যালোটন, ৪. বঙ্কেশ্বর বলে।[৩৬] হলধরদের মধ্যে এক ধরনের কৃষক ছিলো যাদের পানের বরজ থাকতো। এরা শুধু পানচাষ করতো। অতীতে এখানে আর কোনো জাতিবর্ণ পানের চাষ করতো না। হলধররা কৃষিকাজ করতো আর জলধররা মৎস্যপেশায় নিয়োজিত ছিলো।

বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং নদীগুলোতে মাছের পরিমাণ কমে যাওয়ায় কৈবর্তদের অনেকেই জীবিকার তাগিদে অন্য পেশা গ্রহণ করছে। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। অল্প পরিমাণে যারা শিক্ষিত হচ্ছে তারা লেখাপড়া বা চাকরির সুবাদে শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে মাহিষ্যদের থেকে কৈবর্তদের থেকে অনেক পিছিয়ে। গ্রামে এখনও হাতে গুনে বের করা সম্ভব যে গ্রামে কতজন শিক্ষিত কৈবর্ত আছে। আশার ব্যাপার এই যে এখন অবিভাবকরা আগের থেকে সচেতন, নতুন প্রজন্মকে স্কুলে পাঠাচ্ছে। এই প্রজন্মের অনেকেই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষকতা প্রভৃতি পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে।

কৈবর্ত সমাজের বাড়িঘরেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। আগে যেখানে মাটি আর ছনের তৈরি ঘর ছিলো এখন সেখানে টিন আর ইটের তৈরি বাড়ি জায়গা দখল করে আছে। মাহিষ্য বা কৈবর্ত জাতিবর্ণের নিজস্ব কোনো সংগঠন নেই। কিন্তু কৈবর্তসহ অন্যান্য মৎস্যজীবীদের গ্রাম, উপজেলা, জেলা প্রভৃতি পর্যায়ে মৎস্যজীবী সংগঠন রয়েছে।

[৩৬] বদলগাছীতে কৈবর্তদের নিয়ে এক ধরনের প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে, প্রবাদটি অনেকটা এরকম: "হাজার টাকায় সাহা দুঃখী, ভেড়া-বলদে কৈবর্ত সুখী, ষাট বছরের গোয়ালা হলো নাবালক।" সাক্ষাৎকার: সজীব চক্রবর্তী (৬০), সাবেক ব্যবসায়ী ও মাহিষ্য পুরোহিত, বদলগাছী, নওগাঁ। তারিখ: বদলগাছী, ২১.০৭.২০১৯।

২.৩ স্থানান্তরগত পরিবর্তন

প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তন, খাবার স্বল্পতা, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে স্থানান্তর বা দেশান্তর হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় কারণেও স্থানান্তর ঘটে। যখন কোনো দেশে বা কোনো স্থানে একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্মূল হয়ে যায় এবং তার পরিবর্তে নতুন একটি ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়, এরকম পরিস্থিতিতে গণহত্যা বা ধ্বংস থেকে বাঁচতে মানুষ অন্য কোনো সুবিধাজনক দেশে বা স্থানে স্থানান্তরিত হয়। তবে আন্তর্জাতিক হোক বা অভ্যন্তরীণ বেশিরভাগ স্থানান্তর গমনের কারণ রাজনৈতিক বা ধর্মীয়।

কোনো জাতিবর্ণের স্থানান্তর আলোচনার ক্ষেত্রে দুটি নিয়ামক কাজ করে। একটি আকর্ষণ নিয়ামক, অন্যটি বিকর্ষণ নিয়ামক। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ নিয়ামক জনমিতি ও জঙ্গমতায় প্রভাব ফেলে।

কৈবর্ত জাতিবর্ণের আদি বাসস্থান এবং স্থানান্তরের বিষয়ে ঐতিহাসিকদের দুই ধরনের মতামত পাওয়া যায়। একটি পক্ষের মতে, কৈবর্তরা নৃতাত্ত্বিকভাবে দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত, কৈবর্তসহ অন্যান্য তফসিলি জাতিবর্ণগুলো ভারতের আদি অধিবাসী। বিষয়টির সত্যতা পাওয়া যায় কৈবর্ত জাতিবর্ণের বাসস্থান লক্ষ করলে। বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম, ঝাড়খণ্ড, ছোটনাগপুর প্রভৃতি এলাকায় এদের বসবাস।

আরেকটি পক্ষের মতে, কৈবর্তরা আর্য এবং অনার্যদের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে। অসমিয়াদের মতে, বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ এদের মূল নিবাস, প্রাক-ঐতিহাসিক যুগে এখানকার কৈবর্তরা আসামে স্থানান্তরিত হয়েছে।

মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বিভিন্ন কারণে কৈবর্তরা এক দেশ থেকে আরেক দেশে স্থানান্তরিত হয়েছে। কখনো এই গমন ছিলো ঐচ্ছিক আবার কখনো বাধ্যতামূলক।

১৯৪৭ -এর দেশভাগের কারণে তৎকালীন পূর্ববাংলা থেকে বহু হিন্দু বাঙালি পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশাতে স্থায়ীভাবে চলে যায়। যারা আর বাংলাদেশে ফেরত আসেনি। এদের মধ্যে কৈবর্তও ছিলো। অসমিয়াদের দাবি, আসামে তফসিলি জাতিগুলোর মধ্যে অসমিয়াদের থেকে বাংলা থেকে যাওয়া কৈবর্তদের সংখ্যা বেশি।[৩৭]

---

[৩৭] Deepon Das, “Politics of Mobilization among the Scheduled Castes in Assam” (PhD Dissertation, Dibrugarh University, Assam, 2015), p. 45.

১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে শুরু করে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে বাংলাদেশের মোট শরণার্থী ছিলো ৯৯,৯৮,৩০৫ জন।[৩৮] এদের মধ্যে যারা বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছিলো এবং ভারতে থাকা শরণার্থীদের একটি তালিকা পাওয়া যায়।[৩৯] এই তালিকা অনুযায়ী, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রায় এক কোটি বাঙালি ভারতের বিভিন্ন স্থানে শরণার্থী হিসেবে ছিলো তাদের মধ্যে সাড়ে সাত লক্ষ শরণার্থী ভারতে থেকে গিয়েছিলো। তাদের মধ্যে বিশাল একটি অংশ কৈবর্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

রাজশাহী বিভাগের জেলাগুলোতে অর্থাৎ রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া, জয়পুরহাট প্রভৃতি জেলা থেকে মাহিষ্যদের একটা বড়ো অংশ ভারতে স্থানান্তরিত হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময়ে যারা গিয়েছিলো এরা আর ফিরে আসেনি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়েও মাহিষ্যদের বিশাল জনসংখ্যা ভারতে স্থানান্তরিত হয়েছে।

স্থানান্তর গমন যে কোনো স্থানের জনমিতি ও জঙ্গমতায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। আবার এর সাথে জাতিবর্ণ বদলের প্রবণতাও লক্ষ করা যায়।

কৈবর্তদের স্থানান্তর গমনের সবথেকে বড়ো প্রমাণ হলো তুঁতে কৈবর্ত। ব্রিটিশ আমলের আদমশুমারি রিপোর্ট, গেজেটিয়ার এবং ব্রিটিশ কর্মচারীদের লেখা বইয়ে বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে অসংখ্য তুঁতে কৈবর্তের বসবাস সম্পর্কে জানা যায়। কিন্তু বর্তমানে পুরো রাজশাহী অঞ্চলে কোনো তুঁতে কৈবর্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। চাঁপাইনবাবগঞ্জের পাশে ভারতের মালদা জেলায় বিশাল সংখ্যক তুঁতে কৈবর্তের বসবাস রয়েছে।[৪০]

আবার তুঁতে কৈবর্তদের পেশাগত পরিবর্তনও ঘটে থাকতে পারে। বাংলাদেশ থেকে সব তুঁতে কৈবর্ত ভারতে বা পৃথিবীর অন্য কোথাও চলে গেছে এমনটা ঘটা কিছুটা অস্বাভাবিক। এমন হতে পারে যারা ভারতে স্থানান্তরিত হয়নি, সেসব তুঁতে কৈবর্তদের দুই তিন প্রজন্ম হয়তো উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে কৃষি কিংবা অন্য কোনো পেশার সাথে যুক্ত হয়েছে। এর ফলে তারা আর বংশগত পেশায় ফিরে আসতে পারেনি। মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষায় বাংলাদেশ রেশম বোর্ড এবং রেশম

---

[৩৮] দিব্যদ্যুতি সরকার, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী সমস্যা: প্রেক্ষাপট, ব্যবস্থাপনা ও ভূ-রাজনীতি," (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২), পৃ. ১২৭।

[৩৯] তদেব, পৃ. ১৪০।

[৪০] সাক্ষাৎকার: বিনয় কুমার চক্রবর্তী (৬৫), অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও মাহিষ্য পুরোহিত, কচুয়া, আত্রাই, নওগাঁ। তারিখ: ২১.০৬.২০২০।

শিল্পের সাথে জড়িত কিছু হিন্দু শ্রমিক এবং কর্মচারীকে পাওয়া গেছে যারা নিজেদের কখনো মাহিষ্য এবং কখনো তাঁতি বলে পরিচয় দেয়। এরাই তুঁতে কৈবর্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ তারা যে কাজগুলো করে যেমন রেশমের গুটি থেকে সুতা তৈরি, কাপড় বোনা, তাতে নকশা করা প্রভৃতি কাজের সাথে বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতার একটা ব্যাপার আছে। পরম্পরাগত দক্ষতা না থাকলে বছরের পর বছর অনুশীলনের মাধ্যমে এ ধরনের দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এদিক থেকে মনে হয় বাংলাদেশের বর্তমানের তুঁতে কৈবর্তরা মাহিষ্য, তাঁতি, কায়স্থ প্রভৃতি জাতিবর্ণের আড়ালে লুকিয়ে আছে।

২.৪ ধর্ম বিশ্বাসগত পরিবর্তন

ধর্মান্তর যে কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের পরিচয়, মর্যাদা এবং জনমিতিতে বেশ প্রভাব ফেলে। প্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায়, অনার্য আদিবাসী জনজাতিগুলো হিন্দুধর্মে আকৃষ্ট হয়ে হিন্দু হয়েছে।[৪১] এসব অনার্য জনজাতিগুলোর মধ্যে কৈবর্তও ছিলো। বাস্তবে এরা নামেমাত্র হিন্দু ছিলো। এছাড়া প্রাচীনকালে জনজাতিগুলোর উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লক্ষ করা যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ধারণা, এখন যারা হিন্দুধর্মের ও ব্রাহ্মণদের প্রধান ভক্ত তাদের পূর্বপুরুষরা প্রায় সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন।[৪২] বাংলায় মুসলিম বিজয়ের আগে বল্লাল সেন রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের শুমারি করেছিলেন। সাড়ে তিনশো ঘর রাঢ়ী এবং সাড়ে চারশো ঘর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলো। এছাড়া কিছু সাতশতী, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ ছিলো। সব মিলিয়ে অনধিক দুই হাজার ঘর ছিলো বলে মনে করা হয়। এ সময়ে ব্রাহ্মণ আর বৌদ্ধদের প্রভাব ছিলো। কিন্তু মুসলিম বিজয়ের পর বৌদ্ধ-মন্দির আর বৌদ্ধ দর্শনের বিনাশ ঘটতে থাকে। এ সময়ে ব্রাহ্মণদের প্রভাব বাড়তে থাকলেও বৌদ্ধদের জায়গা মুসলমানেরা দখল করে। ফলে দেশের যে জায়গায় যে ধর্মের জোর বেশি সেখানে সেই ধর্মের আধিপত্য বিস্তৃত হতে থাকে। এভাবে বাংলার অর্ধেক বৌদ্ধ মুসলমান হতে থাকে এবং বাকি অর্ধেক ব্রাহ্মণদের শরণাগত হলো। ব্রাহ্মণরা এসব বৌদ্ধদের অনার্য জনজাতি বাগদি, কৈবর্ত

[৪১] *Census of India 1901,* Bengal, vol VI, part I (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1902), p. 152.

[৪২] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *বৌদ্ধধর্ম* (ঢাকাঃ নবযুগ, ২০১১), পৃ. ১৬৮।

ও কিরাতদের মতো জল অনাচরণীয় করে দেয়।[৪৩] এরপর থেকে ধীরে ধীরে বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রসার লাভ করেছে। ব্রিটিশ আমলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হতেও দেখা যায়। এভাবে ধর্মান্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতিবর্ণের সামাজিক জঙ্গমতা তৈরি হয়।

কৈবর্ত জাতিবর্ণের ধর্মান্তর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে বাঙালি হিন্দুদের ধর্মান্তরের বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। ঐতিহাসিকদের মতে, পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশে হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানের সংখ্যা বেশি। বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রসারের কারণ সম্পর্কে কয়েকটি মতবাদ বেশ প্রচলিত। মতবাদগুলোর মধ্যে কোনটা জোরপূর্বক আবার কোনটা ইচ্ছাকৃত ধর্মান্তরকে সমর্থন করে।

ধর্মান্তর সম্পর্কে একটি মতবাদ এ রকম যে, রাজশক্তি কাজে লাগিয়ে মুসলমানরা গায়ের জোরে স্থানীয় জনগণকে ধর্মান্তর করেছে।[৪৪] ভারতে মুসলিম বিজয়ের পর থেকে ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিক পর্যন্ত অমুসলিমদের জোর করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার অনেক উদাহরণ রয়েছে। বিশেষ করে মোঘল আমল থেকে ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত ধর্মান্তরের ঘটনা বিভিন্ন সালের আদমশুমারি রিপোর্ট এবং ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ারে পাওয়া যায়।

১২০৩ সালে বখতিয়ার খিলজি বাংলা দখলের পর থেকে ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশরা দেওয়ানি লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা মুসলিম শাসকদের দখলে ছিলো। তারা ভারতবর্ষের বাইরের অন্যান্য দেশ থেকে সৈয়দ, মোঘল, আফগান প্রভৃতি শিক্ষিত ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের করমুক্ত জমি প্রদান করতো।[৪৫] এদেরকে বিভিন্ন প্রদেশের কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিলো। মুসলিম শাসকদের অধীনে যেসব সৈনিক কাজ করতো তারা এখানকার স্থানীয় হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য জাতির স্ত্রী-কন্যাদের বিয়ে করে স্থায়ীভাবে এখানে থেকে যায়।

১৯০১ সালের শুমারি রিপোর্টে হিন্দুদের জোর করে ধর্মান্তরিত করার অনেকগুলো ঘটনা রয়েছে।[৪৬] একটি ঘটনা এরকম যে, মুসলিম আমলে একটি হিন্দু গ্রামের কেন্দ্রে এক মৌলবি থাকতো। কয়েক বছর পর সে ঐ বাড়িতে ফিরে আসে। বাড়িতে ফিরে সে তার 'বদনা' খুঁজে পায়

---

[৪৩] তদেব, পৃ. ১৭১।

[৪৪] গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (ঢাকা: অবসর, ২০০৬), পৃ. ১৫১।

[৪৫] *Census of India 1901,* Bengal, vol VI, part I, p. 152.

[৪৬] Ibid. p. 168.

না। বদনাকে মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতির একটি প্রতীক বলে মনে করা হয়। এ ঘটনা সেই এলাকার নবাবেব কাছে গেলে বিচারের শাস্তি হিসেবে হিন্দু গ্রামটি ঘিরে ফেলা হয় এবং তাদের জোর করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়।[৪৭]

শুমারি রিপোর্টে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, ১৪১৪ থেকে ১৪৩০ সাল পর্যন্ত জালাউদ্দিনের সময়ে এই সতেরো বছরে হিন্দুদের সবথেকে বেশি ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। হিন্দুদের ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে একটাই শর্ত ছিলো 'কোরান অথবা মৃত্যু'।[৪৮] মোঘল আমলে মুর্শিদ কুলি খানের অধীনে অমল নামে এক জমিদার ছিলেন। ঠিক সময়ে রাজস্ব প্রদান করতে না পারায় তাঁকে তাঁর স্ত্রী-পুত্রসহ ধর্মান্তরিত করতে বাধ্য করা হয়। একইভাবে হুগলি জেলায় মাহমুদ ইসমাইল শাহ গাজি অনেক হিন্দু রাজাকে জোরপূর্বক মুসলমান হতে বাধ্য করেন।[৪৯] এ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো থেকে হিন্দুদের জোর করে বা তরবারির সাহায্যে ইসলামে ধর্মান্তরের কৌশলকেই প্রমাণ করে।

সবসময়ে যে শুধু জোর করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হতো তা নয়। এছাড়া ধর্মান্তরের জন্য নানা ধরনের কৌশলও অবলম্বন করা হতো। কখনো পির-সুফীবাদের মাধ্যমে আখড়া করে, কখনো লোকচিকিৎসার নামে হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচার করা হতো। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের গাজির গান, মাদার গান এর উদাহরণ। গাজির গানের কাহিনীর ঐতিহাসিকতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, বাংলাদেশের ইসলামীকরণের কোনো না কোনো পর্যায়ের সম্মিলিত সামাজিক শক্তি এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা সম্ভব।[৫০]

মধ্যযুগের সময় থেকে বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষ গাজি পিরকে স্মরণ করতো। পরবর্তী কালে এই পিরের ঘটনা নিয়ে নিয়ে তৈরি হয় গাজির গান। গাজির গানের কাহিনীতে দেখা যায়, গাজি পির কোনো এক শাসকের ছেলে, যিনি নিজের ইচ্ছায় ফকিরের জীবন গ্রহণ করেন। গাজির সহযোগী ছিলেন তাঁর ভাই কালু। দুই ভাই মিলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেন। এক পর্যায়ে হিন্দু রাজকন্যা চাম্পাবতীর সঙ্গে গাজির প্রণয় ও পরিণয় ঘটে। প্রথম দিকে এই কাহিনী হয়তো লোককথার

---

[৪৭] Ibid.

[৪৮] Ibid.

[৪৯] Ibid. p. 170.

[৫০] স্বরোচিষ সরকার, "লোকনাট্য গাজীর গান: শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা," *আইবিএস জার্নাল*, ১২তম সংখ্যা, ২০০৫, পৃ. ১১২।

আকারে প্রচলিত ছিলো। পরে তা নিয়ে 'গাজিমঙ্গল' বা 'গাজি কালু চাম্পাবতীর পুথি' নামে রচিত হয়। ধারণা করা হয় এই গাজি হলেন সিকান্দার শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ এবং কালু হলেন পির কুতুব-এ-আলম।[৫১] গাজির গানের মাধ্যমে অধিকাংশ সময় হিন্দু রাজকন্যা ও মুসলমান ছেলের প্রেম ও পরিণয়ের গল্প থাকে। এছাড়া হিন্দুদের বিভিন্ন দেব-দেবীর নাম ও চরিত্র ব্যবহার করে ইসলামের জয়গান করা হয়।

এভাবে গাজির গান গেয়ে বাংলার হিন্দু জনজাতি ও জাতিবর্ণকে চিকিৎসার নামে তাদের ধর্মান্তরিত করতো। অবশ্য এ সুযোগটা দিয়েছিলো বর্ণহিন্দুরাই। সে সময়ে বৈদ্য চিকিৎসকেরা শুধু সাধারণ হিন্দু বা বর্ণন্দিুদের চিকিৎসা করতো। বর্ণহিন্দুদের বাইরে একটি বিশাল জনগোষ্ঠী নির্ভর করতো এই ধরনের লোকচিকিৎসার উপর। এই লোকচিকিৎসার সুযোগে গাজির গানের বয়াতিরা তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে পারতো।

বাংলাদেশের আদিবাসী জনজাতির লোক এভাবে ক্রমে যে ইসলামের দিকে অগ্রসর হয় তার বর্ণনা পাওয়া যায় 'মতুয়া সম্প্রদায়ের' প্রতিষ্ঠাতা হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবনী 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' বইটিতে। এখানে "গোস্বামী হীরামনের প্রতি কালাচাঁদ ফকিরের অত্যাচার বিবরণ" শিরোনামে একটি অংশে চিকিৎসার নামে মুসলমান ফকিররা কীভাবে হিন্দু জাতিবর্ণের লোককে কৌশলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৫২]

১৮৭২ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে বেভারলি বলেছেন, বাংলার মুসলমানেরা মোঘল বংশের উত্তরসূরি নয়, বরং অধিকাংশই হিন্দুদের জাতিবর্ণ প্রথার কঠোরতার ফলে ধর্মান্তরিত।[৫৩]

বাংলাদেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই যে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী থেকে ধর্মান্তরিত, অনেকেই সে ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। ১৯০১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট থেকে ই. এ. গেইটের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। তিনি লিখেছেন:

> নমঃশূদ্ররা মোট ১৮,৬১,০০০ এবং পোদেরা প্রায় পাঁচ লক্ষ। এই দুই জাতিবর্ণের পূর্ণ শক্তি এই সত্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে যে, এদের বড়ো একটি অংশ মুসলমান হয়ে গেছে এবং বর্তমানে

---

[৫১] তদেব।

[৫২] তারকচন্দ্র সরকার, *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত* (গোপালগঞ্জ: হরিবর সরকার, ১৯১৭), পৃ. ৮৬-৮৮।

[৫৩] *Census of India 1901*, vol VI, part I (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1902), p. 165.

> তাদের শেখ নামে অভিহিত করা হয়। ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগে দেড় কোটি মুসলমানের বাস, এদের বৃহত্তম অংশ এই দুই জাতিবর্ণ থেকে ধর্মান্তরিত।[৫৪]

বিভিন্ন আদমশুমারি রিপোর্টে নমঃশূদ্র, পোদ বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এবং রাজবংশীদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। এই জাতিবর্ণগুলোর সাথে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির আন্দোলন প্রায় অনুরূপ। তাই বাংলাদেশে নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বা রাজবংশীদের বৃহত্তর অংশ যেভাবে ধর্মান্তরিত হয়েছে, তেমনি ব্যাপকভাবে না হলেও কৈবর্ত জাতিবর্ণের ধর্মান্তর হওয়াটা অস্বাভাবিক মনে হয় না। এক্ষেত্রে ধর্মান্তরের পেছনে কৈবর্তদের হীনতাবাচক অভিধা ও সামাজিক মর্যাদা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে বলে ধারণা করা যায়।

কৈবর্তদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা জানা না গেলেও কৈবর্ত সমমর্যাদার দুই-একটি জাতিবর্ণের ধর্মান্তরের হুমকির কথা জানা যায় ১৯৩১ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ঘটনা থেকে। 'প্রবর্তক' নামের পত্রিকাটিতে বলা হয়, সিলেটের সুনামগঞ্জের পাটনি ও নমঃশূদ্র জাতিবর্ণ মুসলমান হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলো। এ ঘটনায় হিন্দু সমাজে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। সুনামগঞ্জ সিলেট জেলার একটি মহকুমা ছিলো। এই মহকুমার কয়েকটি গ্রামের পাটনি জাতিবর্ণের লোকেরা বাংলাদেশের কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের 'পাতি' (ব্যবস্থাপত্র) নিয়ে শুমারি রিপোর্টে নিজেদের নাম 'মাহিষ্য দাস' লেখাতে চেয়েছিলো। কিন্তু হিন্দু গণনাকারীরা বিষয়টিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং নানাভাবে তাদেরকে বিদ্রুপ করতে থাকে। পাটনি সমাজ এতে ভীষণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাদের প্রতি সমবেদনা দেখিয়ে মর্যাদার এই লড়াইয়ে যোগ দেয় হিন্দু সমাজের আরেকটি উপেক্ষিত জাতিবর্ণ নমঃশূদ্র।

পত্রিকাটির মতে, এই সুযোগে এলাকার মুসলমানরা এই পতিত হিন্দুদের ইসলামধর্মের উদারতার দিক প্রদর্শন করে তাদেরকে ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। ধর্মান্তকরণের পথ দেখিয়েই তারা পাটনি ও নমঃশূদ্রদের সাহায্য করে। বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, পাটনি ও নমঃশূদ্ররা ইসলামধর্ম গ্রহণের প্রস্তাব নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে থাকে। পত্রিকাটির মতে, অস্পৃশ্য ও অনুন্নত জাতিবর্ণগুলো ব্রাহ্মণের আসন চায় না বরং তারা সবার কাছে সুব্যবহার প্রত্যাশা করে।[৫৫]

---

[৫৪] *Census of India 1901,* vol V, part 1, p. 396. অনূদিত ও উদ্ধৃত, স্বরোচিষ সরকার, "নমঃশূদ্র," *বাঙালি জাতিবর্ণের উৎস সন্ধানঃ নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কৈবর্ত, রাজবংশী*, স্বরোচিষ সরকার সম্পা. (ঢাকাঃ মাদার্স পাবলিকেশন্স, ২০১৯), পৃ. ৬২।

[৫৫] শিপ্রা বিশ্বাস, *অন্বেষণ* (কলকাতাঃ অদলবদল, ১৯৯৬), পৃ. ৯০।

ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে চাষি কৈবর্তদের সাথে জেলে কৈবর্তদের পার্থক্য রয়েছে, এটা ধারণা করা যায় ব্রিটিশ আমলের কিছু ঘটনা থেকে। ব্রিটিশ ভারতে খ্রিস্টান মিশনারিগুলো সুকৌশলে বাংলার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করতো। শ্রীরামপুর মিশনারি থেকে যেসব পত্রিকা বের করা হতো সেগুলোতে এবং কখনো আলাদাভাবে শুধু ধর্মান্তরের তথ্য প্রচারের জন্য কিছু প্রকাশনা বের করা হতো।[৫৬] সেখানে বাংলার কতো জন, কোন সামাজিক অবস্থানের কোন কোন ধর্মের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর লোকজন খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে তাঁর বিবরণ থাকতো। পত্রিকাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিকদর্শন, সমাচার দর্পণ, দি কলকাতা রিভিউ প্রভৃতি।

১৮৫১ সালে ‘দি কলকাতা রিভিউ’ পত্রিকায় ‘রেজাল্টস অব দি মিশনারি লেবার ইন ইন্ডিয়া’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধে ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরে কতজন স্থানীয় ব্যক্তি খ্রিস্টান হয়েছে তার একটি পরিসংখ্যান পাওয়া যায়।[৫৭]

সারণি ৫.৮

১৭৯৩-১৮৪২ সাল পর্যন্ত কৃষ্ণনগরে হিন্দুদের খিস্টধর্মে ধর্মান্তরের সংখ্যা

সাল	ধর্মান্তরের সংখ্যা
১৭৯৩- ১৮০২	২৭
১৮০৩- ১৮১২	১৬১
১৮১৩- ১৮২২	৪০৩
১৮২৩-১৮৩২	৬৭৫
১৮৩৩-১৮৪২	১০৪৫

উৎস: Kanti Prasanna Sen Gupta, *The Christian Missionaries in Bengal* (Kolkata: Firma K. L. Mukhopadhayay, 1971), pp. 142-143.

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ব্যাপকভাবে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরের ঘটনা শুরু হয়েছে ১৮৩৩ সালের পর থেকে। এ পরিসংখ্যান থেকে পুরো ভারতে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরের একটা অনুমান করা যায়।

---

[৫৬] Kanti Prasanna Sen Gupta, *The Christian Missionaries in Bengal* (Kolkata: Firma K. L. Mukhopadhayay, 1971), p. 142-143.

[৫৭] Ibid.

ধর্মান্তরের ঘটনা প্রচারের মাধ্যমে মিশনারিগুলো খ্রিস্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের চেষ্টা করতো। ১৮০০ সালে প্রথম যে ব্যক্তি ধর্মান্তরিত হয়েছিলো তার নাম কৃষ্ণ পাল, পেশায় সূত্রধর। মিশনারি থেকে ধর্মান্তরের তালিকায় বিভিন্ন ক্যাটাগরি ভাগ করে প্রস্তুত করা হতো। এক্ষেত্রে ধর্মান্তরিতদের জাতি, পেশা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বিবরণ থাকতো। অধিকাংশ মিশনারির তথ্যে বর্তমানকালের তফসিলি জাতিবর্ণগুলোকে ধর্মান্তরিত হতে দেখা যায়। এ তালিকায় ছিলো সূত্রধর, শুঁড়ি, ধোপা, কৈবর্ত, যোগী, তিলি প্রভৃতি জাতিবর্ণ। কৈবর্তদের বৃত্তি হিসেবে মৎস্যজীবিতার উল্লেখ রয়েছে।[৫৮] তবে শুধু যে তফসিলি জাতিবর্ণগুলোরই ধর্মান্তর হয়েছে বিষয়টি সর্বৈব সত্যি নয়।

১৮০৭ সালে ধর্মান্তরিতদের মধ্যে নয় জন কুলীন ব্রাহ্মণও ছিলো। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে কায়স্থ, বৈদ্যরাও ধর্মান্তরিত হয়েছে। ১৮৩২-৩৩ সালে কলকাতার হিন্দু কলেজের বেশ কয়েকজন ছাত্র খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। এদের সবাই ছিলো ভদ্রলোক শ্রেণির। এরা কেউই গরিব ছিলো না। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাতে সামাজিক মর্যাদায় এরাই ছিলো উপরে। কিন্তু তারপরও কেনো তারা ধর্মান্তরিত হলো এর জবাবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ভদ্রলোক বিত্তবান পিতার সন্তান হওয়ার পরও মাইকেল শাসকের জাতে অর্থাৎ ব্রিটিশদের জাতে উঠতে চেয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টান মিশনারিগুলো নানা রকমের কৌশল অবলম্বন করতো ধর্মান্তর করানোর জন্য। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে ধর্মান্তর করেছে। কখনো খাবারের জন্য, কখনো অর্থের জন্য, কখনো চাকরির জন্য প্রভৃতি নানা কৌশলে। এমনকি খ্রিস্টান হলে ১০০০ টাকা ও গোরা পত্নী বা উপপত্নী পাওয়া যাবে এমন গুজবও ছড়ানো হতো। কারণ সে সময়ে ১০০০ টাকার মূল্যমান ছিলো অনেক। এই গুজব সত্যি প্রমাণিত হয় যখন হুগলীর এক ব্যক্তিকে শ্রীরামপুর মিশন থেকে হিন্দু জাতিবর্ণ ত্যাগ করে ধর্মান্তরের পুরস্কার হিসেবে টাকা এবং গৃহকর্ত্রী দেওয়া হয়।[৫৯] শ্রীরামপুর মিশনারি স্বীকার করেছে যে বাংলায় ধর্মান্তরকে উৎসাহিত করার জন্য শুরুর দিকে তারা এ কৌশল গ্রহণ করেছিলো এবং তারা সফলও হয়েছে। এই ফাঁদে পা দিয়ে বাংলার অনেক জাতিবর্ণ খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলো।

[৫৮] Ibid. p. 144.

[৫৯] Ibid. p. 147.

নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বা রাজবংশীদের মতো ব্যাপকভাবে ধর্মান্তর না ঘটলেও কৈবর্ত জাতিবর্ণের ধর্মান্তর যে হয়েছে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। যদিও বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, চাষি কৈবর্ত বা মাহিষ্যদের তুলনায় জেলে কৈবর্তরাই বেশি ধর্মান্তরিত হয়েছে। এর পেছনে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সামাজিক মর্যাদার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

চাষি কৈবর্তরা ১৯০১-১৯১১ সালের মধ্যে অস্পৃশ্য হিন্দু থেকে মাহিষ্য পরিচয়ে বর্ণহিন্দু হয়ে গিয়েছিলো। এতে মাহিষ্যদের সামাজিক মর্যাদার উন্নতি হয়েছে। সেজন্যই হয়তো তাদের মধ্যে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা ছিলো না। এছাড়া যারা সামাজিকভাবে উন্নত, তাদের উপর অন্য ধর্মের আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম হয়ে থাকে। কিন্তু জেলে কৈবর্তরা অস্পৃশ্য হিন্দু হিসেবেই থেকে গিয়েছিলো। ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদার কোনো পরিবর্তন হয়নি। সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়ে এরাই বিভিন্ন সময়ে ধর্মান্তরিত হয়েছে।

ব্রিটিশ আমলের বিভিন্ন তথ্য থেকে ধারণা করা যায়, মধ্যযুগ থেকে ব্রিটিশ আমলের প্রথম পর্যন্ত কৈবর্ত জাতিবর্ণের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর হয়ে থাকতে পারে। এর পরের সময় থেকে জেলে কৈবর্তদের মধ্যে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

২.৪.১ অভ্যন্তরীণ ধর্মান্তরকরণ

সনাতন ধর্মের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জাতিবর্ণ নানা ধরনের ধর্মমত তথা নব্য হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে। এসব ধর্মমত বা নব্য হিন্দুধর্মগুলোর মধ্যে রয়েছে বৈষ্ণব, কর্তাভজা, মতুয়া, সৎসঙ্গ, রামকৃষ্ণ মিশন, সারস্বত সংঘ, ভারত সেবাসংঘ, জয় জগদ্বন্ধু, ইস্‌কন প্রভৃতি। বাঙালি হিন্দু জাতিবর্ণগুলোর মধ্যে এসব নব্য হিন্দুধর্মের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

নব্য হিন্দু ধর্মবিশ্বাসগুলোতে সেমিটিক ধর্মের অনুরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব ধর্মজীবন রয়েছে। যেমন দিনের বা সপ্তাহের নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থনা করা। কিন্তু পূর্ববর্তী সনাতন হিন্দু বিশ্বাসে ব্যক্তির সাথে স্রষ্টার সরাসরি যোগাযোগের কোনো সুযোগ ছিলো না। ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিশ্বাসে বৌদ্ধধর্মের মতোই ব্রাহ্মণদের আর্থিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে ধর্ম করা হতো। বারো মাসে তেরো পার্বণে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু বা দীনজনে দান করাই ছিলো মূল ধর্ম। নব্য হিন্দু ধর্মসমূহের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এই

ধর্মবোধ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের ধর্মের মতো ব্যক্তি পর্যায়ে ধর্মবোধের প্রতিষ্ঠা ঘটানো।

চৈতন্য দেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্য দিয়ে এটা শুরু হয়। ধারণা করা যায়, এর পেছনে ইসলাম ধর্মের প্রভাব থাকতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে ইসলাম ধর্মের সাথে বৈষ্ণব ধর্মের পার্থক্য প্রবল মনে হলেও মৌলিক চেতনার দিক থেকে এবং বিশেষভাবে ব্যক্তি পর্যায়ের ধর্মচর্চার দিক দিয়ে তা খুব কাছাকাছি। চৈতন্য দেবের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কুলবৃত্তি পালন করাই ছিলো ভারতীয় হিন্দুদের মূল ধর্ম। কিন্তু চৈতন্য এমন একটি ধর্ম তৈরি করলেন যেখানে প্রেম আছে, ভক্তি আছে, গান আছে, নাচ আছে। অর্থাৎ এখানকার সাংস্কৃতিক উপাদান নিয়ে নব্য হিন্দু ধর্ম তৈরি করলো। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম এখানে প্রতীকী, মূল কথা হলো ভক্তিবাদ। যেখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত প্রভৃতি জাতিবর্ণের কোনো ভেদাভেদ নেই, সবাই এক।

কৈবর্ত জাতিবর্ণের মধ্যে এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব সবথেকে বেশি। এলাকাভেদে অন্য কিছু নব্য হিন্দু ধর্মের প্রভাবও কমবেশি প্রবল দেখা যায়। যেমন পাবনাতে অনুকূল ঠাকুরের আশ্রম থাকায় সেখানকার কৈবর্ত-মাহিষ্যদের উপরে সৎসঙ্গের প্রভাব বেশি। আবার নওগাঁ জেলায় মাহিষ্যদের মধ্যে প্রণবানন্দ সেবাশ্রমের প্রভাব খানিকটা বেশি।

বৈষ্ণব ধর্মের মতো আরেকটি নব্য হিন্দুধর্মের নাম মতুয়া ধর্ম। ত্রিশের দশকের পর থেকে নমঃশূদ্র জাতিবর্ণের মধ্যে মতুয়া ধর্ম উদ্ভূত হয়। বর্তমানে নমঃশূদ্র জাতিবর্ণ এবং মতুয়া ধর্ম প্রায় অভিন্ন হয়ে গিয়েছে। মতুয়া ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর। সনাতন ধর্মের মূল দর্শনের সাথে এই ধর্মদর্শনের মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। অবতারতত্ত্ব, জন্মান্তরবাদ, চতুরাশ্রম, স্বর্গ ও দেবদেবীতত্ত্ব, পাপ-পুণ্য, মোক্ষ-নির্বাণ, গুরুতত্ত্ব, দশবিধ সংস্কার প্রভৃতি বিশ্বাসে মতুয়া ধর্ম ভারতীয় অন্যান্য ধর্মের অনুরূপ।[৬০]

---

[৬০] স্বরোচিষ সরকার, "হরিচাঁদ ঠাকুরের বর্ণবাদ বিরোধী চিন্তা" *মতুয়া মাহাত্ম্য* (যশোর: সার্বজনীন শ্রী শ্রী হরি-গুরুচাঁদ মন্দির, ২০১৭), পৃ. ১১।

মতুয়া ধর্মের একজন গুরু গোলকচাঁদ গোঁসাইয়ের আখড়া ছিলো বিখ্যাত কৈবর্ত রানি রাসমণির এস্টেট বরাহনগরে।[৬১] এই বরানগরেই বিখ্যাত দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের অবস্থান। এ থেকে ধারণা করা যায়, গোলকচাঁদ গোঁসাই বরাহনগর এলাকায় বসবাসরত কৈবর্তদের মধ্যে মতুয়া ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

১. উপসংহার

ব্রিটিশ আমলে কৈবর্ত জাতিবর্ণটির প্রধান দুটি অংশের মধ্যে চাষি কৈবর্ত বা মাহিষ্যদের মধ্যে সামাজিক জঙ্গমতার প্রবণতা অধিক লক্ষ করা যায়। জেলে কৈবর্তদের তুলনায় মাহিষ্যরা নিজেদের উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে এবং স্বতন্ত্র পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছে। কৈবর্ত জাতিবর্ণ থেকে মাহিষ্যরা পৃথক হওয়ার বিষয়টি মাহিষ্যদের জঙ্গমতাকে প্রকাশ করে। জেলে কৈবর্ত জাতিবর্ণ মাহিষ্য নাম গ্রহণের চেষ্টা করেছিলো যদিও তারা সফল হতে পারেনি। তবে কৈবর্ত জাতিবর্ণ যেমন নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে অন্য জাতিবর্ণে পরিণত হয়েছে ঠিক তেমনি পাটনি, নদীয়াল প্রভৃতি জাতিবর্ণ নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কৈবর্ত পরিচয় গ্রহণ করেছে। কৈবর্ত জাতিবর্ণ বিভিন্ন সময়ে পরিচয় বদল করেছে, কুলবৃত্তি ত্যাগ করে বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছে। এছাড়া তারা স্থানান্তরিত বা ধর্মান্তরিত হওয়ার মাধ্যমেও তাদের সমাজে জঙ্গমতা তৈরি হয়েছে।

কৈবর্ত জাতিবর্ণের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে পেশা, অর্থনৈতিক অবস্থা, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ি, সমাজ, সংস্কারে নানা ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এ বিষয়টিকে জেলে কৈবর্ত ও মাহিষ্য জাতিবর্ণের জাতিবর্ণগত, পেশাবৃত্তিগত, স্থানান্তরগত, ধর্মবিশ্বাসগত পরিবর্তন হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়।

কৈবর্ত জাতিবর্ণের মধ্যে গ্রাম থেকে শহরে আসার প্রবণতা বেড়েছে। শহরে বসবাসরত কৈবর্তদের কেউই তাদের পূর্বের পেশায় নেই। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তারা সরকারি-

[৬১] অক্ষয়কুমার দত্ত, *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* (কলকাতা: নিউ সংস্কৃত প্রেস, ১৮৮৮), পৃ. ২১৬।

বেসরকারি বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত হচ্ছে। ফলে গ্রামের তুলনায় শহরে বসবাসরত কৈবর্তরা অর্থনৈতিকভাবেও স্বাবলম্বী ও প্রতিষ্ঠিত।

মাঠ পর্যায়ের তথ্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বিভিন্ন সময়ে এই জাতিবর্ণের লোকেরা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছে, তাদের পেশার পরিবর্তন ঘটেছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের মধ্যে শিক্ষা-সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, আত্মপরিচয়ের পরিবর্তন ঘটেছে এবং পূর্বের তুলনায় তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে – এ সবই তাদের সামাজিক জঙ্গমতার বহিঃপ্রকাশ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

সংস্কৃতায়ন হলো একটি জাতিবর্ণের সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তন। সংস্কৃতায়ন অনুসন্ধান করার বিশেষ কতগুলো দিক রয়েছে। এই দিকগুলো হলো আত্মপরিচয়ের পরিবর্তন, জাতিপরিচয়ের পরিবর্তন, সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন, সংস্কারের পরিবর্তন, পেশার পরিবর্তন, বাসস্থানের পরিবর্তন, ধর্মপরিচয়ের পরিবর্তন প্রভৃতি। কৈবর্ত জাতিবর্ণের ক্ষেত্রে এই যাবতীয় পরিবর্তনগুলো ঘটেছে একটি স্থিত অবস্থা থেকে উন্নততর অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রক্রিয়া হিসেবে। পূর্ববর্তী পাঁচটি অধ্যায়ে যাবতীয় পরিবর্তনগুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়নের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে।

এক

প্রাচীন সাহিত্য, মধ্যযুগের সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, সরকারি দলিলপত্র প্রভৃতি উৎস থেকে কৈবর্ত জাতিবর্ণের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তা হলো বিভিন্ন সময়ে কৈবর্ত জাতিবর্ণের আত্মপরিচয়ের পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে কৈবর্ত জাতিবর্ণের পরিচয় বর্ণসংকর জাতি হিসেবে। কৈবর্ত জাতিবর্ণকে শূদ্র এবং অস্পৃশ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে মনুসংহিতা, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থে। এসব শাস্ত্রে কৈবর্তদের পরিচয় মোটেই সম্মানজনক নয়। এছাড়া অধিকাংশ শাস্ত্রে কৈবর্ত জাতিবর্ণের পরিচয় মৎস্যজীবী জাতি হিসেবে। প্রাচীন জনজাতি হিসেবে কৈবর্ত শব্দের সমার্থক আরও কিছু জাতিপরিচয় পাওয়া যায়, যেমন, ধীবর, দাস, মৎস্যজীবী, মার্গার প্রভৃতি।

মধ্যযুগীয় সাহিত্য রামচরিতে কৈবর্ত জাতিবর্ণের জনজাতি পরিচয় ছাড়াও রাজ্যশাসকের পরিচয় উঠে আসে। পাল রাজা দ্বিতীয় মহীপালকে পরাজিত করে কৈবর্ত সামন্ত দিব্য বরেন্দ্রে স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন। বরেন্দ্র প্রায় অর্ধশত বছর কৈবর্ত রাজা দিব্য, তাঁর ভাই রুদোক এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের অধীনে ছিলো। পাল রাজা রামপাল ভীমের হাত থেকে বরেন্দ্র পুনরুদ্ধার করেন। পরাজয়ের মধ্য দিয়ে কৈবর্তদের শাসক পরিচয়টাও বদলে যায়।

উপসংহার

বিভিন্ন ঐতিহাসিক উৎস থেকে কৈবর্ত জনজাতির আরও ৫টি রাজবংশের কথা জানা যায়। এগুলো হলো, তমলুক, বালিসিতা, তুর্কা, সুজামুতা, এবং কুতুবপুর রাজবংশ। এগুলোর অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরে অবস্থিত। প্রাচীনকালে বাংলায় যে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য ছিলো, তার মধ্যে অন্যতম এই তাম্রলিপ্ত। এখানে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছে তাম্রলিপ্ত রাজবংশ। প্রাচীনকালে এরা কৈবর্ত নামে পরিচিত থাকলেও এ রাজবংশের বর্তমান বংশধরেরা নিজেদের মাহিষ্য বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন।

কৈবর্ত জাতি পরিচয়কে যারা মহিমান্বিত করেছেন, তাদের মধ্যে রানি রাসমণি, সতী রাধিকা, বীরেন্দ্র শাসমল, বসন্তকুমার বিশ্বাস, মাতঙ্গিনী হাজরা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। কৈবর্ত জাতিবর্ণের বিশ্বাস, এসব ব্যক্তিত্ব কৈবর্তদের আত্মপরিচয়কে শুধু গৌরবান্বিত করেননি সেইসাথে সমাজে কৈবর্ত জাতির পরিচয়কে এক নতুন মাত্রা দান করেছিলেন। সমাজ-সংস্কার ও মানবতার সেবায় এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তারা অনেক অবদান রেখেছেন।

জেমস টেইলর, হার্বার্ট এইচ রিজলি, জেমস ওয়াইজ, ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, জে এইচ হাটন, এলএলএস ওম্যালী প্রভৃতি ব্রিটিশ কর্মচারীদের মতে, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, রাজবংশীর মতো কৈবর্তরা বাংলার আদি জনজাতি ছিলো যারা হিন্দুকরণের মধ্য দিয়ে হিন্দু জাতিবর্ণে পরিণত হয়েছে। নীহাররঞ্জন রায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা এই অভিমতটি সমর্থন করেন।

ঐতিহাসিকদের পাশাপাশি উনিশ-বিশ শতকের বিভিন্ন অভিধান, বিশ্বকোষ প্রভৃতি গ্রন্থলেখকেরা কৈবর্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাদের ধারণায় উঁচুনিচু বা মর্যাদা-অমর্যাদার ভাব থাকতো এবং অবনত মর্যাদাধারীদের প্রতীক হিসেবে কৈবর্তের উল্লেখ করতেন। এসমস্ত কারণে কৈবর্তদের আত্মপরিচয় পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে পদবির পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা তাদের পরিচয় পরিবর্তন করেছে। বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে এ পরিবর্তনটা বেশি হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যেও কৈবর্তদের পরিচয় উঠে এসেছে। তবে সাহিত্যের এই ধারণা বিভিন্ন সময়ের ইতিহাস দ্বারা প্রভাবিত। কখনো কৈবর্ত প্রাচীন বাংলার আদি জনজাতি, কখনো রাষ্ট্র পরিচালনাকারী শাসক, কখনো কৃষক, আবার কখনো সাধারণ জেলে। এভাবে বিভিন্ন উৎস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রাচীনকালে কৈবর্ত নামে একটি স্বাধীন জনজাতি ছিলো। যারা

পরবর্তী কালে জনজাতি থেকে হিন্দু জাতিবর্ণে পরিণত হয়েছে। সুতরাং কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়নের ইতিহাস জনজাতি থেকে জাতিবর্ণে পরিবর্তনের ইতিহাস।

দুই

প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র এবং ঐতিহাসিক দলিলপত্রে কৈবর্ত জাতিবর্ণ সম্পর্কে বর্ণিত অবনত সামাজিক মর্যাদা তাদের মধ্যে এক ধরনের সচেতনতা তৈরি করে। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা-দীক্ষায় সবচেয়ে এগিয়ে ছিলো ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ শ্রেণি। এজন্য তৎকালীন বাংলার সমাজ, সংস্কার, রীতিনীতি, জাতিবর্ণ প্রথা প্রভৃতি বিষয় জানার জন্য ব্রিটিশরা নির্ভরশীল ছিলো এই তিনটি ভদ্রলোক শ্রেণির উপর। এর ফলে এদের ব্রাহ্মণ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই ব্রিটিশদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণত হয়। ১৮৯১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে বিভিন্ন জাতিবর্ণের মর্যাদার ভিত্তিতে তালিকা করা হয় যেখানে নবশাখ জাতিবর্ণের নিচে কৈবর্তের স্থান দেওয়া হয়। বিষয়টি কৈবর্ত জাতিবর্ণের মর্যাদায় আঘাত করে। ফলে কৈবর্ত জাতিবর্ণের কৃষিজীবী অংশটি মাহিষ্য নামে নব্য পরিচয় ও মর্যাদার আন্দোলন শুরু করে।

মর্যাদা বৃদ্ধির এই আন্দোলনে তারা নিজেরা সংগঠিত হয় এবং বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি গড়ে তোলে। মাহিষ্য জাতিবর্ণের প্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্য নিজেরা এবং ব্রাহ্মণদের দিয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করে। যেখানে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে তারা বর্ণসংকর নয়। অথবা বর্ণসংকর হলেও শাস্ত্রানুমোদিত অনুলোমজাত সন্তান। এরপর এসব তথ্যের সমর্থনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছ থেকে ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করে। এই পণ্ডিতদের উপর লালমোহন বিদ্যানিধির ধারণার বেশ প্রভাব ছিলো। ইংরেজরাও পণ্ডিতদের এইসব ব্যবস্থাপত্রকে গুরুত্ব দিতেন। এছাড়া ব্রিটিশ সরকার ও শুমারি কর্তৃপক্ষের সাথে বিভিন্নভাবে দেন-দরবার করে। এভাবে বিভিন্ন স্তর পার করে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ১৯০১ সালে চাষি কৈবর্ত জাতিবর্ণ মাহিষ্য হিসেবে নতুন পরিচয় গ্রহণ করে। একইভাবে আন্দোলন অব্যাহত রেখে ১৯১১ সালে কৈবর্ত থেকে পৃথক জাতিবর্ণ হিসেবে পরিচিতি পায়। এর ফলে হিন্দু সমাজে বর্ণহিন্দুদের সাথে মাহিষ্যদের সামাজিক মর্যাদার ব্যবধান অনেকটাই কমে যায় এবং তারা নব্য ভদ্রলোক শ্রেণি হয়ে ওঠে।

মাহিষ্যদের আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে জেলে কৈবর্তদের একটি অংশ মাহিষ্য হওয়ার জন্য আন্দোলন করে। এছাড়া ডোম, পাটনি এবং নদীয়াল জাতিবর্ণও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য মাহিষ্য হওয়ার

চেষ্টা চালায়। এজন্য শুমারি কর্তৃপক্ষের কাছে তারা আবেদনও করে। কিন্তু মাহিষ্য সমিতির প্রবল আপত্তির মুখে তারা এ আন্দোলনে সফল হতে পারেনি।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে মাহিষ্যরা সাধারণ হিন্দু এবং জেলে কৈবর্তরা কৈবর্ত নামে তফসিলি শ্রেণিভুক্ত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারিভাবে হিন্দুদের মধ্যে সাধারণ বা তফসিলি কোনো ভাগ কিংবা অর্থনৈতিক কোনো সুবিধা নেই। কিন্তু ভারতে তফসিলি হিন্দুদের সংরক্ষণ সুবিধা রয়েছে। এর ফলে কৈবর্তসহ কিছু জাতিবর্ণ শিক্ষাক্ষেত্রে, চাকরিতে সংরক্ষণ সুবিধা গ্রহণ করছে এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে। হয়তো এসব সুবিধার কারণেই মাহিষ্যদের মধ্যে সম্প্রতি পরিচয়ের প্রত্যাবর্তন করার প্রবণতা দেখা যায়। এমনকি একসময়ে মর্যাদার জন্য লড়াই করা বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি ভারতের অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনের তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তিন

কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়নের সবথেকে বেশি বোঝা যায় কৈবর্ত জাতিবর্ণের মধ্যে প্রচলিত সংস্কারগুলোর পরিবর্তনের মাধ্যমে। সংস্কারের সাথে তুলনা করা যেতে পারে 'রাইট অব প্যাসেজ' এর। 'রাইট অব প্যাসেজ' বলতে ধর্মীয় বা আনুষ্ঠানিক কোনো কার্যক্রমকে বোঝায় যা সমাজে একজন ব্যক্তির জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর বা পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে। যেমন, জন্ম, বয়ঃপ্রাপ্তি, প্রজনন, বিয়ে, মৃত্যু প্রভৃতি।

অন্যান্য বাঙালি হিন্দুদের মতো কৈবর্তরাও দশবিধ সংস্কার পালন করে। কিন্তু তাদের প্রচলিত সংস্কারগুলোর মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষভাবে মাহিষ্য আন্দোলনের সময়ে। আন্দোলনের পূর্বে মাহিষ্যরা শূদ্রদের মতো সংস্কার পালন করতো। এরপর তাদের কখনো ক্ষত্রিয় আবার কখনো বৈশ্য সংস্কার পালন করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে শুরুর দিকে সমাজে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের বিরোধিতা থাকলেও ধীরে ধীরে তা স্থায়ী হয়েছে। কৈবর্ত বা মাহিষ্যদের সংস্কারের বৈচিত্র্য সবথেকে বেশি দেখা যায় উপনয়ন গ্রহণ আর অশৌচ পালনে। এলাকাভেদে, গ্রাম বা শহরভেদে, শিক্ষিত বা অশিক্ষিতভেদে, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তভেদে সংস্কারের পার্থক্য হয়ে থাকে। জেলে কৈবর্তদের সংস্কার পালনে পরিবর্তন শুরু হয়েছে খুব সম্প্রতি। তবে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বাংলাদেশে কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কারগুলোতে বেশি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে। উনিশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের শুরুতে সংস্কার পরিবর্তনে ক্ষত্রিয়করণ বা বৈশ্যকরণের সাথে আত্তীকরণ এবং পাশ্চ্যাতীকরণের প্রভাবও লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ কৈবর্ত বা মাহিষ্যদের মধ্যে যেমন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য সংস্কার প্রবেশ করেছে তেমনি বাংলার আদি জনজাতিগুলোর অনেক সংস্কার আত্তীকৃতও হয়েছে। আবার একইভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিরও নানা অনুষঙ্গ প্রবেশ করেছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা, অর্থনৈতিক সক্ষমতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে।

চার

কৈবর্ত জাতিবর্ণের জাতিপরিচয় ও সংস্কার পরিবর্তনের পাশাপাশি তাদের পেশার পরিবর্তন ঘটেছে। উনিশ শতক পর্যন্ত কৈবর্ত জাতিবর্ণটি জেলে কৈবর্ত, হেলে কৈবর্ত, চাষা কৈবর্ত, গুড়ি কৈবর্ত, তুঁতে কৈবর্ত প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলো। এ ধরনের নামকরণের কারণ তাদের বৃত্তি বা পেশা। যেমন, যে হাল চাষ করতো সে হেলে, যে জাল দিয়ে মাছ ধরতো সে জেলে, গুড়ি কৈবর্তরা ছিলো ব্যবসায়ী আর তুঁতে কৈবর্ত করতো রেশম চাষ। কৈবর্ত ও মাহিষ্য জাতিবর্ণের উপর লিখিত বই, সরকারি দলিলপত্র এবং মাঠ পর্যায়ের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় কৈবর্ত জাতিবর্ণ তাদের জাতিগত বৃত্তি পরিবর্তন করে নতুন পেশা গ্রহণ করছে। ফলে পূর্বপেশা ত্যাগ করে তারা শিক্ষক, শিল্পী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকরিজীবী প্রভৃতি নানা পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে।

কৈবর্ত জাতিবর্ণের বাসস্থানেরও পরিবর্তন হয়েছে। কৈবর্ত জাতিবর্ণের সর্বাধিক বসবাস হলো বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহী এবং পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর অঞ্চলে। এছাড়া আসামেও প্রচুর কৈবর্ত জনগোষ্ঠী রয়েছে। ১৯৪৭-এর দেশভাগ এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে অনেক কৈবর্ত বাংলাদেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে স্থানান্তরিত হয়েছে। আসামের স্থানীয় জনগণের দাবি, বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ থেকে যেসব উদ্বাস্তু বা শরণার্থী আসামে আশ্রয় নিয়েছিলো তারা আর কেউই ফিরে আসেনি। কৈবর্তদের বাসস্থান পরিবর্তন বা স্থানান্তর গমনের সবথেকে বড়ো প্রমাণ হলো তুঁতে কৈবর্ত।

পাঁচ

বিভিন্ন সময়ে কৈবর্ত জাতিবর্ণের ধর্মপরিচয়ের পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষ করে জেলে কৈবর্তদের মধ্যে অনেকেই ইসলামধর্ম এবং খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। ধর্মান্তরের কারণ হিসেবে নানা রকমের মতবাদ প্রচলিত আছে। তার মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ রয়েছে; প্রথমত, রাজশক্তি কাজে লাগিয়ে মুসলমানরা জোর করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছে। এর প্রমাণ বিভিন্ন সময়ের আদমশুমারি রিপোর্ট ও ঐতিহাসিক গ্রন্থে রয়েছে। দ্বিতীয়ত, লোকচিকিৎসা বা পীর-সুফীবাদের মাধ্যমে কৌশলে মুসলমানরা হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করেছে। তৃতীয়ত, হিন্দুদের জাতিবর্ণ প্রথা ও অস্পৃশ্যতার হাত থেকে বাঁচার জন্য তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বিভিন্ন ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে।

চাষি কৈবর্তরা ১৯০১-১৯১১ সালের মধ্যে অস্পৃশ্য হিন্দু থেকে মাহিষ্য পরিচয়ে বর্ণহিন্দু হয়ে গিয়েছিলো। এতে মাহিষ্যদের সামাজিক মর্যাদার উন্নতি হয়েছিলো। সেজন্যই হয়তো তাদের মধ্যে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা কম ছিলো। কেননা যারা সামাজিকভাবে উন্নত, তাদের উপর অন্য ধর্মের প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম হয়ে থাকে। কিন্তু জেলে কৈবর্তরা অস্পৃশ্য হিন্দু হিসেবেই থেকে গিয়েছিলো। ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদার কোনো পরিবর্তন হয়নি। সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়ে এরাই বিভিন্ন সময়ে ধর্মান্তরিত হয়েছে।

কৈবর্ত এবং মাহিষ্য জাতিবর্ণের মধ্যে নব্য হিন্দুধর্মবিশ্বাসের প্রভাবও লক্ষ করা যায়। যেমন, বৈষ্ণব, কর্তাভজা, মতুয়া, সৎসঙ্গ, রামকৃষ্ণ মিশন, সারস্বত সংঘ, ভারত সেবাসংঘ, জয় জগদ্বন্ধু, ইস্‌কন প্রভৃতি। যার মাধ্যমে তাদের সনাতনী হিন্দুধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন প্রমাণিত হয়। সনাতন ধর্মের অভ্যন্তরে এসব গৌণধর্ম বা নব্য হিন্দুধর্মের শুরু হয়েছিলো শ্রীচৈতন্য দেবের হাত ধরে বৈষ্ণব ধর্মের মাধ্যমে। কৈবর্ত এবং মাহিষ্যদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব সবথেকে বেশি। তবে বর্তমানে অন্যান্য নব্য হিন্দুধর্মও তারা গ্রহণ করছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় একটি ছকের মাধ্যমে কৈবর্ত জাতিবর্ণের উপরে সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া কিভাবে কাজ করে, তা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হলো। এই গবেষণার ফলাফল এতে খানিকটা স্পষ্ট হতে পারে:

কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়ন

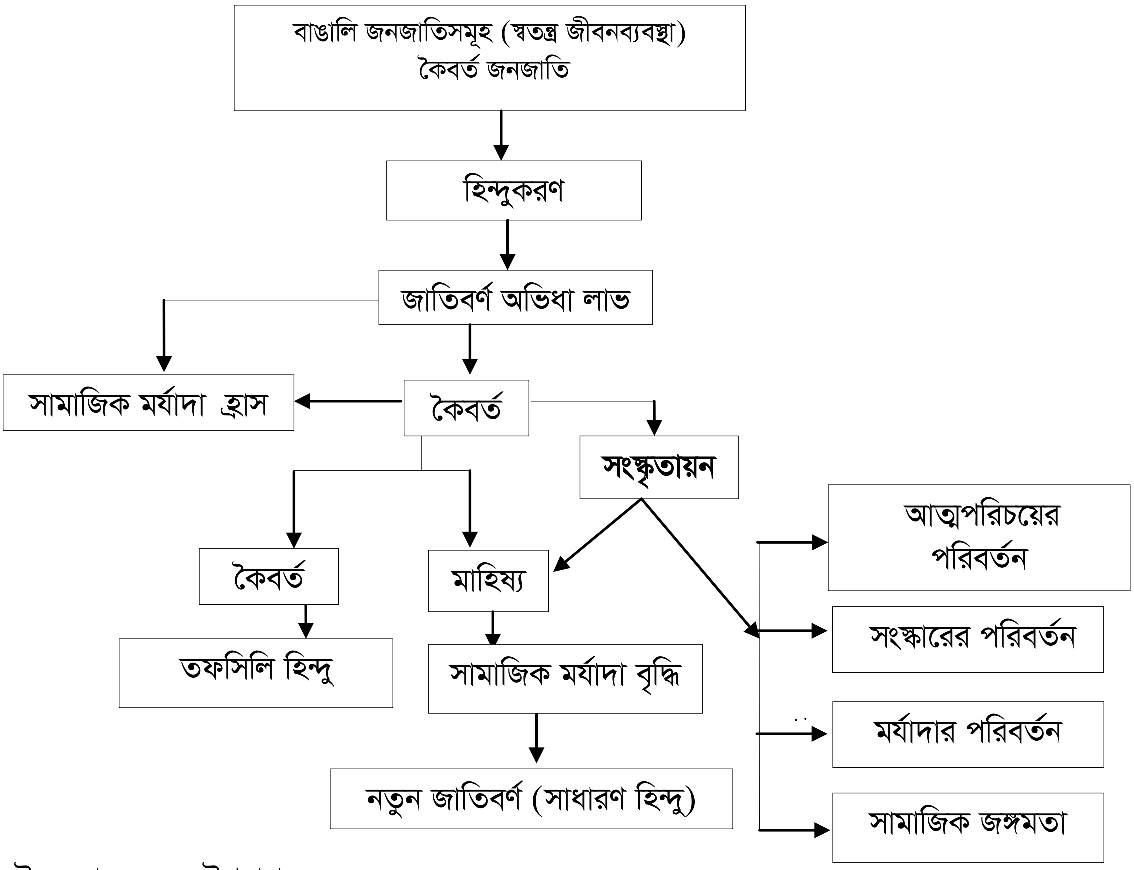

উৎস: গবেষকের উপস্থাপন

প্রাথমিক ও সহায়ক উভয় উৎসের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে কৈবর্ত জাতিবর্ণের আত্মপরিচয়ের পরিবর্তন ঘটেছে, পূর্বের তুলনায় তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের মধ্যে শিক্ষা-সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের পেশা, বাসস্থান ও ধর্মপরিচয়ের পরিবর্তন ঘটেছে – যা তাদের সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়াকেই প্রতিফলিত করে।

কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়নের ইতিহাস অনুসন্ধান ও রচনা করা এ গবেষণার মূল এলাকা। তবে প্রসঙ্গক্রমে সমকালীন অন্যান্য জাতিবর্ণ সম্পর্কেও কমবেশি আলোচনা করা হয়েছে। সেসব আলোচনায় দেখা গেছে নমঃশূদ্র, রাজবংশী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিবর্ণের সঙ্গে কৈবর্ত জাতিবর্ণের বিকাশের ইতিহাস মোটামুটি সমান্তরাল। তাই ঐসব জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়নের ইতিহাসও কৈবর্ত জাতিবর্ণের সংস্কৃতায়নের ইতিহাসের অনুরূপ হওয়া সম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জি

১. প্রাথমিক উপকরণ

১.১ সরকারি প্রতিবেদন

Bengal District Gazetteers, Hoogly. Kolkata: Government of India, 1912.

Bengal District Gazetteers, Midnapore, 1911. Reprint; Kolkata: Government of West Bengal, 1995.

Bengal District Gazetteers, Murshidabad, 1914. Reprint; Kolkata: Government of West Bengal, 1997.

Bengal District Gazetteers, *Nadia*. Kolkata: Government of India, 1910.

Bengal District Gazetteers: Jassore. Kolkata: Bengal Secretariat Book Depot, 1912.

Bengal District Gezetteers: 24-Parganas. Kolkata: Government of India, 1914.

Bengal District Gezetteers: Howrah, Kolkata: Government of India 1909.

Bengal District Gezetteers: Rajshahi. Kolkata: Government of India, 1916.

Calcutta University Commission, *1917-1919*. Report, Vol. IX. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1919.

Census of India 1881, vol. I, part II. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1883.

Census of India 1891, vol. I, part I. The Lower Provinces of Bengal, Bihar and Orissa. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1893. *Census of India,* 1901, Vol. I, Part. I, Report. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1903.

Census of India 1901, Vol. VI. Part 1. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1903.

Census of India 1901, vol. VIA, part II. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1902.

Census of India 1911, vol. VI, part II-Tables. Kolkata: Bengal Secretariat Book Dopot, 1913.

Census of India 1911, vol. III, part I. Shillong: Assam Secretariat Printing Office, 1912.

Census of India 1921, vol. III, part I. Shillong: Government Press, Assam, 1923.

Census of India 1941, vol. IV, (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1942.

Census of India, 1891, Vol. IV, The Administrative Tables. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1893.

Census of India, 1901, Vol. I-A, Part. II, Tables. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1903.

Census of India, 1901, Vol. VI, Part. I, The Report. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1902.

Census of India, 1901, Vol. VI, Part. II, The Imperial Tables. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1902.

Census of India, 1911, Vol. I, Part. II, Tables. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1913.

Census of India, 1911, Vol. V, Part. I, Report. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1913.

Census of India, 1911, Vol. VI, Part. I, Report. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1913.

Census of India, 1921, Vol. I, Part. I, Report. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1924.

Census of India, 1921, Vol. I, Part. II, Tables. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1923.

Census of India, 1921,Vol. V, Part. I, Report. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1923.

Census of India, 1921,Vol. V, Part. II, Tables. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1923.

Census of India, 1921,Vol. VI, Part. I, Report. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1923.

Census of India, 1921,Vol. VI, Part. II, Tables. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1923.

Census of India, 1931,Vol. I, Part. I, Report. Delhi: Manager of Publications, 1933.

Census of India, 1931,Vol. I, Part. II, Delhi: Manager of Publications, 1933.

Census of India, 1931,Vol. V, Part. I, Report. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1933.

Census of India, 1931,Vol. V, Part. II, Tables. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1933.

Census of India, 1931,Vol. VI, Parts. I & II, Report & Tables. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1933.

Census of the Lower Provinces of Bengal: The Provincial Tables, 1891. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1893.

Indian Statutory Commission, Interim Report. Kolkata: 1929. *Indian Statutory Commission,* Vol. II. Kolkata: 1930. *Indian Statutory Commission,* Vol. XVI. London: 1930. *Memorandum on the Census of British India, 1871-72.* London: 1875.

Report on the Cencus of Bengal, 1872. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1872.

Report on the Cencus of Bengal, 1881. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1883.

Report on the Cencus of Bengal, 1891. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1893.

Report on the Cencus of Bengal, 1901. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1903.

Report on the Cencus of Bengal, 1911. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1913.

Report on the Cencus of Bengal, 1921. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1923.

Report on the Cencus of Bengal, 1931. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1933.

Report on the Cencus of Bengal, 1941. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1942.

Report on the Cencus of Bengal, 1951. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1952.

Report on the Cencus of India, 1881-1931. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1881-1931.

Report on the Census of the District of Hawrah. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1893.

১.২ ধ্রুপদি সাহিত্য

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব

প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ

বৃহদ্ধর্মপুরাণ

মনুসংহিতা

মহাভারত

যজুর্বেদ সংহিতা

রামায়ণ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

১.৩ সাময়িক পত্র

অর্চনা

আর্য-দর্পণ

আর্য-দর্শন
আর্য-কায়স্থ-প্রতিভা
তত্ত্ববোধিনী
বঙ্গদর্শন
বৈদ্য-প্রতিভা
প্রবাসী
ভারতী
ভারতবর্ষ
দর্পণ
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা
মাহিষ্য সমাজ
মাহিষ্য মহিলা
মাহিষ্য মনীষা
মাহিষ্য-বান্ধব
নব্য ভারত

২. সহায়ক উপকরণ

২.১ গ্রন্থ

আবদুর রহিম, মুহম্মদ প্রমুখ। *বাংলাদেশের ইতিহাস*। ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৭।

আবদুল হাকিম, খান বাহাদুর সম্পা.। *বাংলা বিশ্বকোষ: দ্বিতীয় অধ্যায়*। ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫।

ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান। *খোয়াবনামা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৭।

ইসলাম, আজহার। *চিরায়ত সাহিত্যভাবনা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল। *গঙ্গা একটি নদীর নাম*। কলকাতা: বুকফ্রন্ট, ২০০১।

গোস্বামী, বিজনবিহারী অনু.। *যজুর্বেদ সংহিতা*। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৭।

ঘোষ, অমরেন্দ্র। *চরকাশেম*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯৪৯।

ঘোষ, জগদীশ চন্দ্র সম্পা.। *শ্রীমদ্ভগবদগীতা*। পুনর্মুদ্রণ; কলকাতা: প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, ২০১২।

চক্রবর্তী, হরিশ চন্দ্র। *ভারত-বিজয়া*। ২য় সং; হাওড়া: ১৯১৭।

চট্টোপাধ্যায়, সাধন। *গহীন গাঙ*। কলকাতা: ভাবনা, ১৯৯৬।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। *লোকরহস্য ও মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত*। ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ, ২০১৬।

চন্দ্র, অরূপ সম্পা.। *বাংলায় হাজার বছরের কৃষক বিদ্রোহ ও মুর্শিদাবাদ*। বহরমপুর: বাসভূমি প্রকাশন, ২০১৪।

চৌধুরী, ঘনশ্যাম। *অবগাহন*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০০।

চৌধুরী, বিজয়ভূষণ ঘোষ। *আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ পদ্ধতি*। কলকাতা: গ্রন্থকার, ১৯৩২।

জব্বার, আবদুল। *ইলিশমারির চর*। দ্বিতীয় সং, কলকাতা: ইউনিভার্সেল বুক ডিপো, ১৯৮২।

জলদাস, হরিশংকর। *নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮।

————। *কৈবর্ত কথা*। তৃতীয় সংস্করণ। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১২।

————। *নোনাজলে ডুবসাঁতার*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৮।

————। *জলপুত্র*। চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা: মাওলা ব্রাদ্রার্স, ২০১৯।

————। *দহনকাল*। দশম মুদ্রণ, ঢাকা: মাওলা ব্রাদ্রার্স, ২০১৯।

ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ অনূ.। *মনুসংহিতা*। কলকাতা: অরুণোদয় ঘোষ, ১৮৬৬।

তালুকদার, জাকির। *পিতৃগণ*। ঢাকা: রোদেলা, ২০১১।

দত্ত, অক্ষয়কুমার। *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*। কলকাতা: নিউ সংস্কৃত প্রেস, ১৮৮৮।

দত্ত, রমেশ চন্দ্র অনূ.। *ঋগ্বেদ সংহিতা*। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৬।

দত্ত, রমেশ চন্দ্র। *রমেশ রচনাবলী*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৭০।

দাস, অরূপকুমার সম্পা.। *তিতাস স্রষ্টা অদ্বৈত মল্লবর্মণ: জীবন, সৃজন ও রূপায়ণ*। কলকাতা: বামা পুস্তকালয়, ২০০২।

দাস, কাশীরাম অনূ.। *মহাভারত*। কলকাতা: অক্ষয় লাইব্রেরি, ১৯৮৬।

দাস, দুলালকৃষ্ণ। *যুগজননী রানি রাসমণি*। কলকাতা: একুশশতক, ২০১৪।

দাস, পূর্ণলাল। *সতী রাধিকা*। যোরহাট: চিন্তামগ্নী মেধি, ১৯৩৩। [অহমিয়া ভাষায়]

দাস, সুকুমার। *এগরকি আদর্শ নারীর জীবনী আরু কৈবর্ত-কথা*। গৌহাটি: জনজাতীয় গবেষণা সংস্থা সঞ্চালকালয়, ১৯৮৮। [অসমিয়া ভাষায়]

নস্কর, সনৎকুমার সম্পা.। *কবিকঙ্কন-চণ্ডী (কেতকী পালা)*। কলকাতা: রত্নাবলী, ২০০৯।

পাল, সমর। *কৈবর্ত জাগরণ*। ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১২।

পোদ্দার, অরবিন্দ। *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৪।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন। *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৯৯১।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক কুমার সম্পা.। *ছান্দোগ-দশবিধ-সংস্কার বিধি*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০২।

————। *যজুর্বেদীয় দশবিধ সংস্কার বিধি*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০২।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*। প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সং, কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। *তারাশঙ্কর রচনাবলী*। কলকাতা: মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৭৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রলাল সম্পা.। *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ২য় খণ্ড। ৪র্থ সং; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। *মাঝির ছেলে*। কলকাতা: ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ১৯৬০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। *বাঙ্গালার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৭১।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর এবং অভিজিৎ দাশগুপ্ত সম্পা.। *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ*। দিল্লি: ইন্টারন্যাশনাল

সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ১৯৯৮।
বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ সম্পা.। *দলিতের আখ্যানবৃত্ত*। কলকাতা: মৃত্তিকা, ২০০৫।
বসু, নগেন্দ্রনাথ সম্পা.। *বিশ্বকোষ*। দিল্লী: বি আর পাবলিশিং কর্পোরেশন, ১৯৮৮।
বসু, নির্মলকুমার। *হিন্দুসমাজের গড়ন*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ২০০৪।
বসু, রাজশেখর। *বাল্মীকি-রামায়ণ*। কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৯৪৭।
বসু, সমরেশ। *গঙ্গা*। কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, ১৯৭৪।
বসু, স্বপন। *গণ-অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৪।
বাগচী, যতীন। *জাতি ধর্ম ও সমাজ বিবর্তন*। কলকাতা: সঞ্জীব প্রকাশন, ১৯৯০।
বিদ্যাবারিধি, শ্যামাচরণ কবিরত্ন। *জাতিতত্ত্ব: বৈদ্য, যোগী, মাহিষ্য ও কায়স্থে*। কলকাতা: ভিক্টোরিয়া প্রেস, ১৯২৬।
বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচরণ। *সরস্বতী*। কলকাতা: সাহিত্যলোক, ১৯৮০।
বিশ্বাস, অচিন্ত্য। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম*। কলকাতা: রত্নাবলী, ১৯৯৮।
————, সম্পা.। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০০০।
বিশ্বাস, সুদর্শনচন্দ্র। *বঙ্গীয় মাহিষ্য পুরোহিত*। ফরিদপুর: ১৯১২।
বিশ্বাস, অশোক। *বাংলাদেশের রাজবংশী: সমাজ ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৫।
বিশ্বাস বাড়ই, শশিকুমার। *নমঃশূদ্র দ্বিজতত্ত্ব*। বরিশাল, ১৯১১।
বিশ্বাস, শিপ্রা। *অন্বেষণ*। কলকাতা: অদলবদল, ১৯৯৬।
বিশ্বাস, সত্যরঞ্জন। *মাহিষ্য আন্দোলনের ইতিহাস*। কলকাতা: নিউ ভারতী প্রেস, ১৯৮৯।
ভট্টাচার্য , নরেন্দ্রনাথ। *ভারতীয় জাতিবর্ণ প্রথা*। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম, ১৯৮৭।
ভট্টাচার্য, মলয়শঙ্কর সম্পা.। *মালদহ চর্চা*। মালদহ: বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা, ২০১১।
ভট্টাচার্য, রঘুনন্দন। *প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্*। কলকাতা: ইলেকট্রমেশিন প্রেস, ১৯০৯।
ভট্টাচার্য, লালমোহন বিদ্যানিধি। *সম্বন্ধ নির্ণয়*। ২য় সং। কলকাতা: শশিভূষণ ভট্টাচার্য, ১৮৯৬।
ভট্টাচার্য, শরদিন্দু। *হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজ*। ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৯।
ভট্টাচার্য, শশিভূষণ অনূদিত। *বল্লালচরিত*। কলকাতা: কলিকাতারাজধ্যানম, ১২২১।
মণ্ডল, চিত্ত ও সুরঞ্জন মিদ্দে সম্পা.। *ভূমিপুত্র*। কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অনগ্রসর শ্রেণী ফোরাম, ২০০৯।
মজুমদার, রমেশচন্দ্র। বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র। কলকাতা: ভারতী বুক ষ্টল, ১৯৭৩।
————। *বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ*। কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৮১।
মহাভারতী, ধর্মানন্দ। *মাহিষ্য-সিদ্ধান্ত*। কলকাতা: ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ১৯০৩।
মহাশ্বেতা দেবী। *রচনাসমগ্র, খণ্ড ২১*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০১৬।
মামুদ, হায়াৎ সম্পা.। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*। ঢাকা: অবসর, ১৯৯৫।
মিত্র, অমরেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ সম্পা.। *ভারতকোষ*। চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা: সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭১।
মুখোপাধ্যায়, অমরজ্যোতি। *সেদিন বরেন্দ্রভূমিতে রক্তশায়ী কৈবর্ত বিদ্রোহ*। কলকাতা: আনন্দ প্রকাশন,

২০১৯।
মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ সম্পা.। *মনুসংহিতা*। কলকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৩০।
মুরশিদ, গোলাম। *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ: পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮১।
————। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। পুনর্মুদ্রণ; ঢাকা: অবসর, ২০০৬।
রানা, সন্তোষ এবং কুমার রানা। *পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী*। কলকাতা: ক্যাম্প, ২০০৯।
রায়, অজয়। *বাংলা ও বাঙালি*। ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৩৭৬।
রায়, দেবেশ। *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*। ষোড়শ সং; কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৮।
রায়, দীপেন্দ্রনারায়ণ। *তাম্রলিপ্তের রাজকাহিনী*। তমলুক: ইউনিক প্রিন্টার্স, ২০০৩।
————। *তাম্রলিপ্তের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও উৎসব*। কলকাতা: মন্দাক্রান্তা, ২০১৬।
রায়, নির্মল কুমার। *রানী রাসমণির জীবন-বৃত্তান্ত*। কলকাতা: কথামৃত প্রকাশনী, ১৯৯০।
রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙালি হিন্দুর বর্ণভেদ*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৪৭।
————। *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব*। তৃতীয় সং। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০০।
রায়, রামমোহন। *গৌড়ীয় ব্যকরণ*। কলকাতা: হিন্দু কলেজ, ১৮৩৩।
রাহা, সুব্রত। *জাতপাত: ইতিহাস, রাজনীতি, প্রতিকার*। কলকাতা: অবভাস, ২০০৯।
রুদ্র, অশোক। *ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন*। কলকাতা: পিপলস্ বুক সোসাইটি, ১৯৮৭।
শাসমল, বিমলানন্দ। *ভারত কি করে ভাগ হল*। পুনর্মুদ্রণ; কলকাতা: হিন্দুস্তান বুক সার্ভিস, ১৯৯৭।
শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। *বৌদ্ধধর্ম*। ঢাকা: নবযুগ, ২০১১।
সরকার, গোপালচন্দ্র। *মাহিষ্য নামোদ্ধারের ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি, ১৯৯৭।
সরকার, তারকচন্দ্র। *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত*। গোপালগঞ্জ: হরিহর সরকার, ১৯১৭।
সরকার, প্রকাশচন্দ্র। *বৃহৎ মাহিষ্যকারিকা*। কলকাতা: ফিনিক্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯৩১।
সরকার, ভবনাথ। নাথধর্ম: সমাজ ও সংস্কৃতি। কলকাতা: এ. কে. বুক ট্রাষ্ট, ১৯৮৮।
সরকার, শ্যামাচরণ। *বাঙ্গলা ব্যকরণ*। কলকাতা: পি. এস. জি রোজারিও, ১৮৫৭।
সরকার, স্বরোচিষ। *গিরিশচন্দ্র বড়ুয়া*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪।
————। *অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ*। ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৫।
—————। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতা। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৬।
————, সম্পা.। *আদিবাসী জাতিসত্তার আত্মপরিচয়*। রাজশাহী: আইবিএস, ২০১৮।
————, সম্পা.। *বাঙালি জাতিবর্ণের উৎস সন্ধান: নমশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কৈবর্ত, রাজবংশী*। ঢাকা: মাদার্স পাবলিকেন্স, ২০১৯।
সামন্ত, শিশুতোষ। *রানী রাসমণির অন্তহীন জীবনবৃন্তে, চার-খণ্ড*। কলকাতা: সৌরজ্যোতি সামন্ত, ২০০৭।
————। *সমাধির অন্তরালে মহতের নিদ্রাভঙ্গ*। কলকাতা: উষা প্রেস, ২০১৩।
সিংহ, কালীপ্রসন্ন অনূদিত। *মহাভারত*। কলকাতা: চন্দ্রনাথ বসু, ১৮৮৩।
সুর, অতুল। *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*। তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৮৬।
সেন, অভিজিৎ। *রহু চণ্ডালের হাড়*। ঢাকা: নান্দনিক, ২০১২।

সেন, সুকুমার, সম্পা.। *চণ্ডীমঙ্গল*। নয়াদিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৭৫।

———। *বঙ্গভূমিকা*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯।

সেন, রংগলাল। *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস*। পুনর্মুদ্রণ। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭।

সেন, সত্যেন। *বিদ্রোহী কৈবর্ত*। ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৬৯।

সেন, সুজিত সম্পা.। *জাতপাতের রাজনীতি*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৯।

হাবিবুর রহমান। *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮।

হালদার, ত্রিলোকনাথ। *মাহিষ্য ও মাহিষ্যযাজী গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ পরিচয়*। চব্বিশ পরগনা: খাড়ী, ১৯১১।

হুমায়ূন আহমেদ। *মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসসমূহ*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৫।

হোসেন, শাহানারা। *প্রাচীন বাংলা ইতিহাস*। রাজশাহী: আইবিএস. ২০১২।

হোসেন, সেলিনা। *উপন্যাসত্রয়ী*। ঢাকা: পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স, ২০১০।

Abercrombie, Nicholas et al. *Dictionary of Sociology.* England: Penguin Books, 1994.

Ambedkar, B.R. *The Untouchables.* Delhi: Prentice Hall of India Pvt. Ltd., 1977.

Anderson & Parker. *Socioty: Its Organization and Operation*. New Delhi: Affiliated East-West Press Pvt. Ltd., 1966.

Atal, Yogesh. *Building a Nation.* 1981; New Delhi: Abhinav Publications, Edition 2004.

Baili, F. *G. Caste and the Economic Frontier: A Village in Highland Oridisa.* Manchester: University Press, 1957.

Baines, Athelstane. *Ethnography (Castes and Tribes).* Strassburg: Trubner, 1912.

Bandopadhayay, Shekhar. *Caste, Culture and Hegemony: Social Dominance in Colonial Bengal*. New Delhi: Sage Publications India Pvt. Ltd, 2004.

———. *Caste, Politics and the Raj, Bengal 1872-1937*. Kalkata: K. P. Bagchi, 1990.

———. *Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namasudras of Bengal, 1872-1947*. 1997; New Delhi: Oxford University Press, 2011.

Banerjee-Dube, Ishita, (ed.), *Caste in History.* New Delhi: Oxford University Press, 2010.

Barua, S. L. *Early History of Kamarup*. 1st ed. Shilong, 1933.

———. *A Comprehensive History of Assam.* New Delhi, 1985.

Basu, Raj Sekhar, *Nandanar's Children; the Paraiyans' Tryst with Destiny, Tamil Nadu 1850-1956.* New Delhi: Sage Publications India Pvt. Ltd., 2011.

Basu, Swaraj, *Dynamics of a Caste Movement: The Rajbansis of North Bengal,*

1910-1947. New Delhi: Manohar, 2003.

Bayly, Susan, *The New Cambridge History of India, IV. 3, Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth Century to the Modern Age*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Bettelle, Andre. *Caste, Class and Power: Changing Pattern of Social Stratification in Tanjore Village*. Bombay: Oxford University Press, 1963.

Bhatt, Anil, *Caste, Class and Politics: An Empirical Profile of Social Stratification in Modern India*. Delhi: Manohar Book Service, 1975.

Bhatta Bhavadeva. *Prayaschitta Prakaranam*. Rajshahi: The Varendra Research Society, 1927.

Bhattacharya, Sabyasachi, *The Defining Moments in Bengal 1920-1947*. New Delhi: Oxford University Press, 2014.

Bhattacharyya, Buddhadeva, *Satyagrahas in Bengal, 1921-1939*. Kolkata: Minerva Associates Publications Pvt. Ltd., 1977.

Bordhon, Kalpana. *A River Called Titas*. Kolkata: Pragati Book, 1992.

Bose, Buddhadeb. *An Acre of Green Grass*. Kolkata: Papyrus Reprient Series II, 1982.

Bose, Nemai Sadhan, *Indian Awakening and Bengal*, Kolkata: Firma KLM Private Limited, 1990.

Bose, Nirmal Kumar. *Society and Politics in India: Essays in Comparative Perspective*. London: Athlon Press, 1991.

Bose, Sugata, *Agrarian Bengal: Economy, Social Structure and Politics, 1919-1947*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Bose, Sugata, *Mostly About Bengal: Essays in Modern South Asian History*. New Delhi: Manohar Publications, 1982.

Bottomore, T. B. Sociology. London: George Allen and Unwin Ltd, 1969.

Broomfield, J. H., *Elite Conflict in a Plural Society: Twentieth Century Bengal*. California: University of California Press, 1968.

Buchanan Hamilton. *General View of the History and Manner's of Kamarup, vol. 2*. Rangpur: S M Borua, 1985.

Cantile, Aundrey. *The Assamese*. London: Curzon Press Ltd., 1984.

Chakravarti, Ranabir. *Exploring Early India: Up to c. AD 1300*. New Delhi: Macmillan Publishers India Ltd., 2010.

Chakravarti, Uma. *Gendering Caste: Through a Feminist Lens*. Kolkata: Stree, 2009.

Chatterjee, Gouripada. *Midnapore: The Forerunner of India's Freedom Struggle.* Delhi: Mittal Publications, 1986.

Chatterjee, Joya. *Bengal divided: Hindu Communalism and partition 1932-47.* Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Chatterjee, Partha. *Bengal 1920-1947: The Land Question* Kolkata: K P Bagchi & Company, 1984.

———. *Empire & Nation: Essential Writings 1985-2005.* Ranikhet: Permanent Black, 2012.

Chattopadhyay, Bhaskar edited. *Culture of Bengal through the Ages: Some Aspects.* Burdwan: The University of Burdwan, 1988.

Das, B.M. *Comparative Study of Physical for Assamese Castes, Jogi, Hira, Kumar and Kaibarta.* Gouhati: Department of Anthropology, Gouhati University, 1980.

Das, Bhakta. *A Glimpse of the Scheduled Castes and their Socio-Economic Development in Assam.* Delhi: Omsons Publications, 1986.

Das, Pyari Mohan. *The Mahishyas*. Kolkata: The Buckland Press, 1909.

Dev, B. K. The *Early History and Growth of Calcutta*. 2nd ed. Kolkata, 1977.

Dev, Bimal J. and Lahiri, Dilip K. *Cosmogny of Caste and Social Mobility.* Delhi:Mittal Publications, 1984.

Devis Kingsley. *Human Society*. New York: The Mac. Millan Co., 1961.

Dhar, P.K. *Indian Economy : Its Growing Dimensions.* New Delhi: Kalyani Publishers, 1996.

Dirks, Nicholas B. *Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India.* Delhi: Permanent Black, 2006.

Dumont, Louis. *Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications.* Chicago: University of Chicago Press, 1980.

Dutt, N. K. *Origin and Growth of Caste in India.* Kolkata: Firma KLM Private Limited 1986.

Enthoven R. E. *The Tribes and Castes of Bombay*. Bombay, 1920-22.

Fuller, C. J. ed. *Caste Today*. New Delhi: Oxford University Press, 1996.

Gait, Sir Edward. *A History of Assam.* 1905; Guwahati: Lawyer's Book Stall, 1992.

Ganguly, Debjani. *Caste and Dalit Lifeworlds; Postcolonial Perspectives.* New Delhi: Orient Blackswan Private Limited, 2005.

Ghose, Bijon etal. *Bengali Fiction − A Paranomic View*. Kolkata: Prima

Publications, 1975.

Ghurye, G. S. *Caste and Class in India*. Bombay: Popular Book Depot, 1957.

Guha, Ranajit edited. *Subaltern Studies VI*: *Writings on South Asian History And Society*. New Delhi: Oxford University Press, 1992.

Gupta, Chitrarekha. *The Kayasthas: A Study in the Formation and Early History of a Caste*. Kolkata: K P Bagchi & Company, 1996.

Gupta, Dipankar ed. *Social Stratification*. New Delhi: Oxford University Press, 1992.

———. *Interrogating Caste: Understanding Hierarchy & Difference in Indian Society*. New Delhi: Penguin Books, 2000.

Gupta, Kanti Prasanna Sen. *The Christian Missionaries in Bengal*. Kolkata: Firma K. L. Mukhopadhayay, 1971.

Halpern, Goel M. *The Changing Village Community*. New Delhi: Prentice-Hall of India Private Ltd., 1969.

Hamilton, Buchanan. *General View of the History and Manner's of Kamarup; Vol.2*. Rangpur: S M Borua, 1985.

Hardgrave, Robert L. Jr., *The Nadars of Tamilnad: The Political Culture of a Community in Change*. Berkley: University of California Press, 1968.

Hossain, Shahanara. *Everyday Life in the Pala Empire*. Dhaka: Asiatic Society of Pakistan, 1968.

———. *History of Ancient Bengal*. Rajshahi: IBS, 2011.

Hunter, William Wilson. *A Statistical Account of Bengal*. Vol. II. London: Trubner & Co., 1875.

———. *A Statistical Account of Bengal*. Vol. III, Part II. Reprint; Kolkata: Government of West Bengal, 1997.

———. *A Statistical Account of Assam*. Vols. I & II. London: Trubner & Co., 1879.

———. *A Statistical Account of Bengal*. Vol. I, Part I. 1875; Reprint; Kolkata: Government of West Bengal, 1998.

———. *A Statistical Account of Bengal*. Vol. III, Part I. 1976; Reprint; Kolkata: Government of West Bengal, 1997.

———. *A Statistical Account of Bengal*. Vol. IV. 1977; Reprint; Delhi: D K Publishing House, 1973.

———. *A Statistical Account of Bengal*. Vol. IX. Reprint; Delhi: D K Publishing House, 1974.

———. *A Statistical Account of Bengal.* Vol. V. 1977; Reprint; Delhi: D K Publishing House, 1973.

———. *A Statistical Account of Bengal.* Vol. VII. Reprint; Delhi: D K Publishing House, 1974.

———. *A Statistical Account of Bengal.* Vol. VIII. Reprint; Delhi: D K Publishing House, 1974.

———. *The Annals of Rural Bengal.* 1868; Reprint; Kolkata: Government of West Bengal, 1996.

Hutton, J.H. *Caste in India.* London: Oxford University Press, 1961.

Inkeles, Alex. *What is Society?* New Delhi: Prentice – Hall of India Private Ltd., 1965.

Jaffrelot, Christophe. *Dr. Ambedkar and Untouchability,* Ranikhet: Permanent Black, 2012.

Jodhka, Surinder S. edited. *Caste*. New Delhi: Oxford University Press, 2012.

———. *Changing Caste: Ideology, Identity and Mobility*. New Delhi: Sage Publications India Pvt. Ltd, 2012.

Kapadia, K. M. *Marriage and Familly in India*. London: Oxford University Press, 1973.

Kaviraj, Sudipta, edited. *Politics in India*. New Delhi: Oxford University Press, 1999.

Ketkar, S. V. *History of Caste in India*. 1909; Reprint; Delhi: Low Price Publications, 1993.

Kitts, Eustace J. *A Compendium of the Castes and Tribes found in India. Reprint: Gurgaon: The Academic Press, 1982.*

Klass, Morton. *Caste: The Emergence of the South Asian Social System.* New Delhi: Manohar: 2004.

Kothari, Rajni edited. *Caste in Indian Politics*. Hyderabad: Orient Longman Limited, 1995.

Krishna, J. Radha. *Brahmin of India.* Allahabad: Chugh Publication, 1987.

Leach, E R. ed. *Aspects of Caste in South India, Ceylon and North-West Pakistan.* Cambridge: Cambridge University Press, 1960.

Majumdar, R. C. ed. *The Ramacaritam.* Rajshahi: The Varendra Research Museum, 1939.

———. *History of Bengal,* Vol. 1. Dhaka: History of Bengal Publication Committee, 1963.

Malinowski, B. *Magic, Science and Religion and other Essay*. New York: 1948.

Melvin M. Tumin. *Social Statification: The forms functions and inequality*. New Delhi: The prentice Hall of India, 1994.

Metcalf, Thomas R. *The New Cambridge History of India*, Vol. III, Part IV: Idologies of the Raj. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Mukherjee, S. N. *Calcutta: Essays in Urban History*. Kolkata: Subarnarekha, 1993.

Nivedita. *The Master I Saw Him.* London and New York: Longmans green and co., 1910.

O' Mally, L.S.S. *Indian Caste Customs.* Cambridge, 1932.

O'Hanlon, Rosalind. Caste, *Conflict and Ideology: Mahatma Jatirao Fulle and Low Caste Protest in 19th Century Wesrern India.* Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Ogburn and Nimkoff. *A Handbook of Sociology*. London: Routledge and Kegan Paul Ltd., 1960.

Omvet, Gail. *Cultural Revolt in Colonial Society: The Non-Brahman Movement in Western India, 1873-1930*. Bombay: Sciencetific Socialist education trust, 1976.

Panchanandikar, K. C. and J. *Determinants of Social Stucture and Social Change in India.* Bombay, 1970.

Phekhanov, G. *Art and Social Life*. Moscow: Foreign Language Publishing House, 1957.

Pitirim A. Sorokin. *Social and Cultural Mobility*. Illinois: The Free Press of Glencoe, 1959.

Quigley, Declan. *The Interpretation of Caste.* New York: Oxford University Press, 1993.

Ray, Rajat Kanti. *Social Conflict and Political Unrest in Bengal*. Delhi: Oxford University Press, 1984.

Ray, Ratnalekha. *Change in Bengal Agrarian Society c. 1760-1850.* New Delhi: Manohar: 1979.

Risley, H. H. *Tribes and Castes of Bengal.* Kolkata: Firma Mukhopadhyay, 1891.

———. *The People of India*. 1915; Reprint; Delhi: Low Price Publications, 2003.

Roy, Monomohan. *Some Notes on Rajbanshi Caste*. Rangpur, 1902.

Ryan, Bryce. *Caste in Modern Ceylon*. New Jersey: Rutgers University, 1953.

Saha, K.C. *Fisheries of West Bengal.* Kolkata: West Bengal Govt. Press, 1970.

Sanyal, Hitesranjan. *Social Mobility in Bengal*. Kolkata: Papyrus, 1981.

Sarkar, Sumit and Tanika Sarkar edited. *Caste in Modern India: A Reader*. Ranikhet: Permanent Black, 2014.

Sarkar, Sumit. *Modern India.* Madras: Macmillan India Limited, 1996.

———. *Writing Social History.* New Delhi: Oxford University Press, 1998.

———. *Beyond Nationalist Frames: Relocating Postmodernism, Hindutva, History*. Delhi: Permanent Black, 2007.

Sarker, Profulla C. *Qualitative Research in Multidiciplinary Perspective*. Second edition. Dhaka: Mother's Publications, 2017.

———. *Social Structure and Fertility Behavior: A Cross-Cultural Study.* Second edition. Dhaka: Mother's Publications, 2017.

———. *Undestanding Social Problems and Policies*. Dhaka: Mother's Publications, 2017. Second edition.

Sarma, Jyotirmoyee. *Caste Dynamics among the Bengali Hindus.* Kolkata: Firma KLM Private Limited, 1980.

Sen. Amiya P. ed. *Social and Religious Reform: The Hindus of British India*. New Delhi: Oxford University Press, 2005.

Shah, Ghanshyam edited. *Caste and Democratic Politics in India.* Delhi: Permanent Black, 2008.

Sharma, K.L. *Social Stratification and Mobility*. Jaipur: Rawat Publications, 1994.

———. ed. *Caste and Class in India.* Reprint, New Delhi, 2005.

Sharma, R. S. *India's Ancient Past*. New Delhi: Oxford University Press, 2000.

———. *Early Medieval Indian Society: A Study in Feudalisation.* Kolkata: Orient Longman Private Limited, 2007.

Shyamlal. *From higher caste to lower caste*. Delhi: Rawat Publication, 1997.

Silverberg, James. Social Mobility in the Caste System in India. The Hegue: Mutton, 1968.

Singer, Milton and Bernard S. Cohn edited. *An Anthropologist among the Historians and Other Essays.* New Delhi: Oxford University Press, 1987.

———. *Colonialism and Its Forms of Knowledge; The British in India.* Princeton: Princeton University Press, 1996.

———. *Structure & Change in Indian Society.* Chicago: Aldine Publishing Company, 1968.

Singh, Yogendra. *Social Stratification and Change in India.* New Delhi: Manohar: 1997.

Srinivas, M. N. *Religion and Society among the Coorgs of South India.* London: Oxford, 1952.

———. *Caste in Modern India and other Essays.* Bombay: Asia Publishig House, 1962.

———. *Social Change in Modern India.* Bombay: Orient Longman, 1972.

———. *The Cohesive Role of Sanskritization and Other Essays.* New Delhi: Oxford University Press, 1989.

Tarkalankara, Mahamahopadhaya Chandrakanta edited. *Grihyasangraha*. Kolkata: Asiatic Society, 1939.

Taylor, James. *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca.* Kolkata: G. H. Huttmann Millitary Orphan Press, 1840.

Thakur, Dinanath. *History of Scheduled Caste.* New Delhi: Dimond Publication, 1986.

Thapar, Romila. *From Lineage to State: Social Formations in the Mid-First Millennium B.C in the Ganga Valley*. New Delhi: Oxford University Press, 2006.

Winternitz, M. edited, *The Apastambiya Grihyasutra*. Vienna: Alfred Holder, 1887.

Wise, M. D. James *Notes on the Races, Castes and trades of Eastern Bengal*. London: Harrison and Sons, 1883.

Zaliot, Alianore. *Caste in Indian Politics.* New Delhi, 1973.

২.২ প্রবন্ধ

বর্মণ, সন্তোষ কুমার। "চব্বিশ পরগনার তেভাগা আন্দোলন"। *দিশারী*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতি, ২০০২।

ভদ্র, গৌতম এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পা.। "নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার ইতিহাস।" পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পা., *প্রজা ও তন্ত্র*। ২য় সং; কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০০৫।

রায়, সুরঞ্জন। "পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের উৎস সন্ধান।" *গণমুক্তি: পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংখ্যা*। ২০০৯।

সরকার, স্বরোচিষ। "মানিক বন্দোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে নিম্নশ্রেণীর চরিত্র।" *বাংলা একাডেমি পত্রিকা, কার্তিক-চৈত্র সংখ্যা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

———। "অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি।" *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, পঞ্চদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা। ১৯৯৭।

———। "লোকনাট্য গাজীর গান: শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা।" *আইবিএস জার্নাল*, ১২তম সংখ্যা, ২০০৫।

———। "নমঃশূদ্রের উৎস সন্ধান।" *গণমুক্তি: নমঃশূদ্রের উৎস সন্ধান সংখ্যা*। ২০০৬।

———। "হরিচাঁদ ঠাকুরের বর্ণবাদ বিরোধী চিন্তা।" *মতুয়া মাহাত্ম্য*। যশোর: সার্বজনীন শ্রী শ্রী হরি-গুরুচাঁদ মন্দির, ২০১৭।

সাহা, সনৎকুমার। "নিম্নবর্গের খতিয়ান: আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রতারণা।" সনৎকুমার সাহা। *কথায় ও কথার পিঠে*। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৮।

Galanter, Marc. "Law and Caste in Modern India," in *Asian Survey*, Vol. III, No. 11. November, 1963.

Mukherjee, Sib Sanker. "Rangpur Kshatriya Samiti-History of a Caste Organization." *Journal of the Institute of Bangladesh Studies.* Volume 17. 1994.

Pinch, W. R. "Reinventing Ramanand: Caste and History in Gangetic India." *Modern Asian Studies*, vol. 30.3. 1996.

Roy, Arundhuti. "The Doctor and the Saint." B.R. Ambedkar. *Annihilation of Caste*. New Delhi: Navayana Publishing, 2014.

Sarkar, Ichhamuddin. "Kaivarta Rebellion of Varendri: Exploring A New Dimension." *Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, volume 39, 2016.

Sinha, Surajit. "The Bhumij Kshatriya Social Movement in South Manbhum." *Bulletin of the Department of Anthropology*, Vol. VIII, No. 2. July, 1959.

Sinha, Surjit and R. K. Bhattacharya. "Bhadrolok and Chotolok in Rural Areas of Bengal." *Sociological Bulletin.* Kalkata, 1969.

Soazberge, Joseph E. "Caste Regions in the North Indian Plains." *Structure and Change in Rural Society.* Chicago, 1968.

Thapar, Romila. "The Theory of Aryan Race and India: History and Politics." *Social Scientist*, VoL. 24, Nos. 1-3, Jan-Mar, 1996.

২.৪ অভিসন্দর্ভ

জলদাস, হরিশংকর। "নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্ত জনজীবন।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭।

সরকার, দিব্যদ্যুতি। "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী সমস্যা: প্রেক্ষাপট, ব্যবস্থাপনা ও ভূ-রাজনীতি।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।

A. B. M. Iqbal, Kazi. "The Background and the Role of the Various Interest

Groups in the Abolition of the Zamindari System in Bengal.” MPhil Thesis, Sociology, Dhaka University, 1987.

Baidya, Vinod Kumar. “Social Mobility in Scheduled Castes: A Sociological Study in Ballia Districts (U.P).” PhD Dissertation, Mahatma Gandhi Kashi Vidhyapeet, Varanasi, 1999.

Bandyopadhayay, Sekhar. “Social Mobility in Bengal in the Late Nineteenth and the Early Twentieth Centuries, PhD Dissertation, University of Calcutta, 1985.

Begum, Selina. “The Marma an Ethnographic Study of a Hill People in Bangladesh.” PhD Dissertation, Sociology, Dhaka University, 1990.

Biswas, Prasenjit. “Social Mobility and the Dynamics of Caste; The Mahishyas of South-Western Bengal (1901-1931).” PhD Dissertation, University of Calcutta, 2016.

Borah, Gitali. “Continuity and Changes in Economy among the Kaibartas of Kapahua and Nakapahua village in Lakhimpur District, Assam.” PhD Dissertation, Gauhati University, 2015.

Das, Deepon. “Politics of Mobilization among the Scheduled Castes in Assam.” PhD Dissertation, Dibrugarh University, Assam, 2015.

Das, Protima. “An Ethnographic Study of the Tea Plantation Workers of Bangladesh.” PhD Dissertation, Anthropology, Dhaka University, 2010.

Deka, Utpal. “Economic Life Reflected in the Folklore of the Kaibarta Community of Undivided Kamrup District of Assam.” PhD Dissertation, Gauhati University, 2013.

Haque, Md Chirazul. “A Socio-Cultural Study of the Kaibartta Community of Nalbari District with Special Reference to Fish Lore and Fishing Practices.” PhD Dissertation, University of Science and Technology, Meghalaya, 2017.

Kalita, Bhanitasri. “A Study on Occupational Change among the Kaibartas and Banias of Barpeta Town, Assam.” PhD Dissertation, University of Gauhati, 2015.

Kumar, Rakesh, “Social Mobility among Backward Castes in Western U.P.: A Sociological Study.” PhD Dissertation, CH. Charan Singh University, Meerat, 2002.

Sarker, Profulla Chandra. “Aspects of Caste and Social Structure in a Rural Community of Bangladesh.” M.Phil. Thesis, IBS, Rajshahi University, 1976.

পরিশিষ্ট ১

কয়েকজন সাক্ষাৎকারদাতার কেস স্টাডি

এই গবেষণায় সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে প্রধানত বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কৈবর্ত ও মাহিষ্য এই দুই জাতিবর্ণের ব্যক্তিদের নিকট থেকে। তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় বয়স্ক ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ পুরোহিত, জাতিবর্ণ বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাহিত্যিকসহ শতাধিক ব্যক্তির নিকট থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এঁদের মধ্য থেকে মাত্র ৮ জন সাক্ষাৎকারদাতার কেস স্টাডি এখানে তুলে ধরা হলো। তাঁদের নাম পবিত্র সরকার, হরিশংকর জলদাস, রমাকান্ত দাস, ননীগোপাল দাস, মিনা রানী মণ্ডল, দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়, সুবালা দাস, মলয় সরকার। তাঁরা যথাক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, নওগাঁ, মেদিনীপুর, রাজশাহী অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করেন। যাদের মধ্যে তিনজন মাহিষ্য (চাষি কৈবর্ত), একজন জেলে কৈবর্ত, একজন গুড়ি কৈবর্ত, একজন মালো (কৈবর্ত), একজন পাটনি (কৈবর্ত), একজন তুঁতে কৈবর্ত জাতিবর্ণকে প্রতিনিধিত্ব করেন।

পরিশিষ্ট ১

কেস স্টাডি ১

জাতিবর্ণ পরিচয়: মাহিষ্য (চাষি কৈবর্ত)

ব্যক্তির নাম: পবিত্র সরকার

এলাকা: ঢাকা

বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, ভাষাতাত্ত্বিক ও গবেষক পবিত্র সরকার। তাঁর জন্ম ১৯৩৭ সালের ২৮ মার্চ ঢাকার ধামরাইয়ে। ১৯৪৭ সালে তাঁর পরিবার পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেছেন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফুলব্রাইট স্কলারশিপ পেয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। চাকরিজীবন শুরু করেন বঙ্গবাসী কলেজে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে। এরপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক থেকে অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতা করেন ১৯৬৩-১৯৭৪ এবং ১৯৭৬-১৯৯০ এই দুই মেয়াদে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন ১৯৯০ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উচ্চশিক্ষা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ছয় বছর। এরপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭ বছর শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৬৪টি, সম্পাদনা গ্রন্থ ৪৫টি। এছাড়া প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, গল্প, কবিতা ও নাটক লিখেছেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

পবিত্র সরকার মাহিষ্য জাতিবর্ণে জন্মগ্রহণ করেছেন। জন্মগ্রহণের তিন মাস পরেই তাঁর পিসিমা তাঁকে দত্তক নেন। স্কুলে যাওয়ার পর থেকে তিনি তাঁর আত্মপরিচয় সম্পর্কে জানতে শুরু করেন। একটু বড়ো হলে জানতে পারলেন হিন্দুদের মধ্যে স্তরগত ভয়ংকর একটা সিঁড়ি রয়েছে। যে সিঁড়িতে মাহিষ্যদের অবস্থান নিচের দিকে। তাদের নিচেও আরও জাতিবর্ণ রয়েছে। পবিত্র সরকারের জন্ম সাভারের বলিহারপুরে হলেও বড়ো হয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ি পঞ্চাশ গ্রামে। ১১ বছর

পর্যন্ত তিনি এখানেই ছিলেন। ধামুইরহাট হার্ডিঞ্জ স্কুলে পড়ালেখার সময় বন্ধুরা কায়স্থ পরিচয় দিত। তাদের কাছ থেকে তিনি প্রথম জানতে পারেন কায়স্থরাও শূদ্র কিন্তু তারপরও তাদের স্থান মাহিষ্যদের উপরে। তখনও জাতিবর্ণের বিষয়টি ঠিক বুঝতেন না। স্কুলে কেউ কেউ তাঁকে 'কৈবর্তের পোলা,' 'মাহিষ্যের পোলা' বলে সম্বোধন করতেন। বিদ্যালয়ের দুই একজন শিক্ষক একটু অবজ্ঞা করলেও সাভারের গ্রামে যতদিন ছিলেন ততদিন তেমন কোনো অবজ্ঞার শিকার হননি তিনি। তবে মাহিষ্যরা আবার গ্রামে বসবাসরত মুচিদের অবজ্ঞা করতো।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় পবিত্র সরকারের পরিবার পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরে স্থানান্তরিত হন। সেখানে যাওয়ার পরে কেউ জাতিবর্ণের কথা জিজ্ঞেস করলে তারা নিজেদের কায়স্থ বলে পরিচয় দিতেন। পবিত্র সরকার তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন দেশভাগের ফলে অজস্র লোক তাদের জাত বদলেছে, পদবি বদলেছে। এমনকি ব্রাহ্মণ পরিচয়ও নিয়েছে। তাঁর পিসিমা-পিসামশায় এবং পিসিত ভাইয়েরা রায় পদবি নিয়েছিলো। কিন্তু পবিত্র সরকারের পরিবার তাদের পদবি পরিবর্তন করেননি।

মেদিনীপুর জেলা মাহিষ্যপ্রধান হওয়াতে সেখানে মাহিষ্যদের তেমন জাতিভেদের শিকার হতে হয়নি। মেদিনীপুর এসেই পবিত্র সরকার জানতে পারলেন মাহিষ্য একটি বৃহৎ জাতিবর্ণ। তাদের গ্রামের এক ব্যক্তির কলকাতায় যাতায়ত ছিলো। তার মাধ্যমে জানতে পারেন কলকাতায় মাহিষ্যদের সমিতি রয়েছে। সেই ব্যক্তিই পবিত্র সরকারকে 'মাহিষ্য সমাজ' পত্রিকার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। গ্রামের দুই-একজন মাহিষ্য নেতার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছেন, 'মাহিষ্য সমাজ' পত্রিকাও কয়েকবার পড়েছেন। কিন্তু তিনি কখনো মাহিষ্য সমিতির সাথে যুক্ত হননি।

ছাত্রজীবনে ভালো ছাত্র ছিলেন বলে শিক্ষকরা তাঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং বন্ধু-বান্ধবরা তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। পাড়াতে পরিচয় ছিলো ভালো ছেলে হিসেবে এবং স্কুল কলেজে ভালো ছাত্র হিসেবে এজন্য জাতিবর্ণ পরিচয়টা সেভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়ায়নি। জাতিবর্ণগত বৈষম্যের মধ্যেও পড়তে হয়নি। কিন্তু সমস্যাটা হয়েছিলো বিয়ের সময়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার সময়ে একজনকে তাঁর খুব ভালো লেগেছিলো। তিনি বিক্রমপুরী এক ব্রাহ্মণকন্যা নাম মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়। মৈত্রেয়ী দেবীর পরিবার অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিলো। সেসময়ে ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য মেয়েকে পছন্দ হলেও বলার উপায় ছিলো না। তখন তিনি তাঁর জাতিবর্ণের বিষয়ে আত্মসচেতন হলেন। কারণ সামাজিকভাবে ব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যাদা মাহিষ্যদের থেকে অনেক উপরে। যদিও মাহিষ্যরা সাধারণ হিন্দু হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলো, তারপরও তাঁর মনে হতো জন্মটা ব্রাহ্মণের ঘরে হলেই বোধহয় ভালো হতো। মৈত্রেয়ী দেবীও তাঁর প্রেমে পড়লেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ অনার্সে পবিত্র সরকার প্রথম হলেন। এরপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা শুরু করলেন। এ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মৈত্রেয়ী দেবীর পরিবার কিছুতেই এই অসবর্ণ বিবাহে সম্মত হচ্ছিলেন না। উল্লেখ্য, ষাট-সত্তরের দশকে সমাজে

অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন ছিলো না। হলেও খুব কম হতো। অসবর্ণ বিবাহ প্রথম শুরু হয় কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে।

মৈত্রেয়ী দেবীর বাবার যুক্তি ছিলো, ছেলে শুধু অব্রাহ্মণ নয় একেবারে মাহিষ্য। ১৯৬১-৬৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘদিন বিয়ে নিয়ে আলোচনা হয়। মৈত্রেয়ী দেবীর মেজো বোন তাঁর বাবাকে রাজি করাতে সক্ষম হন। এক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি ছিলো, অব্রাহ্মণ আবার কি? ছেলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ-তে প্রথম হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছে, সে তো পণ্ডিত। অবশেষে পবিত্র সরকার এবং মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। যদিও মৈত্রেয়ী দেবীর বাবা মেয়েকে সম্প্রদান করেননি, তাঁর বড়ো ভাই তাঁকে সম্প্রদান করেন। পবিত্র সরকারের সম্পূর্ণ জীবনে এই একটিবার জাতিবর্ণ নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন। এরপর আর কখনো জাতিবর্ণ পরিচয় তাঁর জীবনে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

পবিত্র সরকার মনে করেন মানুষের জীবনে যা ঘটে সাহিত্যে তারই প্রতিফলন ঘটে। তিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসের উদাহরণ দেন। উপন্যাসের মূল চরিত্র একজন মাহিষ্য শিক্ষক। সে গ্রামের শিশুদের শিক্ষা দিতে গিয়ে সমাজের মানুষের নানা অত্যাচারের শিকার হয়। পবিত্র সরকারের মতে, তারাশঙ্কর উপন্যাসের চরিত্রটিকে অত্যন্ত মানবীয় এবং সহানুভূতিশীল করে লিখেছিলেন। কিন্তু তারপরও এই উপন্যাসের জন্য হাওড়ার মাহিষ্য সমাজ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাস থেকে নামিয়ে লাঞ্ছিত করে।

পবিত্র সরকার মনে করেন, শিক্ষা হলো সংস্কৃতায়নের একটি প্রধান উপাদান। মানুষ শিক্ষিত হওয়ার মধ্য দিয়ে চাকরি জীবনে প্রবেশ করে। অন্যান্য জাতিবর্ণের ভাষা-সংস্কৃতি পর্যবেক্ষণ করে। তারপর নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের মাধ্যমে সংস্কৃতায়নের চক্রে প্রবেশ করে। এভাবে শিক্ষার অগ্রগতি সংস্কৃতায়নকে ত্বরান্বিত করে।

পবিত্র সরকারের যমজ বোন লীলা সরকার। পড়াশুনায় লীলা সরকার যথেষ্ট ভালো ছিলেন। অথচ শিক্ষার সুযোগের অভাবে তাঁর বোন লীলা চতুর্থ শ্রেণির পরে আর পড়তে পারেননি। দেশভাগের পরে পবিত্র সরকারের পিসির পরিবার মেদিনীপুরে চলে যান। তাঁর পিতা-মাতাও ভারতের আলীপুরদুয়ার জেলায় চলে যান। সেসময়ে তাঁর বোনের বয়স ছিলো এগারো বছর। ভারতের অনিশ্চিত ভবিষ্যতে এগারো বছরের মেয়েকে নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। তাই সাভারের একটি পরিবারে লীলা সরকারের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। বন্ধ হয়ে যায় সম্ভাবনাময় এক কিশোরীর পড়াশোনা। যমজ হওয়া সত্ত্বেও এক বোন বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন আর এক ভাই ধীরে ধীরে সাফল্যের শিখরে আরোহন করেছেন। শিক্ষার সুযোগের জন্যই এপার-ওপার বাংলার বিখ্যাত পবিত্র সরকার হয়ে উঠেছেন। অধ্যবসায় আর সুযোগের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে তিনি জীবনে সফল হয়েছেন। তিনি মনে করেন, যদি দেশভাগ না হতো, শিক্ষার সুযোগ পেতো তাহলে লীলা

হয়তো অনেক ভালো কিছু করতে পারতো। শিক্ষা মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকেও পরিবর্তন করে দেয়। তাই শিক্ষা যতো বেশি বিস্তার লাভ করছে সমাজ তত বেশি পরিবর্তিত হচ্ছে।

পবিত্র সরকার শিক্ষার পাশাপাশি রাজনীতিকে সংস্কৃতায়নের আর একটি বড়ো কারণ বলে মনে করেন। বিশেষ করে সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতা ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করে। যেমন, ভারতে কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি। বীরেন্দ্র শাসমল ভারতের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা, যিনি মাহিষ্য ছিলেন। পবিত্র সরকারও একসময় কমিউনিস্ট রাজনীতি করতেন। রাজনীতি বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সামাজিক জঙ্গমতা সৃষ্টি করে। তিনি মনে করেন রাজনীতি, প্রতিষ্ঠা, চিন্তাগত সাফল্য ব্যক্তি তথা সমাজজীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। আর এ সবকিছুর মূলে হলো শিক্ষা। নাটক করতেন, কমিউনিস্ট পার্টি করতেন, রাজনীতির কারণে বিয়ে করতে পেরেছিলেন।

পবিত্র সরকারের মতে, পৌরাণিক বা বৈদিক দেবদেবীর পূজাতে সংস্কৃতায়ন রয়েছে। কিন্তু লৌকিক পূজাতে সংস্কৃতায়ন নেই। যেমন গ্রামে মেয়েরা ত্রিনাথের পূজা করে। ত্রিনাথ হলেন শিব ঠাকুর। তাঁর পূজায় গাঁজা উৎসর্গ করা হয়। যারা পূজা করে তাদের মধ্যে অনেকে নিজেরাও সেবন করে। এতে সংস্কৃতায়নের কোনো ব্যাপার নেই। মেয়েরা যখন কোনো ব্রত পালন করে, পাঁচালী পাঠ করে, সেখানে ব্রাহ্মণের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু যখন দুর্গাপূজা হচ্ছে, তখন ব্রাহ্মণ প্রয়োজন পড়ে। ব্রাহ্মণ বৈদিক মন্ত্র পাঠ করে, সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে পূজা করে। এর মধ্যে সংস্কৃতায়ন রয়েছে। এসব বিষয় থেকে বোঝা যায়, বাংলার জনজাতিগুলোর মধ্যে পূর্বে লৌকিক পূজার প্রচলন ছিলো। এরপর সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পৌরাণিক পূজা যেমন, কালীপূজা, দুর্গাপূজা প্রভৃতি শুরু হয়েছে।

পবিত্র সরকারের মতে, সমাজে সংস্কৃতায়ন কখনো প্রবলভাবে হচ্ছে আবার কখনো মৃদুভাবে হচ্ছে। তবে সময়ের সাথে সাথে সংস্কৃতায়নের প্রাবল্য বেড়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে এটা আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। আগের তুলায় দেবতা এখন অনেক বেড়ে গেছে। ভারতে এখন দেবতায় দেবতায় সয়লাব। যেসব পূজা বাঙালিরা করতো না এখন সেসব পূজা করছে। মারাঠিরা গণেশ পূজা করে, বাঙালিদের মধ্যে আগে গণেশ পূজা ছিলো না। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গণেশ পূজা করা হচ্ছে। আনুমানিক ১৯৭৮ সালে 'সন্তোষী মা' নামে একটা হিন্দি সিনেমা তৈরি হয়। এখন প্রতি শুক্রবার ঘরে ঘরে নারীরা সন্তোষী মাতার ব্রত করছে। এটা অনেকটা লক্ষ্মী পূজার মতো। এই ব্রতে ব্রাহ্মণ লাগে না কিন্তু ব্রাহ্মণরাই এ পূজা সমাজে চালু করেছে। নিয়ে এসেছে পৌরাণিক কাহিনী। এই সন্তোষী মা কে? সন্তোষী মা হলেন গণেশের কন্যা। আগে সরস্বতী পূজা শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হতো। আর এখন বাড়ি বাড়ি হচ্ছে। এই পূজার দিনে পুরোহিতদের কদর এতই বেড়ে যায় যে সেদিন তাদের খুঁজে পাওয়া কঠিন। এভাবে দেবদেবীর পূজার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতায়ন ঘটছে। তিনি মতে, এখনকার পূজাতে আগের মতো ভক্তি চোখে পড়ে না। ভক্তির জায়গা দখল করেছে প্রদর্শন মনোভাব। আলোকসজ্জা, ডেকোরেশন নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে।

এখন পূজার মধ্যে হিন্দি গান, ইংরেজি গান বাজিয়ে উদ্দাম নৃত্য করে। এ ধরনের উগ্র সংস্কৃতায়নও হচ্ছে।

পবিত্র সরকার মনে করেন, সংস্কৃতায়নের প্রভাব সবথেকে বেশি নারীদের উপর। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের নিয়ন্ত্রণ করে পুরুষরা। যেহেতু তাদের আয়-রোজগার ছিলো না, নির্ভর করতে হতো পুরুষদের উপর। এজন্য নারীদের স্বাধীনতা আর আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তির পথ হিসেবে তারা ধর্মের আশ্রয় নেয়। দেবদেবীদের সাধনার মাধ্যমে তারা সমস্যা সমাধানের উপায় পেতে চায়। বিভিন্ন ধরনের পূজার্চনার মধ্যে নারীরা নিজেদের নিরাপত্তা খোঁজে। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটু অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে নতুন নতুন পূজা সমাজে নিয়ে এসেছে হয় নারীরা। মনসার পূজা নিয়ে এসেছে নারীরা, চণ্ডী পূজাও নিয়ে এসেছে নারীরা। আর এগুলোকে পৌরাণিকতা দিয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। তাঁর মতে, সারা বছরে নারীরা কী কী ব্রত পালন করে, কী কী পূজা করে এর মধ্য দিয়েও সমাজে কতটুকু ব্রাহ্মণ্য প্রভাব রয়েছে, অথবা কতটুকু সংস্কৃতায়ন হয়েছে তা বোঝা সম্ভব।

পবিত্র সরকার মনে করেন, হিন্দু সমাজে দীক্ষাগ্রহণ সংস্কৃতায়নের ফলে এসেছে। বিশেষ করে গুরুরা বিবাহিত পুরুষ-মহিলাদের কানে সংস্কৃত মন্ত্র দিয়ে থাকেন। কিসের মন্ত্র, মন্ত্রের অর্থ কি এসব বুঝুক না বুঝুক সবার নিতেই হবে। যারা এসব গুরু ধরেন না বা মন্ত্র নেন না তারা সমাজে ব্রাত্য।

পবিত্র সরকারের মতে, সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতায়ন একেবারেই নেতিবাচক। তিনি মনে করেন, সম্ভাবনার দিক থেকে সব মানুষ সমান। কোনো অলৌকিকতা মানুষের জীবনে কোনো পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে না।

কেস স্টাডি ২
জাতিবর্ণ পরিচয়: জেলে কৈবর্ত
ব্যক্তির নাম: হরিশংকর জলদাস
এলাকা: চট্টগ্রাম

হরিশংকর জলদাস বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্যতম। জন্ম ৩ মে ১৯৫৩, চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গা জেলেপল্লীতে। দেবেন্দ্রলাল দে'র পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। এসএসসি পাশ করেন পতেঙ্গা উচ্চবিদ্যালয় থেকে ১৯৭১ সালে। এরপর চট্টগ্রাম কলেজ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া করেন। ২০০৭ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্ত জীবন' বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন সরকারি কলেজের শিক্ষক। সর্বশেষ চট্টগ্রাম সিটি কলেজের অধ্যাপক ও প্রিন্সিপাল হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। জীবনের প্রায় মধ্যাহ্নে সাহিত্য লিখতে শুরু করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস জলপুত্র, দহনকাল, কসবি, রঙ্গশালা, রামগোলাম, মোহনা ও আমি মৃণালিনী প্রভৃতি। সাহিত্যকর্মের জন্য পেয়েছেন আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, প্রথম আলো বর্ষসেরা বই পুরস্কার, ব্রাক ব্যাংক-সমকাল সাহিত্য পুরস্কার, মানবাধিকার সম্মাননা পদক ইত্যাদি। কথাসাহিত্যে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' পেয়েছেন ২০১২ সালে। ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য 'একুশে পদক' পেয়েছেন ২০১৯ সালে।

হরিশংকর জলদাস জেলে কৈবর্ত জাতিবর্ণে জন্মগ্রহণ করেছেন। পিতা যুধিষ্ঠির জলদাস, মাছ ধরা ও বিক্রি করা ছিলো তাঁর পেশা। এ পেশা তিনি পেয়েছিলেন বংশ পরম্পরায়। অন্যান্য জেলেদের সাথে এখানকার জেলেদের পার্থক্য হলো তারা বঙ্গোপসাগরে অর্থাৎ সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। হরিশংকর জলদাসের ঠাকুরদা চন্দ্রমণি সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েই মৃত্যুবরণ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর হরিশংকরের ঠাকুরমা পরানেশ্বরী মাছ কিনে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করে সংসার চালাতেন।

যদিও জেলে সমাজে নারীদের মাছ বিক্রি করার প্রচলন ছিলো না। হরিশংকর জলদাসের মায়ের নাম শুকতারা জলদাসী, গৃহিণী ছিলেন, তিনিও জেলে পরিবারের সন্তান ছিলেন, তাঁর বাবা ছিলেন জেলেদের সরদার/বহদ্দার। যাদের নিজেদের জাল ও মাছ ধরার নৌকা থাকতো তাদের বহদ্দার বলা হতো। তাই জেলে হলেও আর্থিকভাবে সচ্ছল ছিলো তাঁর পরিবার।

মাছ ধরা প্রধান পেশা হলেও হরিশংকরের ঠাকুরদা চন্দ্রমণি কিছুদিনের জন্য অন্য পেশা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯১৭-১৯ সালের দিকে তিনি ব্রিটিশ বার্মা অয়েল কোম্পানিকে সুইপারের (অফিস ঝাড়ু দেওয়া, চেয়ার-টেবিল মোছা ইত্যাদি) কাজ করেছিলেন। বেতন ভালো ছিলো বলে পরিবারে কিছুদিনের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য এসেছিলো। কিন্তু জেলেদের দুঃসাহসিক অভিযানের টানে আবার পিতৃপেশায় ফিরে যান। সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েই তাঁর মৃত্যু হয়।

ঠাকুরদার কাছ থেকে শোনা গল্পে হরিশংকর জেনেছেন, ব্রিটিশ আমলে জেলেদের পোশাক ছিলো খুব সংক্ষিপ্ত। জেলেরা শুধু হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরতো, জল-ঘাম মোছার জন্য একটা গামছা থাকতো কোমরে বা গায়ে, ঊর্ধ্বাংশ থাকতো খালি। উৎসবে আনন্দে তারা মোটা চাদর দিয়ে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ ঢাকতো। জেলেদের ভাষায়, পা-পর্যন্ত ধুতি পড়ে বাবুরা। জেলেদের পূর্বের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে অন্যান্য বাঙালিদের সাথে জেলেদের পোশাকের কোনো পার্থক্য নেই।

হরিশংকর জলদাসের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, চট্টগ্রামে জেলেদের সামাজিক মর্যাদা এতটাই কম যে তাঁদের হিন্দুও মনে করা হয় না। সমাজে তারা শুধু জাইল্লা বলে পরিচিত। জীবনের বিভিন্ন সময়ে বহুবার তিনি এরকম কঠিন সামাজিক লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন। উত্তর পতেঙ্গার জেলে পাড়াটির অবস্থান হিন্দু পাড়া থেকে দূরে। আর সাধারণ হিন্দুরা জেলেদের অস্পৃশ্য বলে মনে করে। সাধারণ হিন্দুদের কোনো উৎসব বা পার্বণে জেলেরা অংশগ্রহণ করতে পারতো না। উনিশ-বিশ শতকে জেলে কৈবর্ত সমাজে শুধু মনসাপূজার প্রচলন ছিলো। বিশ শতকের শেষের দিকে কালীপূজা, দুর্গাপূজা এবং আরও পরে সরস্বতী প্রভৃতি পূজা আরম্ভ হয়।

জেলেপল্লীতে শিক্ষার হার খুব কম। এজন্য জেলে ছেলে-মেয়েদের খুব অল্প বয়সে বিয়ে ও জীবনসংগ্রাম শুরু করতে হয়। পিতামহের অকালমৃত্যুর জন্য হরিশংকরের পিতা যুধিষ্ঠির বেশিদূর পড়ালেখা করতে পারেননি। সংসারের হাল ধরার জন্য অল্প বয়সেই জেলেপেশা গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষা না থাকার জন্য এলাকার প্রতাপশালী শ্যামাচরণ জালিয়াতির মাধ্যমে হরিশংকরের পিতৃপুরুষের বেশকিছু ধানের জমি নিজের নামে আত্মসাৎ করে নেয়।

নিজের অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণ, সামাজিক লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় হরিশংকরের বাবা তাঁকে পাঠশালায় ভর্তি করেন। শুরু হতে থাকে হরিশংকরের প্রতিকূল পরিবেশ জয়। পরবর্তী কালে স্কুলে পড়তে গিয়ে হরিশংকর জেলেদের মধ্যে জেলে পরিচয়ের লুকানোর প্রবণতা লক্ষ করেন। তিনি খেয়াল করেন ক্লাস নাইনে রেজিস্ট্রেশনের সময় অধিকাংশ জেলে ‘জলদাস’ পদবি

ত্যাগ করে অন্য পদবি গ্রহণ করছে। জেলে পরিচয়ের সামাজিক অমর্যাদা থেকে এই পরিচয়ের সংকট তৈরি হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

হরিশংকরের বাবা ষাটোর্ধ্ব বয়সেও আট-নয় বছর বয়সের ব্রাহ্মণদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন। আবার রাস্তায় মেথর দেখিয়ে ছেলেকে বলতেন, এরা মেথর, এদের ছুঁতে নেই। হরিশংকর জলদাস তাঁর জীবনে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তা হলো, সাধারণ হিন্দুরা জেলেদের ঘৃণা করছে। এমনকি হালিক কৈবর্তরা জালিক কৈবর্তদের ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখছে। নিজেদের বড়ো করতে গিয়ে অন্যদের ছোটো করছে। এভাবেই হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতা টিকে রয়েছে। এক জাতিবর্ণ আরেক জাতিবর্ণকে অস্পৃশ্য করে রেখেছে। ফলে বাধ্য হয়ে তথাকথিত নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা পদবি পরিবর্তন করছে। নিজেদের জাতিবর্ণ পরিচয় লুকিয়ে রাখছে। জেলেরা নানা সময়ে বঞ্চিত হয়েছে শুধুমাত্র পদবির কারণে। তাই অপমান থেকে বাঁচার জন্য রায়, দাশগুপ্ত, সেনগুপ্ত ইত্যাদি পদবি গ্রহণ করছে।

হরিশংকর জলদাস বিসিএস ক্যাডার হয়েও শুধুমাত্র জেলে হওয়ার জন্য বাসাভাড়া পেতেন না। তবে তিনি মনে করেন, অস্পৃশ্যতা আগের তুলনায় বর্তমানে কিছুটা শিথিল হয়েছে। ছোটোবেলায় তিনি দেখেছেন কোনো হিন্দু বাড়িতে গেলে যে গ্লাসে তাঁকে জল খেতে দেওয়া হতো সে গ্লাসটি ফেলে দেওয়া হতো অথবা তা সম্ভব না হলে গ্লাসটি আঙুল দিয়ে ধরে সাথে সাথেই কলতলায় নিয়ে মেজে ধুয়ে তুলসীজল ছিটিয়ে পবিত্র করে নিতো। বর্তমানে শহরাঞ্চলে এর প্রচলন নেই, কিন্তু গ্রামে এখনও এই প্রচলন রয়েছে।

হরিশংকর মনে করেন, বাঙালিদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য – মাছে-ভাতে বাঙালি। এই মাছ আর ভাত যোগান দেয় কৈবর্তরা। অথচ সমাজে গালিটাও তাদের জন্যই রাখা হয়েছে। তাঁর ধারণা পৃথিবীতে প্রথম আহরণজীবী হলো জেলেরা। হিন্দুশাস্ত্রে দশ অবতারের প্রথম অবতার হলো মৎস্য। আসল কথা হলো প্রাচীনকালে মানুষের জীবিকার সাথে জড়িত ছিলো জল আর মাছ। সামাজিক ইতিহাসও তাই বলে। যাযাবর জীবন ত্যাগ করে মানুষ সমতলে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলো। সেক্ষেত্রে তারা বেছে নিলো জলের কাছাকাছি জায়গা। তাই পৃথিবীতে যতো রাজধানী আর বাণিজ্যালয় রয়েছে প্রায় সবগুলোই নদীর কাছে। আর তখন শুধু কৈবর্তরা নয় মানুষ মাত্রই এভাবে বেঁচে থাকতো।

শিক্ষিত জেলেদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাব লক্ষ করা যায়। এর কারণ জেলে কৈবর্ত সমাজের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার ক্ষোভ। হরিশংকর জলদাসের মধ্যেও হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদী মনোভাব রয়েছে। তাঁর মতে, এই প্রতিবাদ আচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতায়নের বিরুদ্ধে। হরিশংকর জলদাসের সাহিত্যকর্ম এর উদাহরণ।

বিভিন্ন জাতিবর্ণের নতুন নামপরিচয় এবং গোপনে মর্যাদা বৃদ্ধির আন্দোলনকেও তিনি ভালো চোখে দেখেন না। এক্ষেত্রে তাঁর প্রশ্ন, জাতিবর্ণগুলো আন্দোলন করছে, কাগজে-কলমে নতুন

পরিচয় গ্রহণ করছে কিন্তু ব্রাহ্মণরা বা ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কি ভেতর থেকে তাদের গ্রহণ করছে? চট্টগ্রামের চক্রবর্তী ব্রাহ্মণরা এখনও মনে করে, মাহিষ্যরা পূর্বে জেলে ছিলো। পরে যখন দেখলো মাছ ধরাকে সামাজিকভাবে হেয় মনে করা হয়, তখন তারা হাল চাষ শুরু করলো। এই আন্দোলন কি ব্রাহ্মণদের ভেতরের বিশ্বাসকে বদলে দিতে পেরেছে?

তাঁর ভাষায়, 'আমি বা আমরা আন্দোলন করে বিষয়টা ধরে রাখলাম, কিন্তু ব্রাহ্মণরা তো সেটা ভুলে যাচ্ছে না, তারা বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে তোমরা কারা? তোমাদের অবস্থান কি? তুমি মেথর, তুমি জেলে। দুই-একজন হরিশংকর জলদাসকে দিয়ে সমাজের অস্পৃশ্যতা দূর হবে না। ব্রাহ্মণদেরও এগিয়ে আসতে হবে, অস্পৃশ্যতার মানসিকতা ত্যাগ করে সকল বর্ণকে বুকে জড়িয়ে ধরতে হবে। ব্রাহ্মণদের আধিপত্যবাদী মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। যতক্ষণ ব্রাহ্মণদের পেটে ক্ষুধা, ততক্ষণ তারা হাত পেতে ভিক্ষা করে। পরে কোমরে টাকা বেঁধে বাড়ি নিয়ে তুলসীজল ছিটিয়ে পবিত্র করে নেয়। ব্রাহ্মণরা মুসলমানদের যতোটা না অস্পৃশ্য মনে করে তার থেকে বেশি অস্পৃশ্য মনে করে তথাকথিত নিম্ন শ্রেণির লোকদের। কৈবর্তদের হাতে দিয়ে তোলা ফুল দিয়ে পূজা করে না। ব্রাহ্মণরা তফসিলি হিন্দু বা শূদ্রদের হাতে খায় না। এভাবে এরাই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখে।

হরিশংকর জলদাস মনে করেন, বর্তমান তরুণদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদী মনোভাব গড়ে উঠছে। বর্তমানে সরস্বতী পূজাতে অনেক স্কুল-কলেজেই ব্রাহ্মণরা আসে না। ছেলেমেয়েরা নিজেই পুরোহিত দর্পণ দেখে পূজা করছে।

কেস স্টাডি ৩
জাতিবর্ণ পরিচয়: মালো কৈবর্ত
ব্যক্তির নাম: রমাকান্ত দাস
এলাকা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া

রমাকান্ত দাস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার হরিণবেড় গ্রামের অধিবাসী। রমাকান্ত দাস আনুমানিক ১৯২৫ সালে একটি মালো পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বংশানুক্রমিকভাবে তাঁর পরিবার তিতাস নদীতে মাছ ধরা এবং বিক্রি করার কাজ করতো। কিন্তু রমাকান্ত দাস পিতৃপুরুষের মতো মাছ ধরার কাজ করতেন না। ব্রিটিশ আমলেই কিছুটা লেখাপড়া করেছিলেন তিনি। প্রথম জীবনে প্রায় দশ বছর পঞ্চাশ টাকা বেতনে হরিণবেড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। এরপর বেশ কিছুদিন এলাকার মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের গ্রামটিতে পেশাগত বৈচিত্র্য খুব কম। কেউ কেউ সরাসরি মাছ না ধরলেও মাছের সাথে জড়িত ব্যবসা করেন। যেমন, শুঁটকি মাছের ব্যবসা।

হরিণবেড় গ্রামটিতে শিক্ষার হার খুব কম। বর্তমানে একটি প্রাথমিক এবং একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। রমাকান্ত দাস নিজে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। ১৯৪৩ সালে তাঁর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া কথা ছিলো কিন্তু আর দিতে পারেননি। তাঁর মতে, আর্থিক অভাব-অনটনের জন্য এখানকার জেলেরা কম বয়সেই লেখাপড়া বাদ দিয়ে জীবিকার প্রয়োজনে মাছ ধরা বা অন্য কোনো পেশায় চলে যায়। ফলে তার আর লেখাপড়া হয় না। আবার উল্টো দিক থেকে দেখলে শিক্ষিত হয় না বলেই তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। এখনও গ্রামটিতে হাতে গোনা চার-পাঁচ জন শিক্ষিত ছেলে খুঁজে বের করা যাবে। এর মধ্যে একজন আইনজীবী, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, একজন ব্র্যাকের অডিটর, একজন বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিসার আর একজন পশুচিকিৎসক। যারা একটু শিক্ষিত হচ্ছে, তাদের মধ্যে আবার গ্রাম ছেড়ে শহরে যাওয়ার প্রবণতা

রয়েছে। তবে যারা বিভিন্ন চাকরিতে যাচ্ছে জেলেদের কাছে সেটা অসাধ্য সাধনের মতো ব্যাপার বলে মনে করা হয়।

রমাকান্ত দাসের মতে, নাসিরনগরের অধিকাংশ জেলেদের চাষের কোনো জমি নেই। অল্প কয়েকজন জেলের বসতভিটা রয়েছে। এরা সম্পূর্ণভাবে মৎস্যপেশার সাথেই জড়িত। শীতকালে তিতাস নদীর দুই তীর শুকিয়ে যায়। সম্প্রতি এই মৌসুমে জেলেরা জমি বর্গা নিয়ে ধান চাষ করছে। এসব জমির মালিক স্থানীয় মুসলমানরা। অতীতে এইসব জমি মালোদেরই ছিলো। কিন্তু অভাবের কারণে তারা এগুলো বিক্রি করে দিয়েছে।

হরিণবেড়ের পুরো গ্রামটিতে শুধু একটি পাকাবাড়ি রয়েছে। সেটি এলাকার স্থানীয় প্রশাসন মেম্বারের বাড়ি। এছাড়া সম্পূর্ণ গ্রামে আর কোনো পাকাবাড়ি নেই। গ্রামের বাড়িগুলি টিন, বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি। পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যাভাস পরিবারের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। উন্নয়ন বলতে শুধু গ্রামের বিদ্যুতায়ন হয়েছে। পূর্বে মালো জেলেদের মৎস্যজীবী সংগঠন নামে একটি সংগঠন ছিলো। পরবর্তী কালে স্থানীয় মুসলমান জেলেরা এটা দখল করে নেয়। এখন মালোদের সুযোগ-সুবিধা দেখা বা সমবায় জাতীয় কোনো রকম সংগঠনই নেই।

পূর্বে মালোদের সাথে অন্যান্য বর্ণের বিবাহ হতো না। শুধু মালোদের সাথেই মালোদের বিবাহ হতো। বর্তমানে প্রথাগতভাবে না হলেও পছন্দের মাধ্যমে অসবর্ণ বিবাহ হচ্ছে।

রমাকান্ত দাসের মতে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অধিকাংশ মালো জেলেরা বৈষ্ণব ধর্মমতে বিশ্বাসী। তাঁর পূর্বপুরুষেরা আখড়ার গোঁসাইদের কাছ থেকে দীক্ষা নিতেন। বেশিরভাগ জেলে আখড়া থেকে দীক্ষা নিতো বলে এখানকার ব্রাহ্মণরা আপত্তি জানিয়েছিলো। তখন রমাকান্ত দাসের বাবা বাধ্য হয়ে তাঁর ছেলে রমাকান্ত দাসকে ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট থেকে দীক্ষা নিয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমানে নাসিরনগরের বৈষ্ণব গুরুর নাম বাবুল গোঁসাই, তাঁর ভালো নাম দেবব্রত গোঁসাই। তিনি মালো নববিবাহিত দম্পতিকে কানে মন্ত্র দেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য আশীর্বাদ করেন। হরিনাম সংকীর্তন নামযজ্ঞে এই গোঁসাই মহাপ্রভুর ভোগ রান্না করেন। এছাড়া যেকোনো মাঙ্গলিক কাজে গুরুকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয়। তবে সম্প্রতি মালোদের মধ্যে অন্যান্য ধর্মমতেরও শিষ্য রয়েছে। যেমন, সৎসঙ্গ, ইস্‌কন, রামকৃষ্ণ মঠ প্রভৃতি। হরিণবেড় গ্রামে ইস্‌কনের একটি মন্দিরও রয়েছে। ইসকনের শিষ্যদের দশবিধ সংস্কারে পুরোহিত লাগে না। ইস্‌কনের ব্রহ্মচারীরা গার্হস্থ্য ধর্ম পালনকারী শিষ্যদের বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সংস্কার ইস্‌কনের নিয়মানুযায়ী পালন করা হয়। মালোদের মধ্যে উপনয়ন হয় না। মালো নারী-পুরুষ গলায় তুলসীর মালা পরিধান করে।

রমাকান্ত দাসের মতে, হরিণবেড়ের মালো জেলেরা শুধু দাস পদবি ব্যবহার করে। এছাড়া কাছাকাছি অঞ্চলে বর্ধন, বিশ্বাস, নাগ, চৌধুরী পদবি দেখা যায়। যেহেতু শিক্ষার হার কম তাই পদবি পরিবর্তনের কোনো প্রভাব এখনো এই গ্রামের মধ্যে দেখা যায় না। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের অনেক মালো তাদের নামের শেষে বৈষ্ণব লেখেন। কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের মালো জেলেরা

আগে মল্লবর্মণ পদবি ব্যবহার করতো। কিন্তু বর্তমানে তারা মল্ল শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু বর্মণ পদবি ব্যবহার করে। শুধু তাই নয় তারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলেও দাবি করে থাকে।

রমাকান্ত দাস মনে করেন, পূর্বের তুলনায় মালোদের মধ্যে পূজা-পার্বণ বেশি হয়েছে। আগে এই অঞ্চলে ত্রিনাথের পূজা হতো। সে পূজাতে পুরোহিত দরকার হতো না, তারা নিজেরাই করতো। এখন আর সেটা হয় না। দুর্গাপূজা, শনি পূজা, কালীপূজাতে শুধু চক্রবর্তী পদবির পুরোহিতরা তাদের পূজা করতো। কিন্তু বর্তমানে অন্য পদবির দুই-একজন পুরোহিত পূজাতে আসে। যদিও তার উদাহরণ খুব নগণ্য। সাপ্তাহিক লক্ষ্মী পূজা, মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, বিপদনাশিনী ব্রত বিভিন্ন ব্রতে পুরোহিত প্রয়োজন হয় না। এছাড়া অন্য পূজা-পার্বণে পুরোহিতরাই পূজা করে থাকেন। এই অঞ্চলে পূর্বে কল্কিনারায়ণের পূজা করা হতো না, নারায়ণের ভোগও দেওয়া হতো না। বর্তমানে জেলেদের মধ্যে এই পূজা বেশ প্রচলিত। এই জাতিবর্ণের পুরোহিতরা তাদের হাতে রান্না করা খাবার গ্রহণ করে না। রান্নার উপকরণ কিনে দিলে পুরোহিত বা তার পরিবার রান্না করে খায়। এই রীতি এখনও বর্তমান।

রমাকান্ত দাসের মতে, সাতচল্লিশের দেশভাগ এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে নাসিরনগর এলাকার প্রচুর জেলে ভারতে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে। তাঁর সময়ে এই হরিণবেড় গ্রামে পাঁচশত পরিবার বসবাস করতো। এখন এখানে মাত্র তিনশত পরিবার রয়েছে। কয়েকবছর আগে স্থানীয় মুসলমানদের সাথে বিরোধের কারণে মালো পাড়াটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় মালোদের মধ্যে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। জীবনের ভয়ে অনেকেই রাতের অন্ধকারে এলাকা ছেড়ে ভারতে পালিয়ে গিয়েছে। এনজিও কর্মী ও সাংবাদিকরা তাদের খবর বিক্রি করে, তাদের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে সরকারি-বেসরকারি নানা আর্থিক সুবিধা নিয়েছে। কিন্তু গ্রামের অসহায় জেলেদের কাছে তার সিকিভাগও পৌঁছায়নি। এজন্য তারা কোনো উন্নয়ন কর্মী বা গবেষক কাউকেই আর বিশ্বাস করে না বরং সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে।

পরিশিষ্ট ১

কেস স্টাডি ৪
জাতিবর্ণ পরিচয়: পাটনি কৈবর্ত
ব্যক্তির নাম: ননীগোপাল দাস
এলাকা: সিলেট

ননীগোপাল দাস সিলেট শহরের হালদারপাড়ায় বসবাস করেন। তিনি পাটনি জাতিবর্ণে জন্মগ্রহণ করেছেন। পেশাগত জীবনে তিনি অধ্যাপক ছিলেন। সর্বশেষ কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা পাটনি জাতিবর্ণের ছিলেন। তাঁর মতে, পাটনিদের মূল কাজ ছিলো খেয়া পারাপার করা, মৎস্যজীবী হিসেবেও পাটনি শব্দটি ব্যবহার করা হয়। পাটনিরা নিজেদের সত্যবতীর বংশধর হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। পাটনিরা মনে করে তাদের পূর্বপুরুষরা ধীবর বা দাস নামে পরিচিত ছিলো। তবে মৎস্যজীবী হওয়ার জন্য হিন্দু সমাজে তাদের মর্যাদা অন্যদের তুলনায় কম বলে মনে করা হয়।

ব্রিটিশ আমলে অবস্থাসম্পন্ন পাটনিরা ব্রিটিশ সরকারের সাথে দেন-দরবার করে আদমশুমারি রিপোর্টে নিজেদের ‘মাহিষ্য দাস’ নামে নতুন পরিচয় গ্রহণ করার আবেদন জানায়। যদিও প্রকৃত মাহিষ্যরা পাটনিদের ‘মাহিষ্য দাস’ পরিচয়ের ব্যাপারে চরম আপত্তি জানিয়েছিলো। শেষপর্যন্ত পাটনি জাতিবর্ণটি ‘মাহিষ্য দাস’ পরিচয় পায়নি। তা সত্ত্বেও অনেক পাটনি পরিবার যারা একটু আর্থিকভাবে সচ্ছল ছিলো তারা নিজেদের ‘মাহিষ্য দাস’ হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে।

ননীপোপাল দাসের মতে, সিলেটে পাটনিদের মধ্যে ‘গঙ্গাপূজা’ নামে ঐতিহ্যবাহী একটি পূজা প্রচলিত ছিলো। পূজাতে প্রধান দেবী হিসেবে গঙ্গাপূজা করা হলেও দুর্গা, কালী, শিব প্রভৃতি প্রায় সকল দেবদেবীকে একসাথে পূজা করা হয়ে থাকে। তবে পৌরাণিক দেবদেবীদের সাথে ‘দুলাল মাঝি’ নামে একজন লৌকিক দেবতারও পূজা করা হয়ে থাকে। প্রতিবছর মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথিতে সিলেটের কয়েকটি জায়গায় যেমন, জগন্নাথপুর, কেশবপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এ পূজা

অনুষ্ঠিত হতো। একটি বিশাল নৌকায় করে অনেক দেবদেবীদের সাজিয়ে গঙ্গাপূজা করা হয় বলে একে নৌকাপূজাও বলা হয়। অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে প্রায় ৭০-৮০ জন দেবদেবীকে নিয়ে এই পূজা অনুষ্ঠিত হতো। ননীগোপাল দাসের মতে, গঙ্গাপূজা একটি প্রতীকী পূজা। কতদিন থেকে এই পূজা প্রচলিত তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে না। এ নিয়ে একটি গল্প প্রচলিত রয়েছে। অতীতে নাথ সম্প্রদায়ের একজন ব্যক্তি অনেক সম্পদ অর্জন করেছিলেন। তিনি একদিন স্বপ্নে দেখলেন, সমস্ত দেবদেবী একটি বিরাট নৌকায় করে সেই ব্যক্তির বাড়িতে এসেছে। তখন তিনি এই গঙ্গাপূজা শুরু করেন।

ননীগোপাল দাসের মতে, মাহিষ্য দাসদের অশৌচ পালন করা হয় ৩০ দিন। এ নিয়ে তিনি ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর উদাহরণ দেন, হিন্দুদের মধ্যে অশৌচ পালন ও শ্রাদ্ধে যে বৈষম্য রয়েছে সেটা দূর করার জন্য তিনি সকল বর্ণকে একই নিয়মে দশবিধ সংস্কার পালনের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেটা করা সম্ভব হয়নি। তবে বর্তমানে অনেকে ১২ দিনের অশৌচ পালন করে। ননীগোপাল দাসের মতে, শুধু অশৌচ নয় মাহিষ্য দাস জাতিবর্ণের সমাজ-সংস্কারে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট ১

কেস স্টাডি ৫

ব্যক্তির নাম: মিনা রানী মণ্ডল

জাতিবর্ণ পরিচয়: গুড়ি কৈবর্ত

এলাকা: নওগাঁ

মিনা রানী মণ্ডল ১৯৫০ সালে রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলায় গুড়ি কৈবর্ত জাতিবর্ণে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তাঁর বাবার পরিবারের সকল সদস্য ভারতে চলে গিয়েছে। নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলায় আরেকটি গুড়ি কৈবর্ত পরিবারে তাঁর বিয়ে হয়। গুড়ি কৈবর্তরা কৃষিকাজ বা হাল চাষ করেন না। গুড়ি কৈবর্তরা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা করে। মিনা রানী মণ্ডলের স্বামী মারা গিয়েছেন কয়েক বছর আগে। তাঁর দুই ছেলে। বড়ো ছেলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং বিবাহিত। ছোটো ছেলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স, মাস্টার্স করে চাকরির চেষ্টা করছে।

মিনা রানীর মতে, বর্তমানে গুড়ি কৈবর্তরা নিজেদের মাহিষ্য বলে পরিচয় দেয়। গুড়ি কৈবর্তদের ব্যবহৃত পদবি হলো মণ্ডল, প্রামানিক, সরকার, হাজরা, রায় প্রভৃতি। রাজশাহী, নওগাঁ, জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট প্রভৃতি অঞ্চলে তাদের আত্মীয়স্বজন রয়েছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে এসব অঞ্চলে গুড়ি কৈবর্তের বসবাস রয়েছে।

মিনা রানী মণ্ডলের মতে, গুড়ি কৈবর্তদের পুরোহিতদের পদবি হলো চক্রবর্তী। এই পুরোহিতরা মাহিষ্যদের এবং নাপিতদের পৌরোহিত্য করে। কিন্তু ধোপা, মেথর ও মুচি জাতিবর্ণের লোকদের পৌরোহিত্য করে না। অতীতে ব্রাহ্মণরা কৈবর্ত বা মাহিষ্যদের গায়ের ছায়া পড়লে কোনো খাবার খেত না। জল রাখার ঘড়া বা কলসিতে পড়লে সে ঘড়া ভেঙে ফেলতো। এদের স্পর্শ করলে সেটা অপবিত্র মনে করতো, এজন্য সাথে সাথে স্নান করতো। কিন্তু আগে অস্পৃশ্য

মনে করলেও এখন এগুলোর পরিবর্তন হয়েছে। এখন কৈবর্ত-মাহিষ্যদের বাড়িতে ভাতও খায়। মিনা রানী মনে করেন, এখন সমাজে বৈষম্য কিছুটা কমেছে।

মিনা রানী মণ্ডল মনে করেন, এই জাতিবর্ণের দশবিধ সংস্কারে নানা ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর ছোটবেলায় ৩০ দিনের অশৌচ পালন করতে দেখেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে ব্রাহ্মণ বাদে তাদের গ্রামের সকল জাতিবর্ণ ১২ দিনের অশৌচ এবং ১৩ দিনে শ্রাদ্ধ করে। গুড়ি কৈবর্ত জাতিবর্ণের উপনয়ন হয় না। শিশু জন্ম নিলে ১৩ দিনে অশৌপ শেষ করে কিন্তু প্রসূতি মাকে ১ মাস অশৌচ পালন করতে হয়।

আগে এই জাতিবর্ণের ছেলেমেয়েদের সাথে অন্য জাতিবর্ণের বিবাহ হতো না। কিন্তু এখন হচ্ছে। মিনা রানী বলেন, তাঁর ননদের নাম বেবী রায়ের গুড়ি কৈবর্তের সাথে বিবাহ হয়েছে। এই বেবী রায়ের দুই মেয়ে। এক মেয়ের বিবাহ ব্রাহ্মণের ছেলের সাথে আরেক মেয়ের বিবাহ হয়েছে কায়স্থ ছেলের সাথে। মিনা রানীর মতে, অসবর্ণ বিবাহ হবে কি হবে না এটা নির্ভর করে পরিবারের উপর। আধুনিক ও শিক্ষিত পরিবারে জাতিবর্ণ পরিচয়ের থেকে ছেলেমেয়েদের যোগ্যতা বিচার করে বিবাহ ঠিক করা হয়। তবে হাইলা কৈবর্তের সাথে গুড়িদের আগেও বিবাহ প্রচলিত ছিলো এবং এখনো রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে মিনা রানী মণ্ডল তাঁর জাতিবর্ণের মেয়ের সাথেই ছোটো ছেলের বিবাহ দিতে চান।

মিনা রানীর মতে, সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রথা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বরং কমেছে। তিনি তাঁর বিধবা মা এবং শাশুড়ির উদাহরণ দিয়ে বলেন, স্বামী মারা যাওয়ার পরে তারা মাথার চুল ন্যাড়া করেছিলো এবং বারো মাস নিরামিষ খেতো, একাদশী পালন করতো। এমনকি তাদের রান্নার হাড়ি-পাতিল পর্যন্ত আলাদা ছিলো। আমিষের পাতিলে রান্না করা খাবার নিরামিষ হলেও খেত না। কিন্তু তার স্বামী মারা যাওয়ার পর তিনি নিরামিষ খান না আবার লম্বা চুলও কাটেননি। এই বিষয়টিতে তিনি মনে করেন নিয়মের শিথিলতা এসেছে। এছাড়া কমবয়সী বিধবারা এখন পুনরায় বিবাহ করার মাধ্যমে সংসারও করছে। তিনি মনে করেন, বিশ বছর আগেও এটা সমাজে নিন্দনীয় ছিলো।

মিনা রানী মণ্ডলের মতে, গুড়ি কৈবর্ত বা মাহিষ্য জাতিবর্ণের অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। আগে হাইলারা হালচাষ নিয়েই পড়ে থাকতো, জাইলারা জাল নিয়েই থাকতো। অর্থাৎ যার যা জাতিবর্ণের বৃত্তি তা দিয়েই সংসার চালাতো। কিন্তু এখন মানুষ শিক্ষিত হচ্ছে, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি চাকরি করছে। তাদের আর্থিক উন্নতি হচ্ছে। তিনি মনে করেন, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র বা ছাত্রীরাও এখন টিউশন পড়িয়ে আয় করছে। এভাবে পরিবারগুলোতে অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে।

শিক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে গুড়ি কৈবর্তদের পদবিও পরিবর্তিত হচ্ছে। মিনা রানী মণ্ডল তাঁর ননদ বেবী রায়ের উদাহরণ দিয়ে বলেন, তাদের আদি পদবি ছিলো প্রামাণিক কিন্তু তাদের পরিবারে এক উকিল ছিলো তিনি পরিবারের সকলের রায় পদবি করে দিয়ে ভারতে চলে গেছেন।

পরিশিষ্ট ১

মিনা রানী মণ্ডল মনে করেন পূজা-পার্বণের ক্ষেত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। আগে যেসব পূজা হতো এখনো সেগুলোই হচ্ছে। মিনা রানী এবং তাঁর পরিবারের সকলে বৈষ্ণব গুরুর থেকে দীক্ষা নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ছেলের বৌ অনুকূল ঠাকুরের শিষ্য এবং নিরামিষ আহার করেন। মিনা রানী মণ্ডলের মতে, এভাবে সামগ্রিক দিক থেকেই গুড়ি কৈবর্ত সমাজে নানা ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট ১

কেস স্টাডি ৬
ব্যক্তির নাম: দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়
জাতিবর্ণ পরিচয়: মাহিষ্য (চাষি কৈবর্ত)
এলাকা: মেদিনীপুর

দীপেন্দ্রনারায়ণ রায় পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুরের বিখ্যাত তাম্রলিপ্ত রাজবংশের সর্বশেষ বংশধর। তিনি ১৯৬৬ সালের ২৫শে এপ্রিল তমলুক রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর পিতা তাম্রলিপ্ত রাজবংশের ৬৩তম বংশধর প্রয়াত কর্নেল ডাঃ ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। যিনি রাজা হওয়ার পাশাপাশি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। দীপেন্দ্রনারায়ণ রায় ভারতের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বি টেক, এমবিএ ও এলএলবি শেষ করেছেন। কর্মজীবনে নানা বেসরকারি কোম্পানিতে সেলস ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন। বিভিন্ন মেয়াদে তমলুক পৌরসভার কাউন্সিলর, ভাইস চেয়ারম্যান ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তমলুক পৌরসভার প্রশাসক হিসেবে কর্মরত আছেন। তমলুকে তিনি রাজনীতিবিদ ও সমাজকর্মী হিসেবে অধিক পরিচিত। 'তাম্রলিপ্তের রাজকাহিনী' ও 'তাম্রলিপ্তের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও উৎসব' শিরোনামে দুইটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়া আনন্দবাজার পত্রিকাসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে থাকেন।

দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়ের মতে, তাম্রলিপ্ত রাজবংশটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে অত্যন্ত প্রাচীন রাজবংশ। ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, জাপানের মিকাডো রাজবংশ তাম্রলিপ্ত রাজপরিবারের সমসাময়িক। গবেষক শিশুতোষ সামন্ত গবেষণায় দেখিয়েছেন, তাম্রলিপ্ত রাজপরিবারের সাথে জাপানের মিকাডো রাজবংশের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিলো। এছাড়া ত্রিপুরার রাজপরিবার, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ রাজপরিবার, বিহারের দ্বারভাঙ্গা রাজপরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠতা ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিলো।

পরিশিষ্ট ১

বর্তমানে তাম্রলিপ্ত রাজপরিবারের আভিজাত্য আগের মতো নেই। দীপেন্দ্রনারায়ণের মতে, ইংরেজ বিরোধিতার কারণে এই রাজবংশের গড়ে রক্ষিত কামান, রাইফেল, অস্ত্রশস্ত্র ইংরেজরা বাজেয়াপ্ত করে। বিশেষত রানি কৃষ্ণপ্রিয়ার বিদ্রোহের ফলে ১৭৮২ সালে ইংরেজদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠে এই রাজপরিবার। তখন থেকেই এই পরিবারের উপর ইংরেজদের খড়্গ নেমে আসে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত থাকার অপরাধে দীপেন্দ্রনারায়ণের ঠাকুরদা রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়কে প্রথমে পায়রাটুঙ্গি ডাকবাংলোতে ৬ মাস নজরবন্দী করে রাখা হয়। এরপর একদিন রাতের অন্ধকারে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে নেওয়া হয়। ১৯৩০ সালে দীপেন্দ্রনারায়ণের পিতা রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। প্রথমে তমলুক জেল পরে পিতার মতো মেদিনীপুর জেলখানায় কারাবাস করেন। দীপেন্দ্রনারায়ণ মনে করেন, ইংরেজবিরোধী হওয়ার জন্য এই রাজপরিবারের প্রতি বিরাগভাজন হয়ে ইংরেজ সরকার তাম্রলিপ্ত জমিদারী নিলাম করে দেয়। ফলে তমলুক রাজপরিবার তাঁদের পূর্বের আভিজাত্য হারিয়ে ফেলে।

দীপেন্দ্রনারায়ণের মতে, আগের মতো আভিজাত্য না থাকলেও রাজপরিবারের সদস্যদের সাহস, সহানুভূতিশীলতা ও পরোপকারিতা তাঁর বংশধরদের মধ্যে এখনো রয়েছে। তিনি নিজে অগ্রজদের দেখানো পথে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। জমিদারি থাকাকালীন সংগৃহীত রাজস্ব দিয়েই রাজপরিবারের সমস্ত খরচ মেটানো হতো। কিন্তু জমিদারি নিলামের পর ব্যক্তিগত সম্পত্তি যতটুকু ছিলো তা তাঁর বংশধরদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। ফলে বর্তমান প্রজন্মের বংশধরেরা অন্য পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

২০০২ সালে মেদিনীপুর জেলা ভাগ হয়। একই বছরে দীপেন্দ্রনারায়ণ রায় তমলুক পৌরসভার উপ পৌরপ্রধান নির্বাচিত হন। পরে সাময়িকভাবে পৌরপ্রধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

তাম্রলিপ্ত রাজবংশের ৩৫তম রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের আমলে ৯৬৬ বছর আগে একটি মেলা চালু হয়েছিলো। তিনি এবং তাঁর উত্তরপুরুষ মেলাটি চালাতেন। পরবর্তী কালে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে এই রাজবংশ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লে পারিবারিক এই মেলাটি বন্ধ হয়ে যায়। দীপেন্দ্রনারায়ণ রায় ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেই মেলাটি পুনরায় চালু করেন। কোনো রকম সরকারি অনুদান না পাওয়ায় মেলাটি আকারে খুব ছোটো ছিলো। বর্তমানে মেলাটি 'তাম্রলিপ্ত জনস্বাস্থ্য কৃষি ও কুটির শিল্পমেলা' নামে বৃহৎ পরিসরে আয়োজন করা হয়। মেলাটি এখন সরকারি অনুদানও পাচ্ছে। এর ফলে স্থানীয় জনগণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

দীপেন্দ্রনারায়ণ রায় বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির সঙ্গেও যুক্ত। বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির মাহিষ্য আন্দোলনের সাথে তাঁর পরিবারের অনেকেই যুক্ত ছিলেন। বিশেষ করে আন্দোলন চলাকালে সংস্কারগুলোর যে পরিবর্তন হয়েছিলো সেটার প্রতিপালন এই রাজপরিবারের মধ্যেই শুরু হয়েছিলো। মেদিনীপুর রাজপরিবার সর্বদাই নিজেদের ক্ষত্রিয় রাজবংশ হিসেবে দাবি করে এসেছেন। তাই তাদের ক্ষত্রিয় সংস্কার পালন করাটা মাহিষ্য জনগণের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। বর্তমানে মাহিষ্য সমিতি মাহিষ্য সমাজের উন্নয়নের জন্য যেসব কাজ করছে সেগুলোতে

দীপেন্দ্রনারায়ণ রায় সহযোগিতা করেন। একটি জাতিবর্ণের উন্নতির জন্য শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন বিশেষ প্রয়োজন। সেজন্য সমিতির সংবিধানে লক্ষ্য হিসেবে রয়েছে মাহিষ্য সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, সামাজিক উন্নতি, মাহিষ্য সমাজের মধ্যে ঐক্য সাধন করা, সম-মনোভাবাপন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা, সদস্য বৃদ্ধি, সমিতির সম্পত্তি বৃদ্ধি করা ও রক্ষা করা, শাখা সংগঠন গড়ে সমিতির কর্মধারাকে বিভিন্ন জেলায় ও অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি বহুদিন ধরে মাহিষ্যদের 'অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনের' অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়ের মতে, সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির লক্ষ্য তাঁর কাছে যথার্থ বলে মনে হয়।

তমলুক এলাকার জনগণের জন্য দীপেন্দ্রনারায়ণ সবথেকে বেশি সময় ও শ্রম দিয়ে থাকেন। দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়ের মতে, তাঁর পরিবারের সদস্যরা মাহিষ্য জাতিবর্ণ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তিনি চান তাঁর জীবদ্দশায় এই ধারাকে তিনি এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

কেস স্টাডি ৭

ব্যক্তির নাম: সুবালা দাস
জাতিবর্ণ পরিচয়: মাহিষ্য (চাষি কৈবর্ত)
এলাকা: নওগাঁ

সুবালা দাস আনুমানিক ১৯৩১ সালে নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার আমরুল কসবা গ্রামে এক মাহিষ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম যদুনাথ প্রামাণিক এবং মায়ের নাম রাজবালা। পনেরো বছর বয়সে সুবালা দাসের বিয়ে হয়েছিল একই গ্রামের শ্রীরূপ চন্দ্র দাসের সঙ্গে। কৃষিকাজ করাই ছিলো তাঁর পেশা। চার ছেলে এবং তিন মেয়ের জননী সুবালা দাস। গৃহিণী হিসেবেই সারাজীবন পার করেছেন।

সুবালা দাসের মতে, আত্রাইয়ের আমরুল কসবা মৌজা একসময় পাঁচুপুরের জমিদারির অন্তর্গত ছিলো। এটা একসময়ে চলনবিলের মধ্যেই ছিলো। বর্ষাকালে পুরো ফসলি মাঠ জলে ডুবে থাকতো। এজন্য তখন কৃষকদের তেমন কোনো কাজ থাকতো না। রাতের বেলায় গ্রামের একজন বা দুইজন বয়স্ক মানুষ গল্প বলার আসর জমাতো। স্থানীয়ভাবে একে কিচ্ছা কাহিনী বলা হতো। সারারাত ধরে এই আসর চলতো। মূলত এগুলো ছিলো রূপকথা।

সুবালা দাসের মতে, মাহিষ্য সমাজে নানা ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কৃষিকাজেও পরিবর্তন এসেছে। আগে কোনো কৃষিযন্ত্র ছিলো না। মানুষ গরু দিয়ে হালচাষ করতো। এখনকার মতো রাসায়নিক সার, কীটনাশক কোনোকিছুই ছিলো না। বছরে মাত্র একটি ফসল হতো। তখন মানুষের অনেক অভাব ছিলো। কৃষিজমি থাকলেও খাবারের জন্য কষ্ট করতে হয়েছে। সুবালা

দাসের মতে, বাংলা ১৩৫০ সালের (১৯৪৩) দুর্ভিক্ষের কথা তাঁর মনে আছে। আত্রাই, মাধনগর, ভাটপাড়া, সাধনগর প্রভৃতি এলাকার মাহিষ্যরা ভাতের অভাবে শালুক ফুল বা ভ্যাট খেয়ে জীবন বাঁচাতো। অনেকে ঘাসের বিচির ভাত, কাউনের ভাত খেত। আবার অনেকে দুইবেলা রুটি একবেলা ভাত খাইয়ে ছেলেমেয়েদের মানুষ করতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও কয়েক বছর কষ্ট ছিলো। তাঁর মতে, এসব দিন এখন গল্প। এখন কৃষিকাজে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এই জমিতেই বছরে তিন ফসল হয়। শ্যালো মেসিন, সেচ পাম্প, বরেন্দ্রের সেচ প্রকল্প প্রভৃতি সুবিধার জন্য শীতকালেও প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। অনেক রকম সার, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ফসল উৎপাদনের মাত্রা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করেছে। এজন্য মাহিষ্য সমাজে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

সুবালা দাসের মতে, দেশভাগ এবং স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় এই এলাকার প্রচুর মাহিষ্য ভারতে স্থানান্তরিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি স্বামীসন্তানসহ বালুরঘাটে একটি শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন পরেই চলে এসেছেন নিজ মাতৃভূমিতে। সুবালা দাসের দেবরের মৃত্যুর পর দেবরের পরিবার নব্বইয়ের দশকে ভারতের নদীয়ায় চলে গেছে। তাঁর দেবরের দুই মেয়ের বিয়ে ওখানেই হয়েছে। সুবালা দাসের মেজ মেয়ের বিবাহ হয়েছিলো রাজশাহীর লোকমানপুরের চিতলিয়া গ্রামে। তারা ১৯৮৮ সালে পুরো পরিবারসহ ভারতের মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়েছে।

সুবালা দাসের মতে, তাঁর ছোটোবেলায় তিনি ৩০ দিনের অশৌচ পালন করতে দেখেছেন। তাঁর মতে, আনুমানিক সত্তর বছর থেকে এই এলাকার মাহিষ্যদের মধ্যে ১২ দিনের অশৌচ পালন শুরু হয়। সেমসয়ে ব্রাহ্মণরা মাহিষ্যদের অস্পৃশ্য মনে করতো। কোনো পূজা-পার্বণে মণ্ডপে মাহিষ্যদের উঠতে দিতো না। যতক্ষণ পুরোহিত থাকতো ততক্ষণ কেউ নিজেদের ছায়া পুরোহিতের গায়ে পড়তে দিতো না। পুরোহিতরাই পূজা করে, ভোগ রান্না করে দক্ষিণা নিয়ে চলে যেতো। পুরোহিতদের বাড়ির পাশ দিয়েও যাওয়ার অনুমতি মাহিষ্যদের ছিলো না। এখন এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। গত ১৫-২০ বছরে এই পরিবর্তনটা বেশি হয়েছে। এখন আর পুরোহিতরা মাহিষ্যদের অস্পৃশ্য মনে করে না। সুবালা দাসের মতে, এখন পুরোহিতরা তাদের বাড়িতে ভাতও খায়।

সুবালা দাসের মতে, সন্তানের জন্মের কিছুদিন পর সূর্য দেবতার নামে অর্ঘ্য প্রদান করা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, নানা রকম পূজাতে পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। মাহিষ্য জাতিবর্ণের মধ্যে কোনো উপনয়ন হয় না। বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে মনসা পূজাকে বলা হয় সাঁনাই পূজা। বছরে দুই ধরনের সাঁনাই পূজা হয়। সাঁনাই পূজা, ষষ্ঠীপূজা, দুর্গাপূজা, দোলপূর্ণিমা প্রভৃতি পূজাতেও পুরোহিত আসে। সবথেকে বেশি জাঁকজমক হয় দুর্গাপূজা ও দোলপূর্ণিমাতে। একাদশী ব্রত, মঙ্গলচণ্ডী ব্রত,

শিবরাত্রি ব্রত, নামযজ্ঞ বা হরিবাসর এগুলোতে পুরোহিত প্রয়োজন হয় না। সবগুলো পূজা বা উৎসবের মধ্যে এই গ্রামে শিবরাত্রি ব্রত এবং নামযজ্ঞ এসেছে অনেক পরে।

১৯৫৮ সালে আমরুল কসবা প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। সুবালা দাসের মতে, এর পর থেকে এই এলাকার মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রবেশ করেছে। পাশের মাধ্যমিক বিদ্যালয় দুই কিলোমিটার দূরে আত্রাইয়ে। কলেজও সেখানে। তাঁর বড়ো দুই ছেলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে। বড়ো ছেলের বিবাহের পর ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। এরপর আর তাদের পড়াশোনা হয়নি। মেয়েদের বিবাহ হয়েছে ১৩-১৪ বছর বয়সে। তারাও লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি। শুধু ছোটোছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা শেষ করে বিসিএসের মাধ্যমে সরকারি কলেজে শিক্ষকতা করছে। তবে সার্বিকভাবে আমরুল কসবা গ্রামে এখনও শিক্ষার হার খুব বেশি নয়।

সুবালা দাসের মতে, তাঁর সমগ্র জীবনে তিনি আচার-সংস্কার, রীতিনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতিতে অনেক পরিবর্তন হতে দেখেছেন। এই পরিবর্তনগুলোর মধ্যে কোনোটা মাহিষ্য সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে আবার কোনোটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তবে সামগ্রিকভাবে ইতিবাচক পরিবর্তনই বেশি।

কেস স্টাডি ৮
ব্যক্তির নাম: মলয় সরকার
জাতিবর্ণ পরিচয়: তুঁতে কৈবর্ত
এলাকা: রাজশাহী

মলয় সরকার রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলায় ১৯৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি তাঁর স্ত্রীসহ রাজশাহী শহরে বিসিক শিল্পনগরী এলাকায় বসবাস করেন। তিনি শহরের সপুরা সিল্ক কারখানায় প্রায় ২০ বছর ধরে রেশম সুতা থেকে শাড়ি তৈরির কাজ করেন। মলয় সরকারের গ্রামের বাড়িতে তাঁর বাবা-মা ভাই এবং তার পরিবার বসবাস করে। তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং স্ত্রী অসুস্থ। তাঁর মাসিক আয় ৮০০০-১০০০০ টাকা। এই টাকা দিয়েই তাঁর সংসারের খরচ চালাতে হয়। গ্রামের বাড়িতে তাঁর ভাইরা কৃষিকাজ করে। মলয় সরকার নিজে কখনো কৃষিকাজ করেননি।

মলয় সরকার তুঁতে কৈবর্ত জাতিবর্ণের হলেও নিজেকে মাহিষ্য বলে দাবি করেন। তাদের গ্রামে এরকম অনেকেই ছিলো যারা আগে রেশম বা তুঁত চাষ করতেন এবং সুতা বা সিল্ক তৈরির কাজ করেছেন। তাঁর ঠাকুরদা এবং বাবার কাছ থেকে তাদের গল্প শুনেছেন, এই তুঁতে কৈবর্তরা ভারতে চলে গিয়েছে। তবে তিনি এটাও স্বীকার করেন শতভাগ তুঁতে কৈবর্ত যে ভারতে চলে গিয়েছে এমনটাও হতে পারে না। তিনি মনে করেন, তুঁতে কৈবর্তরা হয়তো মাহিষ্য, কায়স্থ বা অন্য কোনো জাতিবর্ণের আশ্রয় নিয়ে নিজেদের তুঁতে পরিচয় বদলে ফেলেছে।

পরিশিষ্ট ১

মলয় সরকারের পারিবারিক পদবি ছিলো দাস। তাঁর বড়ো বোনের স্বামী কিছুটা লেখাপড়া জানতেন। তিনিই স্কুলে পড়ার সময় মলয় সরকার এবং তাঁর ভাইবোনদের পারিবারিক পদবি দাস বদলে সরকার করে দেন। সেই থেকে তারা এই পদবি ব্যবহার করে আসছেন। তাঁর মতে, দাদাবাবু পদবি বদলে না দিলে হয়তো তারা আজও দাস পদবি ব্যবহার করতেন। তিনি মনে করেন, সমাজে সরকার পদবি অনেক জাতিবর্ণই ব্যবহার করে তাই এই পদবিটা সুবিধাজনক।

পূর্বে মলয় সরকারের পরিবার ৩০ দিনের অশৌচ পালন করতেন। কিন্তু এখন তারা ১২ দিনের অশৌচ ও ১৩ দিনে শ্রাদ্ধ করেন। তিনি মনে করেন এই পরিবর্তনটা শুরু হয়েছে গত ২০ বছর ধরে। তাঁর মতে, মানুষের কাজের ব্যস্ততা ও সময়ের অভাবের জন্য মানুষ চেষ্টা করে সীমিত সময়ে কর্তব্য পালন করে কাজে ফিরে যেতে। যে কারণেই হোক অশৌচের পরিবর্তনটাকে মলয় সরকার খুব ইতিবাচক পরিবর্তন বলে মনে করেন। এক্ষেত্রে তিনি শীতকালে অশৌচ পালনের অসুবিধার কথা জানান। কারণ শীতের দিনে মানুষ লেপ-কাঁথা গায়ে দিয়েও অনেক সময়ে শীতের হাত থেকে রেহাই পায় না। অথচ পরিবারে কেউ মারা গেলে এক কাপড়ে ভেজা কাপড় গায়েই শুকাতে হয়, মাটিতে শুতে হয়। এর যে কষ্ট এতো এক-দুইদিন করাই কঠিন, এক মাস তো অনেক পরের কথা।

মলয় সরকারের মতে, অসবর্ণ বিবাহ আগে তেমন দেখা যেতো না। তবে তাদের জাতিবর্ণে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত রয়েছে। তিনি এক কায়স্থ মেয়েকে বিয়ে করেছেন। তাঁর স্ত্রীর পদবি চন্দ। তাঁর মতে, কায়স্থরা অনেক উঁচু জাতিবর্ণ। কায়স্থের মেয়েকে বিবাহ করে নিয়ে আসা তাঁর জন্য ভাগ্যের ব্যাপার। মলয় সরকার তাঁর ভাইয়ের বিয়ে দিয়েছেন পাবনাতে। নিজে বিয়ে করেছেন কুমিল্লায়, এবং বোনের বিয়ে দিয়েছেন নাটোরের সিংড়া উপজেলায়। ভাই-বোনের বিবাহ তাদের নিজেদের জাতিবর্ণেই হয়েছে।

মলয় সরকার কেন এই রেশম শাড়ি তৈরির কাজ নিলেন, এ প্রশ্নের উত্তরে জানান, কৃষিকাজ কিছুদিন আছে আবার কিছুদিন নেই এরকম অনিশ্চয়তা থাকার জন্য তিনি কৃষিকাজ না করে রেশম শাড়ি তৈরির কাজ করেন। তাঁর দুই-একজন হিন্দু সহকর্মী আছে যারা রেশম গুটি থেকে সুতা বের করার কাজ করে, তারা নিজেদের কায়স্থ পরিচয় দেয়। কোনো রকম পূর্ব অভিজ্ঞতা বা পারিবারিক দক্ষতা ছাড়া এই কাজগুলো কিভাবে করতে পারে – এ থেকে তাদের কায়স্থ পরিচয় নিয়ে সন্দেহ করাই যায়। মলয় সরকার মনে করেন, তুঁতে কৈবর্ত পরিচয়ের সাথে কৈবর্ত শব্দটি থাকার জন্য তারা তাদের পরিচয় বদল করে থাকতে পারেন।

মলয় সরকারের মতে, রেশম শিল্পের সাথে জড়িত পেশাটা অনেক চ্যালেঞ্জিং। কারখানায় যারা কাজ করে আগে তাদের ১৫-১৬ ঘণ্টা শ্রম দিতে হতো। এখনও তারা সপ্তাহে ৬ দিন ১২ ঘণ্টা করে শ্রম দেয়। ওভারটাইম থাকলে আরও বেশি সময় দিতে হয়। আবার বেতনও বেশি নয়। এ কারণে তাঁর অনেক সহকর্মী এই পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশায় চলে গেছে। আবার গ্রামের গৃহস্থ মহিলা যারা রেশম পোকা পালন করে, তাদেরও অনেক সময় ও শ্রম দিতে হয়। রাস্তার পাশের

তুঁত গাছের পাতা রেশম পোকা খায় না। ধূলিমুক্ত পরিষ্কার পাতা রেশম পোকার খাবার, তবেই পোকা গুটি ছাড়ে। এছাড়া আরও অনেক কাজ থাকে গুটি থেকে সুতা তৈরির জন্য। এভাবে একটি ভালো মানের সিল্ক শাড়ি পাওয়া যায়। যদিও রেশম শাড়ি কেনার মতো সামর্থ্য রেশম কর্মীদের নেই। অন্য পেশায় এর থেকে কম সময় ও শ্রম দিয়ে শ্রমিকরা সচ্ছল জীবন যাপন করতে পারেন। রেশম সিল্কের শাড়ি বা কাপড় তৈরিতে যে ব্যয় হয় তাতে শাড়ির যে দাম হয়, তা সাধারণ জনগণের সামর্থ্যের বাইরে। এজন্য অনেক রেশম কারখানার মালিক শ্রমিকের বেতন ঠিকমতো দিতে পারে না। ফলে প্রচুর রেশম কারখানা বন্ধ হয়েছে এবং মানুষ তাদের কাজ হারিয়েছে। তুঁতে কৈবর্ত খুঁজে না পাওয়ার এটাও একটি কারণ হতে পারে।

পেশাগত পরিবর্তনের পাশাপাশি মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। আগে মানুষ দুইবেলা ঠিকমতো ভাত খেতে পারতো না। তিনি ছোটোবেলায় কাউনের চালের ভাত খেয়েছেন, খেসারি ডালের রুটি খেয়েছেন। এখন আর কারো ভাতের অভাব নেই। তাঁর মতে, এখন যে কোনো পরিবারে একজনের বেতন দিয়ে পাঁচ জনের পরিবার চালানো যায়। তিনি মনে করেন, মানুষ যতো বেশি শিক্ষিত হবে তাঁর সমাজ ততো বেশি পরিবর্তিত হবে। মলয় সরকার নিঃসন্তান কিন্তু তাঁর ভাইয়ের ছেলেরা পড়াশুনা করেছে। তাদের মধ্যে একজন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকও হয়েছে। এতে তাদের পরিবারে সচ্ছলতা এসেছে।

পূজা-পার্বণেরও পরিবর্তন হয়েছে। আগে যে কোনো অনুষ্ঠানে তেমন জাঁকজমক হতো না। এখন মানুষ উৎসব-পার্বণে খুব আনন্দ করে। ব্রতকথা ছাড়া যে কোনো পূজাতে চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হয়। এই ব্রাহ্মণরা তাদের বাড়িতে খাবার গ্রহণ করে না। কিন্তু চাল, ডাল, কলা, তরিতরকারি, ঘি, মধু প্রভৃতি কিনে দিলে বাড়িতে নিয়ে রান্না করে খায়। মলয় সরকার মনে করেন, আগের তুলনায় সমাজে অনেক পরিবর্তন হয়েছে যা মানুষের জীবন যাত্রার মানকে পরিবর্তিত করেছে।

পরিশিষ্ট ২

সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির আবেদনসমূহ

২ক. ১৯০০ সালে পাবনা মাহিষ্য সমিতি কর্তৃক বাংলার তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের নিকট মাহিষ্য নামের জন্য পাঠানো আবেদনপত্র।

২খ. কলিকাতা-সংস্কৃত-কলেজের ব্যবস্থাপত্র।

২গ. ১৯০৩ সালে বাংলার তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের নিকট বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির পাঠানো প্রতিবাদপত্র।

২ঘ. ১৯১১ সালে জেলে কৈবর্তদের মাহিষ্য পরিচয়ের দাবির বিষয়ে বাংলার শুমারি কর্মকর্তা এলএসএস ও'ম্যালী কর্তৃক বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতিকে পাঠানো চিঠি।

২ঙ. ১৯১১ সালে বাংলার শুমারি কর্মকর্তা এলএসএস ও'ম্যালীর চিঠির উত্তরে বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির চিঠি।

২চ. জেলে কৈবর্তদের মাহিষ্য পরিচয় প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে শুমারি কর্মকর্তা এলএসএস ও'ম্যালীর চিঠি।

২ছ. পাটনিদের চাষি কৈবর্ত/মাহিষ্য নামের আবেদন গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে শুমারি কর্মকর্তা এলএসএস ও'ম্যালীর চিঠি।

২জ. পূর্ববঙ্গ ও আসামের চাষি কৈবর্তদের পক্ষ থেকে তৎকালীন শুমারি কর্তৃপক্ষের কাছে মাহিষ্য নামের আবেদনপত্র (১)।

২ঝ. পূর্ববঙ্গ ও আসামের তৎকালীন শুমারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চাষি কৈবর্তদের (মাহিষ্য) কাছে পাঠানো চিঠি (১)

২ঞ. পূর্ববঙ্গ ও আসামের চাষি কৈবর্তদের পক্ষ থেকে তৎকালীন শুমারি কর্তৃপক্ষের কাছে মাহিষ্য নামের আবেদনপত্র (২)

২ট. পূর্ববঙ্গ ও আসামের তৎকালীন শুমারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চাষি কৈবর্তদের (মাহিষ্য) কাছে পাঠানো চিঠি (২)

২ঠ. পূর্ববঙ্গ ও আসামের তৎকালীন শুমারি কর্তৃপক্ষের কাছে চাষি কৈবর্তদের (মাহিষ্য) পাঠানো ইশতেহার

২ড. ১৯০৯ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসামের তৎকালীন শুমারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুনামগঞ্জ মাহিষ্য সমিতির সম্পাদকের কাছে পাঠানো চিঠি

২ঢ. ইশতেহার প্রতিলিপি সর্বত্র প্রচারের নির্দেশপত্র

পরিশিষ্ট ২

পরিশিষ্ট ২ক

১৯০০ সালে পাবনা মাহিষ্য সমিতি কর্তৃক বাংলার তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের নিকট মাহিষ্য নামের জন্য পাঠানো আবেদনপত্র

To

HIS HONOUR THE LIEUTENANT GOVERNER OF BENGAL

MAY IT PLEASE YOUR HONOUR

The humble memorial of the undersigned members of the Mahishya Samiti for themsalves and behalf of the other members of the caste to which they belong most respectfully showeth:

1. That your memorialists beg humbly to approach your Honour with the prayer that in the forthcoming census the caste to which they belong may be styled *Mahishya* and not *Kaibarta,* as has been done in the previous census.

2. That the reasons for which your memorialists beg to submit their prayer are the following:

(a) There are two castes in Bengal distinct to their origin and occupying very different position in society who are commonly designated by the name of Kaibarta;

(b) One of these two castes belong to the class of fisherman, and is included among castes from whom the higher class Hindus such as Brahmins, Baidyas and as well as the members of the caste to which your memorialists belong, will not take water.

(c) The caste to which your memorialists belong are ordinarily designated by the names Kaibarta Das, Parasar Das, Mahishya Das & c. and has the same rights in Hindu society which the other high castes such as the Vaidyas and Kayasthas possess;

(d) The inclusion of the caste to which your memorialists belong in the class Kaibarta has considerably lowered them in the estimation of the other castes among the Hindus and created grave erroneous notions with regard to their social position.

3. That your memorialists have therefore adopted there ancient class or caste name of *Mahishya,* so that there may not arise any more confusion in future in classifying them under the common and misleading name of *Kaibarta.*

4. That with regard to the evidences based on Hindu Sastras regarding the origin and social position of the castes to which your memorialists belong, your memorialists beg respectfully to submit herewith two books, one entitled *Mahishya Bibriti* and the other called *Ambastha Darpan* (pages 11-14, 63-72, 73, 78-79) embodying all the arguments in support of this memorial.

5. That in the 3rd Chapter of the book called *Mahishya Bibriti* herewith submitted , the opinion of the leading Pandits of Bengal in support of this memorial will be found embodied.

6. That in the book called *Sambandha Nirnaya* by Pandit Lalmohan Vidyanidhi, the author erroneously included the members of the caste to which your memorialists belong in the *Fisherman or Kaibarta* caste. But on his mistake being pointed out by better informed critics, the author has been at last obliged to acknowledge his error in an article in the Education Gazette of the 19th Chaitra 1304 B.S.

7. That your memorialists humbly pray that your honour will be graciously pleased to issue orders to the officers in charge of the census work in Bengal for the inclusion under the name of *Mahishya* of the members of the caste to which of your memorialists belong.

8. That your memorialists, as in duty bound, shall ever pray.

We have the honour to be

SIR,

Your most obedient Subjects.

পরিশিষ্ট ২খ
কলিকাতা-সংস্কৃত-কলেজের ব্যবস্থাপত্র

সত্যপি সামান্যতঃ কৈবর্ত্ত-সংজ্ঞাসম্বন্ধে মাহিষ্যাপরনাম-কৈবর্ত্তবিশেষাণাং নৌকর্ম্মাদিজীবী-দাশাপরনাম- কৈবর্ত্তবিশেষাণাঞ্চ মিথো জাতিতো ব্যবহারতশ্চ সমুপলভ্যতে মহদন্তরম্। তত্র তাবন্মাহিষ্য-কৈবর্ত্তা অনুলোমসঙ্করপ্রভবাঃ কৃষ্যাদিবৈশ্যাবৃত্তা জীবিকামাচরয়ন্তো দ্বিজাতিব্যবহৃয়মাণোদকাদিতয়া প্রচরন্তি। নৌবাহনমৎস্যাদিবিক্রয়জীবিনঞ্চ দাশধীবরাদিসংজ্ঞান্তরভাজঃ কৈবর্ত্তবিশেষাঃ প্রতিলোমসঙ্করপ্রভবাঃ অন্তজেষু পরিগণিতা দ্বিজাতিস্পর্শাদিব্যবহারানর্হা নিতান্তাপকৃষ্টশূদ্রা ইতি সর্ব্বতঃ প্রতীয়ন্তে। শাস্ত্রীয়ৈঃ খলু প্রমাণৈরাজানিক-প্রসিদ্ধ-লৌকিক-ব্যবহারদর্শনেন চ সর্ব্বথাপ্রমাণীক্রিয়তেহয়ং সিদ্ধান্তঃ–

তথাচ শাস্ত্রম্–

বৈশাশূদ্রোস্তরাজন্যান্মাহিষ্যোগ্রৌ সুতো স্মৃতৌ–ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনম্।

ক্ষত্রিয়াদ্বৈশ্যাকন্যায়াং মাহিষ্যসচ সম্ভবঃ।–ইতি পরশুরামসংহিতাবচনম্।

ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

–ইতিপদ্মপুরাণীয়বচনম্, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণস্য চ।

নৃপাজ্জাতোহথ বৈশ্যায়াং গৃহ্যায়াং বিধিনা সুতঃ।
বৈশ্যাবৃত্ত্যাতু জীবেতু ক্ষাত্রধর্ম্মং ন চাচরেৎ।– ইত্যুশনসোবচনম্।
নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যবর্ত্তনিবাসিনঃ॥–ইতিমনুবচনঞ্চ।

এভিস্তাবদ্বচনৈঃ মাহিষ্যাপরনাম্নাং কৈবর্ত্তানাং ক্ষত্রিয়াদ্বৈশ্যায়াম্ উৎপন্নত্ব-প্রতিপাদনাৎ তথা দাশাপরনাম্নাং কৈবর্ত্তানাং ব্রাহ্মণেন শূদ্রায়াং জাতান্নিষাদাৎ শূদ্রেণ বৈশ্যায়াং জাতায়ামায়োগব্যাং জাতত্ব প্রতিপাদনাচ্চ মাহিষ্যদাশয়োঃ সত্যপি কৈবর্ত্ত ইতি সামান্যতঃ সংজ্ঞাসম্বন্ধে জাতিতো যথাক্রমমুৎকর্ষাপকর্ষো অনুলোম-প্রতিলোম-সঙ্কর-জাতত্বেন নিরাবাধং ব্যবস্থিতৌ ইতি নির্ণীয়তে।

স্ত্রীষ্বনরজাতাষু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্। সদৃশানেব তানাহুমাতৃদোষবিগর্হিতান্॥ –ইতি সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।

–ইতি চ মনুবচনাভ্যম্ অনুলোম-সঙ্কর-জাতানং পিতুজাতিতঃ কিঞ্চিদ্ধীনত্বস্য মাতৃজাতিতঃ কিঞ্চিদুৎকর্ষস্য চ প্রতিপাদিতত্বাৎ। ন চ

ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলৌ তীবরসংসর্গাৎ ধীবরঃ পতিতো ভুবি॥

ইতি ব্রহ্মকৈবর্ত্তপুরাণবচনেন মাহিষ্যানামপি কৈবর্ত্তানাং মৎস্যবিক্রয়াদিজীবিকৈবর্ত্তেভ্যো জাতিতোহবিশেষঃ সিদ্ধতীতি বাচ্যম্। অনেন বচনেন বৈশ্যায়াং তীবরসংসর্গস্যৈব ধীবরজাত্যুৎপত্তিহেতুত্বপ্রতিপাদনেন ক্ষত্রিয়াৎ বৈশ্যায়াম্ অনুলোমক্রমেণ উৎপন্নানাং কৃষি-বাণিজ্যাদিবৈশ্যবৃত্ত্যেব জীবতাং মাহিষ্যপরনাম্নাং কৈবর্ত্তানাং ধীবরসাম্যকল্পনায়া নিষ্প্রমাণকত্বাৎ।

উক্তঞ্চ ভগবতা মনুনা-সঙ্করে জাতয়স্তেদ্বতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ। প্রচ্ছন্নাবা প্রকাশাবা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মাভঃ॥ ইতি অনেন খলু বচনেন তত্তষ্জাত্যুচিতচিরাগতব্যবহারদর্শনস্য তত্তষ্জাতিনির্ণয়াকত্বং ব্যবস্থাপিতম্।

এতদ্বচনব্যাখ্যাবসরে চ –"তথাগূঢ়া প্রকটাবা তত্তাষ্জাত্যুচিতকর্ম্মানুষ্ঠানেন জ্ঞাতব্যা"

ইতি বদতা কুল্লুকভট্টেন সর্ব্বথা সমর্থিতোহয়ং রাদ্ধান্তঃ।

"বৈশ্যাক্ষত্রিয়য়ো পুত্রমাহিষ্যা বৈশ্যধর্মকৃৎ।" ইতি পণ্ডিত-সর্ব্বস্ব-কৃদ্বচনেন ন চ মাহিষ্যপরনাম্নাং কৈবর্ত্তবিশেষাণাং বৈশ্যধর্ম্মকৃত্ত্বপ্রতিপত্তে অন্ত্যাবসায়িমধ্যে পরিগণিতেভ্যঃ মৎস্যজীবিকৈবর্ত্তেভ্যঃ স্পষ্টতঃ

প্রতীয়তে খলু মহান্ সমুৎকর্ষো জাতিতঃ কল্লুকভট্টকৃতায়াং মন্বর্থমুক্তাবল্যাং উদ্ধৃতেন উশনসো বচনেনাপি মাহিষ্যকৈবর্ত্তানাং বৈশ্যবৃত্তা আজীবনং টতয়া অবগম্যতে।

রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ। কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতা ॥ ইতি যমবচনেন মৎস্যজীবিনাং কৈবর্ত্তানাম্ অন্ত্যজমধ্যে পরিগণিতত্বাৎ সমুন্নীয়তে চ জাতিতো নিতান্তমপকৃষ্টত্বং মাহিষ্যপরনামেভ্যো বৈশ্যবৃত্তিজীবিকৈবর্ত্তেভ্যঃ।

চামারিং রজকং বেণং ধীবরং নটমেবচ। এতান্ স্পৃষ্টবা দ্বিজমোহাদাচামেৎ প্রযোতোহপি সন্ ॥ ইতি সম্বর্ত্তবচনেন রজকধীবরাদেঃ স্পর্শেন প্রায়শ্চিত্তোপদেশাৎ মৎস্যবিক্রয়াদিনিকৃষ্টজীবিকামবলম্বামানানাং ধীবরসমানধর্ম্মকৈবর্ত্তবিশেষাণাম্ অস্পৃশ্যত্বস্য নৈয়ত্যেন বৈশ্যবৃত্তা জীবন্মাহিষ্যকৈবর্ত্তাপেক্ষয়া দ্বিজাত্যস্পৃশ্যরূপং জাতিতোহপকৃষ্টত্বং সুতরাং অবসীয়তে। ন চ, "রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ" ইত্যাদি যমবচনে কৈবর্ত্ত ইতি–সামান্যতো নির্দ্দেশাৎ মাহিষ্যাণামপি কৈবর্ত্তানাং কুতোহস্ত্যবসায়িমধ্যেন পরিগণনম্। তথাচ তেষামপি –অস্পৃশ্যত্বাদিরূপাপকৃষ্টত্ব প্রসক্তি দুর্ব্বারৈব ইতি বাচ্যম্।

"সজাতিজানন্তরজাঃ ষটসুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ" ইতিমনুবচনেন সজাতীয়াসু জাতানাম্ অনুলোমসঙ্করজাতানাং চ ষণাং দ্বিজধর্ম্মত্বপ্রতিপাদনেন অন্ত্যাবসায়িতাসমানাধিকরণসংজ্ঞা সম্বন্ধমাত্রেণ অন্ত্যচকত্বকল্পনায়াঃ সুদুরপরাহতত্বাৎ।

অন্যথা

বর্দ্ধকী নাপতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক-কিরাত-কায়স্থ-মালাকর-কুটুম্বিনঃ ॥
বরাটো-মেদ-চাণ্ডাল-দাশ-স্বপচ-কোলকাঃ।
এতেহন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ ॥

ইতি ব্যাসসংহিতাবচনস্থকায়স্থসংজ্ঞামাত্রসম্বন্ধাৎ কায়স্থসংজ্ঞয়া প্রথিতানাং সাম্প্রতিকসচ্ছুদ্রাণামপি অন্ত্যজত্বাপত্তিদুর্নিবারৈবস্যাৎ। তস্মাৎ মৎস্যজীবিকৈবর্ত্তাপেক্ষয়া কৃষিজীবিনাং মাহিষ্যরূপকৈবর্ত্তানাং জাতিতঃ সুমহান্ সমুৎকর্ষঃ সিদ্ধঃ এবেদিত বিদাম্মতম্। তেন চ যজ্যুতে এব সাধারণসংজ্ঞাসম্বন্ধমাত্রেণ সম্ভাব্যমানাপকৃষ্টজাতীয়ত্বভ্রান্তের্নিরাসায় মাহিষ্য কৈবর্ত্তসংজ্ঞয়া এতেষাং ব্যপদেশ ইতি।

চিরন্তনাস্মদোদশপ্রচরদ্ব্যবহারদর্শনতোহপি মাহিষ্য-কৈবর্ত্তানাং বৈশ্যবৃত্ত্যা জীবিকামচরয়তাং দাশকৈবর্ত্তপেক্ষয়া জাতিতঃ সমুৎকর্ষ সমাঙনির্ণীত এব। শ্রূনুমস্তাবদুৎকলেষু বহবো মাহিষ্যা ইদানীম্ অপি উপবীত গ্রহণপরা পঞ্চদশাহাশৌচগ্রাহিণঃ কৃষ্যাদিবৈশ্যবৃত্ত্যৈব জীবিকামাচরয়ন্তঃ প্রচরন্তীতি। ময়ানগড়-তাম্রলিপ্ত-সুজামুঠা-গড়বেতাদি-সংজ্ঞাভিঃ প্রখ্যাতেষু তত্তদ্ভূভাগেষু অতিপ্রাচীনবংশসম্ভবা মাহিষ্য কৈবর্ত্তা ভূম্যাধিকারিণো বৈশ্যধর্ম্মাণ ইতিঃ প্রসিদ্ধি প্রামাণিকীতি প্রচরতি হুগলি-হাবড়া- চব্বিশপরগণা-কলিকাতা-মেদিনীপুর প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধসংজ্ঞাবৎসু তত্তদ্ভূভাগেষু নিবসতাং মাহিষ্য কৈবর্ত্তানাং বাহুবলীন্দ্র-গজেন্দ্র-মহাপাত্র-ভূপতি-ভূপাল-হাজরা- সেনাপতি-দিকপতি-মজুমদার-মল্লিক-চৌধুরী-বিশ্বাস- নায়ক-রায়-মণ্ডল-হালদার- পাল- ভৌমিক-সামন্ত-বাগ-আর্দ্ধক-পাত্র-দেওয়ান-বক্শী ত্যাদিভিঃ সচ্ছীলভুমিসম্ভন্ধে সৌভাগ্যসম্পৎপ্রতিপাদকৈরুপনামভিশ্চ প্রত্যাখ্যানাং মৎস্যবিক্রয়াদিজীবিভ্যো "জেলে কৈবর্ত্ত" ইত্যাদি দেশপ্রসিদ্ধান্ত্যজজনোচিতোপনামবদ্ভ্যো দ্বিজাতিভিরব্যবহার্য্যোদকাদিতয়া চিরন্তনপ্রসিদ্ভেভ্যোজালাদিজীবী-কৈবর্ত্তেভ্যো জাতিতোভেদঃ নিতরাং সমুৎর্ষকশ্চ প্রতীতিপথমবতরন্ প্রাকপ্রদর্শিত শাস্ত্রীয়বচনযুক্তিভিশ্চ নিতরাং সামর্থ্যমানঃ কথমপি কেনাপি ন শক্যতে নিরাকর্ত্তুম্ । ইতি সন ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৮২২ শকাব্দঃ।

ন্যায়ালঙ্কারোপাধিকস্য শ্রীনীলমণি শর্ম্মণঃ প্রবর্ত্তনয়া। সঙ্কলিতেয়ং ব্যবস্থা তদনুমোদিতা চ। শ্রীনীলমণি শর্ম্মস্বাক্ষরিতা। তর্কবাগীশোপাধিক শ্রীকামাখ্যা নাথ শর্ম্মণঃ সম্মত্যেহয়ং ব্যবস্থা। ন্যায়ভূষোণোপাধিক শ্রীলোকনাথ দেবশর্ম্মণঃ। বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রী তারাপ্রসন্ন শর্ম্মণঃ। শিবনারায়ণ শর্ম্ম শিরোমণেঃ কাব্যরত্নপাধিক শ্রীদেবেশচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ। সম্মতিরত্র তর্কভূষোণোপাধিক শ্রী প্রমথনাথ দেবশর্ম্মণঃ। শ্রী গোবিন্দ্র শাস্ত্রিণঃ সংমতোহয়মন্যর্থঃ। সম্মতিরত্র শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রিণঃ।

পরিশিষ্ট ২গ

১৯০৩ সালে বাংলার তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের নিকট বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির পাঠানো প্রতিবাদপত্র

To

The Census Commissioner of India

Dated, Calcuuta, the 10th July, 1903

Sir,

The humble memorial of the undersigned members of the Presidency Mahishya Samiti of Bengal most respectfully showeth :-

1. That your memorialists beg to submit for your consideration this humble representation embodying the objections of the Chasi Kaivartta (Mahishya) caste, as expressed through their representatives assembled at a special meeting held in Calcutta in January last to certain remarks made in the last Census Report of Bengal with regard to the origin and social position of the caste to which they belong, Your memorailists humbly pray that you will be pleased to modify the opinions you have stated in the Bengal Report , should the facts and reasons which they take the liberty of laying before you be deemed deserving of consideration.[1]

2. That the entire Chasi Kaibarta (Mahishya) community of Bengal are unanimous in offering their grateful thanks to you for the favour shown to them in recognising the name Mahishya as their case name, while the last census was being taken. But your memorialists did not imagine that the imagination got up by a few irresponsible news-paper correspondents against the recognition of the name Mahishya adopted by their caste people would ever prevail over an unbiased consideration of incontrovertible facts and arguments to such an extent as to lead to any alteration of the decision you arrived at, when you were pleased to aassure the members of the deputation of their community, who waited upon you for pleading their cause, that the name Mahishya would be recognised as a synonym for Chasi Kaivartta. Not only has the name Mahishya been not retained in the final returns, but to the great surprise and regret of your memorialists, their caste has been described as being of the same origin as the Jaliya Kaivarttas. This remark has given a rude shock to the feelings of the entire community to which your memorialists belong; and soon after the publication of the report, representative men of their caste from every part of the province assembled at a monster meeting held in Calcutta in January last, at which it was unanimously resolved to submit

[1] Mr. (afterwards Sir Edward) A. E. Gait I. C.S. was the superrintendent of census operation in Bengal in 1990- 01, and was also the cesus commissiner of India in 1903.

this humble memorial to you, setting forth such reasons as are based upon uncontroverted facts against the decision arrived at with regard to their origin and social position as recorded in the Census Report of Bengal. The delay which has occured in the submission of this representation has been due to the fact that your memorialists despatched trust-worthy representatives to different parts of the country to ascertain by personal knowledge, how far and whether or not, their contentions are based upon incontestable facts; and your memerialists beg to state that they would never have encroached upon your time and patience with this lengthy representation, had they not been thoroughly convinced that the remarks made in the Census Report regarding the origin and customs said to be extent among their people, are neither based upon facts, nor supported by reasons resting upon the evidence of undisputed authority .

3. That the remarks to which your memorialists and their community consider it necessary to take exception are following:

(a) "The Sloka from Padma Puran is, however said not to be found in the ordinary editions, and the quotation from the Brahmavaivarta Purana is incomplete; the next sloka goes on to say, _ytbbhu their connection with the Tivaras in the Kali Juga they become fisherman and were fallen. This passage, therefore, if it supports the alleged origin of the Kaivarttas as a whole, disposes at the same time of the claim of the Chasi sub-caste to be distinct from the Jaliyas on the strength of their alleged descent, even if it be genuine."

(b) "There seems to be no room for doubt as to the common origin of the two sections of Kaivarttas, and in remote tracts, such as tributary states in Orissa, intermarriage is still permitted between them."

(c) "Water is not taken from the Chasi Kaivarttas in all districts, but in some it is."

(d) "The dividing line between them and the Jaliya Kaivarttas is still far from clear or universally recognised; their Brahmins are more degraded than those of the Goalas, and the Chasi Kaivarttas themsalves will not eat in their houses. They serve as menial servants, their women do not usually observe *Jatyachar* and in many districts such as Dacca, Tipperah, Birbhum, Midnapurand Noakhali their water is not taken by the higher castes."

4. That your memorialists have carefully persued the very learned and valuable disquisitions in Chap. XI of the report showing the difficulties in the way of deciding correctly the origin and the true position in the socioty of the various castes in this country and they unhesitatingly accept the definition given in para 557 of the report that "a caste in an endogamous group or collection of such groups bearing a common name who, by reason or similarity of traditional occupation and reputed origin, are generally regarded by those of their country-men who are competent to give an opinion, as forming a single homogeneous community, the constituent parts of which are more nearly related to each other than they are to any other section of the society." And that your memorialists also beg to subscribe to the opinion that "the decision must rest with enlightened

public opinion and not with public opinion generally, as it often happens that a Hindu knows or cares but little about any caste other than his own.” Your memorialists further beg to express their complete acquiscene to the views stated in para 569 of the report supporting with certain qualifications the theories with regard to the origin of the mixed castes as found in the Hindu Sastras.

5. That judging by the standards laid down above, your memorialists venture to say that the question of ascertaining the origin and the past, as well as the present social status of their caste and of all other castes must be decided both by the authority of the sastras as well as by the light of historical research and public opinion independed of any *shastric* and traditional authority. There is no reason why the *shastric* authority on the origin of mixed castes is to be acknowledged in the case of some, but to be discarded in the case of others. The origin of such castes as Vaidyas, Kayasthas, the Navasakhs etc. is explained in the Puranas; and if this explanationis accepted in the authority in case of these castes, there is apparently no reason why the same authority should be thrown over-board in the case of the Chasi Kaivarttas. The opinion that “there seems to be no room for doubt as to the common origin of the two sections of the Kaivarttas” can never be up-held without completely ignoring the authority of the Shastras in which the separate and distinct origin of the two castes has been clearly described. According to the Gautam Sanhita, the Dhibaras or the fishermen Kaivarttas are the offspring of a *Vaishya* father and a *Kshastriya* mother and are a *Pratilom* caste,[2] while the Chasi Kaivarttas according to the Brahma Vaivatta Puran and Padma Puran are the descendants of a *Kshastri father* and a *Vaishya mother* and are therefore an *Anulom caste.*[3] Again in Manu Sanhita occurs the sloka which describes the origin of fisherman Kaivarttas in Northern India.[4] Suposing that the Kaivarttas mentioned above, had all a common origin, how can the existance of the slokas refferd to above and quoted below attributing a different parentage to each of the two peoples bearing the common name of Kaivartta be accounted for? The rejection of the authority of the Shastras with regard to the origin of the Chasi Kaivarttas can be justified only on the ground of satisfactory and conclusive evidence being produced to show that the slokas reffered to above are a later interpolation and are therefore spurious. But apart from a hazardous guess thrown out by a vernacular newspaper, the Murshidabad Hitaishi, that the slokas are not to be found in the ordinary editions and are therefore not genuine, no evidence worthy of consideration has yet been adduced by the opponents of your memorialists to prove the spurious character of the slokas. Your memorialists

---

[2] ”ব্রাক্ষণ্যজীজনৎ পুত্রান্ বর্ণেভ্য আনুপূর্ব্বাৎ ব্রাক্ষণসূতমাগধ চান্ডালান্তেভ্য এব ক্ষত্রিয়ামূর্দ্ধাভিসিক্ত ক্ষত্রিয়ধীবর পূক্কসানিতি।”
- গৌতমসংহিতা।

[3] ক্ষত্রবীর্য্যেন বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলৌ তীবরসংসর্গাৎ ধীবরঃ পতিতো ভূরি ॥
-ব্রক্ষবৈবর্ত্তপুরাণম্।

[4] নিষাদোমার্গবং সুতেদাশং নৌকর্ম্মজীবিনম্ ।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরায্যবির্ত্তনিবাসিনঃ॥

have not the least hesitation in asserting that the slokas do exist in the manuscript copies of the Purana in the library of the Benaras College as well as in other old manuscript copies to be found in Bengal, Orissa and Bombay.

Your memorialists beg to quote a letter from the Principal of the Benaras college acknowledging the existence of the sloka in the Manuscript copy of the Brahmavaivartta Purana.

Government College-Benaras

3rd January,1903.

Dear Sir,

In reply to your enquiry I have much pleasure in stating that the Sloka, as now quoted, does occur in our MSS. of the Brahmavaivartta Purana.

“ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলৌ তীবরসংসর্গাৎ ধীবরঃ পতিতো ভূবি॥”

Yours very truly

(Sd) A. VENIS.

Principal, Government College, Benaras

The Sloka also occurs in the manuscript copy of the Puran in the Library of the Asiatic Society of Bengal, the number of which MSS. is 21 G. I.

Manuscript copies of the Brahmavaivartta Puran in the Sankaracharya Math, and other Maths and in the houses of several eminent pandits of Puri contain the Sloka exactly as quoted by your memorialists.

Those who deny the existance of the slokas should take the trouble of producing a single authentic copy of the Puran to prove their allegation. Your memorialists cannot say precisely when the Brahmavaivartta Puran was first published in this country; but it must have been more than sixty years ago. When there was no Mahishya movement, nor any dispute about caste precedence such as occured during the last census. There is a Bengali Translation in verse of the Puran by Pandit Gayaram Batavyal published in B.S. 1249, from which the following lines describing the origin of the Chasi Kaivarttas are quoted.

“ক্ষত্রিয় পুরুষ আর বৈশ্যের রমণী।
সম্ভোগে কৈবর্ত্ত জন্মে বিখ্যাত অবনী।[5]

[5] The Kaivarttas are the offspring of Kshatriya father and Vaishya mother.

Pandit Ram Sevak Misra who lived in the court of Dalpati Sen of the Sen Dynesty, and who flourished before the time of Ballal Sen, thus speaks of the Halik Kaivarttas.

"ক্ষত্রিয় নামেতে দ্বিতীয় বর্ণের পিতা।
হালিকের জন্ম বা বৈশ্য যার মাতা ॥"[6]

Pandit Dharmananda Mahabharati in his pamphlet on the Mahishya question, gives the following in verse of what was written by Jaladhar Pandit of Chitagong, a contemporary of Raja Raj Ballav, about the origin and the social position of the Halik Kaivarttas.

"জালিকের ভবনেতে অন্ন, জল দান।
গ্রহণ করিলে হয় চণ্ডাল সমান ॥
হালিকের ভবনেতে অন্ন পাক চলে।
শাস্ত্রমতে হালিকেরে বৈশ্যজাতি বলে।
হালিকের পিতা হয় ক্ষত্র শস্ত্রধারী।
জননী যাহার বৈশ্যা শুদ্ধা নারী।"[7]

The quotations given above are all based upon the shastric texts about the separete origin of the two Kaivartta castes. For unless there were authentic texts in the shastras, the writers quoted above could not be supposed to have imagined they said in days when caste prejudices were most rampant. Your memorialists have no hesitation in reffering the unprejudiced enquirer who may have any misgiving about the genuineness of the sloka in the Brahmavaivartta Puran to the manuscript copy of the book in the Benaras College Library, since in the report mention has been made of this copy as the only genuine one. They would also requests him to ascertain by reference to the Mahanta of the Sankaracharya Math in Puri, the great repository of ancient sanskrit manuscripts, to any Pandit of the old school renowed for his eradition, as to whether the sloka as quoted by them, is genuine or not. Your memorialists would have forwarded with this a manuscript copy of the Puran for your satisfaction; but they apprehend that any such book forwarded by them may be suspected to be of doubtful genuineness as coming from interested parties.

6. That it has been stated in the report that the sloka quoted by the memorialists from the Brahmavaivartta Puran, even if genuine, is neverthless incomplete, and that the second line of the sloka goes on to say that "by their connection with the Tivaras in Kalijuga, they (meaning the Chasi Kaivarttas) became fishermen and were fallen." That this interpretation of the sloka is absurd and erroneous has been sufficiently established by the authoritative decision of a

---

[6] The Haliks are the offspring of a Vaishya mother and a Kshatriya (second caste) father.

[7] If one takes water and fond in the house of a Jalik he becomes an out-caste like the Chandal. But there is no objection to take food in the Haliks, as according to the Shastras they are a Vaishya caste, being descended of a father who belongs to the warrior (Kshatriya) caste and a mother of the pure Vaishya caste.

host of eminent pandits of this country as will appear from a perusal of the accompanying pamplets in which these opinions have been published. The sloka from Brahmavaivartta Puran, if literally translated would mean this: "The people called Kaivartta are the offspring of a Kshatriya father and Vaishya mother. The Dhibaras in Kalijuga have become fallen by reason of their connection with the Tivaras." Why the name *Dhibara* should be used and not the pronoun they or the name *Kaivartta* when the latter name only was meant, has not been explained by those who would put the above interpretation on the sloka. If the framer of the sloka had meant to say that the Kaivarttas were fallen by reason of their connection with the Tivaras in the Kalijuga, there is no reason why he should not have used the word Kaivartta or a pronoun for it when he was speaking about that people only.

That this is the correct interpretation of the sloka is borne out by the texts in the Padma Puran and the other works which your memorialists have already reffered to. If the genuineness of the sloka from the Brahmavaivartta Puran be accepted, it does by no means support the common origin of the Kaivarttas as a whole, nor does it dispose of the claim of the Chasi Kaivarttas to be distinct from the Jaliyas. On the contrary it clearly proves that the two were distinct castes, one of which (because both were known by the same common name) the Dhibaras became fallen in the Kalijuga. The rejection of this interpretation would drive one to the only other alternative (supposing that the sloka speaks of the origin of the Kaivarttas as a whole) that the section called Dhibaras were fallen in Kalijuga, but not the other section; for if both were fallen, where was the necessity of speaking of one only? But the acceptance of this explanation would militate against the sloka in the Gautam Sanhita describing the origin of Dhibaras, and also against the slokas in the Padma Puran and other works about the origin of the Chasi Kaivarttas.

The derivation of the work Kaivartta given in para 612, is contradicted by the rules of Grammar. The word Ka did not bear the meaning of water in Sanskrit books. Moreover the word Ka means also pleasure, Brahma, wind etc, and the word may be derived also in other ways.

That the origin of the mixed castes has been illustrated in the report by the example of the Shagirdpeshas of Orissa. Some of your memorialists have personal knowledge of this people, and are intimately acquainted with their customs and usages. The name includes people who are the offspring of Marhatta and Oorya, of Bengali and Oorya, as well as of up-country Hindu and Oorya parents, the mother being of the Oorya stock. There are also Shagirdpeshas born of Oorya Brahman fathers and karan or khandait mothers. It would be the height of absurdity to say that these various groups of Shagirdeshas constitute one single caste, because they are all denominated by a single name. These people have all along maintained the distinction peculiar to their paternal castes, and there is no intermarriage between a higher and a lower class or case of Shagirdpeshas. By origin as well as by their social position, they are a group of separate castes,

known by the common appellation of Navashak in Bengal. Where them is the improbability of two castes, the offspring of a Kshatriya father and Vaishya mother, and those of the Vaishya father and Kshatriya mother, being known under the cognomen of Kaivartta, but preserving from the earliest times, the distinctive position of each in society, just as the several castes of the Shagirdpesh have been doing in more recent times?

8. That if the Shastric authority on the origin of the Chasi Kaivarttas stands on a firm basis, what other evidence is there to prove their common origin with the fisherman Kaivarttas? We may anticipate the answer to such a question in the remarks made in the census report which may be summarised as below:-

(a) There is intermarriage between the two sections or castes of the kaivarttas, as for instance in East Bengal and in the Tributary states of Orissa.

(b) Water is not taken from thr Chasi kaivarttas in all districts, but in some it is taken.

Intermarriage between the two castes, intermarriage that is sanctioned by and recognised in society, is entirely unknown in any part of Bengal or Bihar where the Chasi kaivarttas, dwell. The customs and usages with regard to marriage which are and which have been observed from time immemorial by the members of the Chasi kaivartta caste in all parts of the country are as strict as that prevail among the Brahmins and kayasthas. Isolated instances of marriages between people of the Chasi kaivartta caste and those of any other caste, either higher or lower, are to be found in certain places in the Eastern Districts where intermarriages of this kind between people of different castes are neither unknown nor rare.

But these spurious marriagees are never recognised in society, and the families who are thus united by this kind of marriage are always boycotted. Your memorialist have not the least hesitation in challenging their worst opponents to prove that the cultivating Kaivarttas in the districts of Pabna , Nadia, Rajshahye ,Bogra, Dinajpur ,jessore , Faridpur, Murshidabad, Dacca , Howrah ,24-Pargannas. Hugli ,Burdwan ,Midnapore, Malda, have ever knowingly taken within the pale of their society men who have been united by marriage with people of the Jaliay Kaivartta caste . Their is no doubt that instances may be found of men of the fisherman – Kaivartta caste entering the pale of the society of the chasi Kaivartta under the disguise of being a member of the latter caste . But no Hindu caste is free from intruders of this kind and this kind of intrusion of the jaliya kaivarttars into the society of your memorialist can not be considered as an evidence of the prevalence of inter-marriage between the two caste .[8]

[8] In Sylhet, Mymensing, Nokhali, the Kayasthas and Vaidays intermarry. In Sylhet Vaidays, Kayasthas and Chasi Kaivarttas intermarry.

Your memorialists have carefully searched into the present as well as the past census reports ,and they are constrained to say that neither a minute examination of these reports , nor their personal knowledge and the information collected by their special representative who was deputed to orissa , enable them to assume that there is any chasi Kaivartta family in orissa including the eighteen Gurjats. The people who correspond to the caste of your memorialists in that province are the khandaits and the chasas. The people who are known by the name of Kewet in Orissa and who have been mentioned as corresponding to the Kaivarttas (whether the cultivating or the fishing it does not seem clear from the report) are a people who have never been considered by any Hindu of Bengal or Orrisa , or any learned antiquarian or historian as being of a common origin whit the Chasi Kaivartta of Bengal . Irrespective of all Shastric considerations whatever test may be applied, anthropometric , physiological or psychological , these Kewets in Orissa and Behar will always be found , in the option of every unprejudiced observer who has studied the physiognomy, intellingence, manners and usages of the Kewets, that they can, by no stretch of imagination, be thought to be the kith and kin of the Chasi Kaivarttas of Bengal. Dr. Hunter in this Statistical account of Monghyr, Bhagulpur, Tirhoot, and Purneah has grouped the Kaivarttas, and the Kewets as totally distinct caste, the former being placed along with Aguri, Bauri, Koiri, Tambuli under the head of clean agricultural castes, and the latter under the head of fishermen castes. The *Kewets* of Orissa have also been placed by him under the head of fishing and not under agricultural castes.Where then are the cultivating and the fishing Kaivarttas in the Tributary States of Orissa among whom intermarriage is said to be prevalent? It may be that same of the *Kewets* have lately taken to agriculture, and are trying to pass for *Chasi Kaivarttas*. But a change of occupation by the members of any caste among the hindus has never been considered by them as a claim to their incorporation with the numbers of the caste whose profession is adopted.

9. That during the last census, in the Eastern Districts of Bengal, many families of Jaliya Kaivarttas who had adopted agriculture as their profession attempted to pass for, and we do not know if they succeeded in getting themselves returned as Mahishyas or Chasi Kaivarttas. Indluential men among Brahmins and Bayasthas, specially enumerators and superintendents belonging to these caste, induced, out of a malicious spirit, many Jaliya Kaivarttas to get themselves Mahishyas, Your memorialists are prepared to adduce many instances of this as well as of other mischievous tricks played by enumerators and superintendents during the last census, mostly in Eastern Bengal. One of such tricks was the radiculous explanation of the name Mahishya that it meant the offspring of a *buffalo*. The telegrams and and numerous petitions which were sent to the collectors of Districts

and to the Superintendent of Census operations in Bengal, are evidences of the attempts made by enumer actors and superintendents to create confusion among the Chasi Kaivarttas to get themselves returned as Mahishyas .

10. That the existence of suce names as Halik Das Parasar Das & c, can never be misconstrued into being an evidence of the Chasi Kaivarttas being of the same origin as the Jaliya Kaivarttas . But it is a conclusive evidence of the attempts, dictated by common sense, which have, from the earliest times, been made by the people of the Chasi Kaivartta caste to distinguish them from the fisherman caste. It is a significant fact that such names have been adopted only in localities where both the caste dwell. It is not the outcome of the Mahishay movement, thought it originated for the same reason for which the name Mahishya has been adopted.

11. That it is a fact that in same localities specially in East Bengal, water touched by the Kaivarttas is considered impure by the Brahmins. But this does not go to prove that the fishing and the cultivating Kaivarttas are of one and the same caste. On the contrargy, it is in the humble opinion of your memorialists, a convincing proof of the fact that there have existed two distinct castes under the name of Kaivartta, one of which has been considered impure in society. If Ballal Sen ever raised or attempted to raise the social status of the Kaivarttas, it must have been that of the Jaliya Kaivarttas. The following reasons will, we venture to hope, convince every unprejuiced mind of the soundness of the above opinion.

(a) The objection to take water from the Chasi Kaivarttas is only to be met with in localities where both the castes are found.

(b) Neither tradition nor history can supply any evidence that the water touched by the Halik Kaivarttas was ever considered impure by Brahmins in those districts of Bengal (enumerated in para7) where this caste predominates, and where three are only is olated familoies of Jailya Kaivarttas.

© It is in the neighbourhood of the *capitals* of Ballal Sen, of places where his authority must have been more paramount, that the higher castes have, from time immemorial, objected to taking water from the Kaivarttas. If the traditional social elevation of the Kaivarttas *as a whole* was a fact, why then should Brahmins and Vaidyas in the out line districts of kingdom of Ballal where his authority must have been less felt and obeyed, never have objected or do now object to take water from the Kaivarttas, while the kindred of these very Brahmins who dwelt near the seat of the central authority and who appear to have obeyed all other social regulations of Ballal, should dare violate his injunction in regard to taking water from the Kaivarttas? Surely, the Brahmins in one part of the country were not less

orthodox and more liveral then their breathern in the other parts. The only hypophesis which gives a reasonable explanition of this anomaly, is that Ballal attempted to make the water touched by the Jaliya Kaivarttas acceptable to the higher castes, and that these Jaliya Kaivarttas existed. As they do now exist, in very large numbers in East Bengal. But the attempt must have failed the water touched by the Halik Kaivarttas was, and has ever been, acceptable to the Brahmins and as these people lived and do still mostly lived in the parts of the country where Jaliks were and are still very rare, the injunction of Ballal, it was not found necessary to obey. The Ballal legislation has not raised the social status of the Jaliks so as to cause them to be incorporated with the Haliks. It has only served to drag down isolated families of the latter caste dwelling in localities where the other caste predominates. It has been mentioned in a footnote in a para 612 of the Report that in the Nadia district the Brahmins have lately arranged not to take water from the Chasi Kaivarttas, as a sign of there disapproval of the Mahishya movement. Some of your memorialists are natives of the Nadia District, and have intimate knowledge of the state of society in every part of it. Your Memorialists have not the least hesitation in asserting that in the Nadia District no Brahmin has ever objected to take water from the poorest Mahishya cultivator. As a convincing proof of what your memorilists state, they may be permitted to mention that about a month and a half ago, on the occasion of a sradh ceremony in the house of gentleman of the Meherpur sub- division, Pandits from Nabadwip and other places were invited. These pandits *attended the ceremony* and accepted *presents and offerings*, a favour which only Brahmins and high caste Baishyas and Sudras can alone accept from them. There are party quarrels in every village in this country, and many of these quarrels often end in one party temporarily arranging not to eat in the house of the other; and the incident mentioned in the note, if true, might have its origing in some such kind of difference between some people of the caste to which your memorialists belong and there Brahmin neighbours.

(d) There are certain slokas both in Sanskrit as well as in Bengali about the Ballal tradition which your memorialists beg to discuss here, as they will throw much *light* on this much disputed question as to wheher the Haliks or the Jaliks were rewareded by Ballal Sen. King Madhab Sen of the Sen Dynasty flourished 21 years after the close of Ballal's reign . In his court lived Edu Misra who thus speaks of the reward given by Ballal to Surja Majhi for his services.

সূর্য্যদ্বীপ জালিক সূর্য্যের পুরস্কার।
যারা লক্ষ্মণে আনে অনুদিতে ভাস্কর॥
সূর্যদ্বীপের কিছু হালিক রাজ্যে খ্যাত।
অন্য অংশ লাট আর কঙ্কদ্বীপে বিবৃত ॥

It appears from his sloka that the tracts of the country Known as *Lat* and *Kankadwip* belonged to the Haliks , and that the fisherman Surja Majhi got for his reward 'Jogindra dwip.'[9] This incident was also mentioned by Nulo Panchanan, a writer on social topics , of undonbted authority who flourished about 400 years ago.

সূর্য্যদ্বীপ স্ত্রির্ভিভাগৈঃ সরিদগত্যা বিভাজ্যতে।
তে লাটকঙ্কযোগীন্দ্রা ভৈরবেচছাদিযোগতঃ॥
যোগীন্দ্রঃ ধীবরপ্রাপ্তঃ লাটোদাসস্য রাজ্যকম্ ।

It appears from the testimony of both these authorities that the tracts called Lat and kankadwip were the Kingdoms of the Haliks, and that according to the latter authority a portion of the Surja-dwip which was granted to the Jalik Surja Majhi also belonged to the Haliks. The Haliks were therefore a distinct caste from the Jaliks prior to the time of Ballal Sen, and they were not mere cultivators but owners of large tracts of country. It also clear from the above that Ballal rewareded the Jalik Surja Majhi , and not the headman of the whole Kaivartta community as is generally, and we cannot help saying, some what preversely, and we cannot help saying, some-what perversely maintained by our crities.

(e) As bearing upon the question of the distinct origin of the two castes, your memorialists beg to mention another fact which has been wholly ignored by those who would attribute a common origin to the two Kaivartta castes.The Gurus or spiritualguides of the Chasi Kaivarttas all belomg to the higher class Brahmins, those Brahmins who are also the Gurus of Baidyas, Kayesthas and Navashaks. But these Brahmins are nowhere known to have been or to be the Gurus of the Jaliya Kaivarttas. It is not that during the recent times, because the Chasi Kaivarttas have advanced in their social condition, that they have succeeded in spending much wealth in obtaining Gurus from the higher grades of Brahmins. The institution of having a good Brahmin as the spiritual guide of a family has existed amongst them, as amongst other Hindu castes, from the earliest times of which they have any record and instances of any family of Brahmins or Sudras forsaking the family Guru or the sptritual Guide of the ancestors are very seldom to be found. On the death of a Guru, his successor inherits the disciples of the former just as he inherits his other property according to the Hindu law of inheritance and succession. It is also considered an inexpiable sin to abandon one's family Guru and accept another in his place .the ancestors of the families of Brahmins who are now the Gurus of the Chasi Kaivarttas must have been the Gurus of the ancestors of the latter from the earliest time when this institution came to exist.The poor

[9] Sambandha Nirnya Pandit Lalmohan Vidyanidhi page 567.

cultivators among the Chasi Kaivarttas have the same Brahmins for their spiritual guides as the rich Vaidyas, Ksyasthas and Navashaks have. But no Jalia Kaivartta, however rice, has as yet succeeded in claiming openly the discipleship of any such Brahmin Guru. If the two kinds of Kaivarttas were only two sections of one and the same caste, there is no reason why the Brahmins should dicard the one and accept the other for their disciples when this profession of acting as Gurus is a very lucrative one.

(f) The priests of the Chasi Kaivarttas, as is well known, are Brahmins who form a class by themselves. Whether they were originally a Sudra caste invested with the holy thread and authority by Bellal Sen (a fiction of which there is not the slightest foundation in facts) or whether they were the earliest Brahmin settlers of Bengal who thrown into the shade by the advent of the Kanauj Brahmins and afterwards boycotted because of their unwillingness to submit to the authority of the new-comers (a view which is held by every impartial enquirer into the early history of the Bengal Brahmins), it is an undeniable fact that their Brahmins are family priests only of the Chasi Kaivarttas, and not of the Jaliya Kaivarttas. If any of these Brahmins out of greed would serve as a priest in the house of a Jaliya Kaivarttas, he would surely be boycotted by the members of his own society as well as by the Chasi Kaivarttas of whom he is the recognised priest. These Brahmins who are the priests of the Chasi Kaivarttas do still possess Brahmattra lands granted to their ancestors by the Raj-families of Natore and Nadia as well as by many other Brahmin zaminders in the province. But no priest of the Jaliya Kaivarttas can point to a single instance of any such grant of land having been made to his ancestors. Your memorialists will discuss later on the somewhat startling assertion that they do not take water from the hands of their priests.

(g) As an instance of how scrupulously the Chasi Kaivarttas sought to preserve their distinction from the Jaliya Kaivarttas. Your memorialists beg to state the following incident mentioned by Gadadhar Bhatta in his book on geneology (Kulanji) and quoted by Pandit Dharmananda Mahabharati in his pamphlet on the Mahishya question. In the reign of Ahamed Shah, an Afgan prince, a number of Chasi Kaivartta families migrated from their homes and settled at Metari in the kutwa Sub- division of the Burdwan Disteict. When asked of the reason of their migration they are have answered thus:-[10]

(a) আচাররহিতে দেশে বাসাদ্ধর্ম্মক্ষয়ো ভবেৎ।
(b) বরং দেশং পরিত্যাজ্য যামো দেশান্তরং বয়ং
তথাপি জালিকগৃহে করিষ্যামো ন ভোজনং ॥

[10] ষদাহস্মদসাহাখ্যো নৃপতির্যবনোহভবেৎ।
তদাতু তস্য দৌজন্যাৎ কৈবর্ত্তাঃ কৃষিকারকাঃ॥
উত্তরাদেশাদাগত্য গঙ্গাতীরে সুশোভনে
মেট্টারি নামকে গ্রামে বসন্ সার্দ্ধপুরোহিতৈঃ॥

"We do not like to live in a place where we are asked to pertake of water and food in the house of Jaliyas". The above named writer also gives the following lines into which he has translated a Sloka in a book written in Sanskrit.[11]

হালিক আমার জাতি বাস বৰ্দ্ধমানে।
না করি ভোজন মোরা জালিক ভবনে॥

The purpose of these lines is that being Haliks we do not eat in the house of a Jalik.

11. That the facts and reasons which your memoriakists have stated above may now be judged by the standard of the definition of caste laid down in the report. It must be admitted by every impartial critic from a perusal of the above, that the Chasi Kaivarttas from an *endogamous group or collection of groups,* that they all claim the *same reputed origin* and that they also form a single *homogeneous community*. It now remains for your memorialists to consider how their caste is regarded by those of their *countrymen who are competent to give an opinion,* and whether *intelligent pulic opinion,* and not *public opinion generally,* supports the views they have stated in the foregoing paragraphs.Your memorialists do not think that by *intelligent public opinion* is meant the haphazard opinion of a big nobleman with no personal experience of any socity, not even of his own,and whose opinion is more a whim than the result of experience.Your memorialists understand by the expression the opinion of such persons as have experience of society, have thought over social questions, and who by their education and uprightness command the respectof the people among whom they live.

In all questions concerning caste and other institutions in society the opinions of the Pandits of the old school in this country are still regarded as the final authirity.Your memorialists have collccted the opinions (the Bhashpatras or authoritative decisions) of the several schools of Pandits of this country.

These opinions may be summarised as below:-

(1)The decisions of the Pandits of Vikrampur and Chandrapratap obtained in the year 1864 under the signature of 64 eminent pandits.

[11] ইতি নিশ্চিত্য তদ্রাত্রৌ হালিকাঃ সপুরোহিতাঃ।
গৃহং গ্রামং পরিত্যজ্য দক্ষিণাশাং সমাযজুঃ॥
কেচোবানুসৃতা স্তেসামুত্তরস্যাং দিশি দ্বিজাঃ।
বিখ্যাতস্তেহভবন্ রাঢ়ে দক্ষিনোত্তরশ্রেণীনা॥
কুলঞ্জী, গদাধর ভট্টকৃত।

(2)The dicision of the Pandits of East Bengal that the Mahishyas and the Chasi Kaivartas are but one and the same caste as published in the paper named *Uddipan*, signed by fifty Pandits.

(3)The decision of the Pandits of Navadwip obtained in the year 1297 B.S. supported by the decision of the Pandits of Bhatpara in 1298 B.S.

(4)The decision of the leading pandits of Midnapur, Orissa and other parts of the country given at a meeting held at Tajpur in the year 1298 B.S.

(5)The decision of the leading Pandits of Navadwip, Benares, Chitrakut and Puri Muktimandap given again at a meeting held at Tajpur in the year 1304 B.S.

(6)The opinions of the Pandits of the Sanskrit College, Calcutta obtained in 1901.

(7)The decision of the leading Pandits of Navadwipa obtained in the year 1309 B.S.

The author of Sambandha Nirnayan, Pandit Lalmohan Vidyanidhi who is now considered an authority in regard to the questions conccrning caste and social topics, thus speaks of the Chasi Kaiverttas.

The Das are the Haliks. *They can claim the caste name Mahishya.* Their occupation is cultivation, and their origin is thus stated in the Brahma- Vaibartta Purana. Here occurs the Sloka quoted "*The Kaivarttas have been cultivators from the beginning, and water from them is acceptable. They have served the Brahmins from time immiemorial. Being in contact with the Brahmins their customs and usages are those of the class Sudras. Many of these people were zamindars prior to the time of Adisur.*"

Then again-

Hence it must be admitted that the Das people are pure Sudras, that is Mahishyas not entitled to wear the holy thread.[12]

The above is the translation of an article by the pandit which appeared in the Education Gazette 19th Chaitra, 1304 B.S.

Dr. Jogendra Nath Siromoni the elected president of the pandits of Nadia thus wrote about the Chasi Kaivarttas in his book on Hindu Castes and Sects.

"The Chasi Kaivarttas of Bengal from an important section of its rural population.In the district of Midnapore, they may be reckoned among the local aristocracy. In other districts where they are found,

*their position is only next to that of the Kayasthas.*In the Tamluk and Contai Sub-Division of the Midnapore Districts, the Kaivarttas may be said to form the upper layer of the local population. A great many of them are Zaminders and holders of substantial tenures. They were a well-to-do class until recently. In the metropoliton districts of Nadia and 24 Parganas, the Kaivarttas from the lower

[12] The above is the translation of an article by the Pandit which appeared in the Education Gazette 19th Chaitra, 13o4 B.S. Sambandha Nirnaya Parishishtha page 566.

layer of the middle class. In the former district they may be said to have even higher position."[13]

Babu Kedar Nath Dutta a retired Deputy magistrate in this book on *Jatinirnaya* or the ascertainment of castes thus writes.[14]

"This caste, the offspring of higher castes as described in Padma Purana and Brahmavaivartta Purana, can never be considered as a low caste." *"The Kaivarttas are reckoned among the pure castes."*

The Brahmins and other high castes unhesitatingly take water from them. Accorting to the Jajnabalk and other Sanhitas, the Mahishyas are the offspring of a Kshatriya father and Vaishya mother. Such an offspring is called in Padma Purana and Brahmavaivartta Purana by the name of Kaivartta. *Hence it is clear that the Pure Kaivarttas and the Mahishyas are but one and the same caste. The names are only different in different books.* This caste had many principalities in Bengal in old times. There are many respectable and renowned families among this people. In education and culture they are not much behind others."

Babu Jogendra Nath Das M.A. the Editor of the Vernacular paper Samaya in which some years ago the Mahishya question was much discussed, thus expressed his own opinion about the caste.[15]

"Mahishya is the special name of this caste, the Chasi Kaivarttas. Hindu Soceity is not against their claim to be recognised as Mahishyas; because the water of this people is acceptable to the Hindus."

Babu Rashik Lal Ray, a writer on social questions thus wrote about this people in the Samaya Newspaper under date Sraban 7, 1305 B. S.[16] There has been much controversy about the Mahishya question for some time past. Several books and pamphlets on the subjects have been published. Our Mahishya friends have conclusively proved the futility of the arguments of those who would call the Kaivarttas - low-class people. These Mahishya people cheifly dwell in Western Bengal and there are many rich men and Zeminders among them.

The late Babu Nilkanta Mozumder M A. auther of "Are we Aryans" said, "in my opinion the Halik Kaivarttas are Baishyas"

The auther of Bengal Purohits says," the Halik Kaivarttas are Vaishyas."[17]

Your memorialists have been able to quote only such opinions as have appeared in books, pamphets or Newspapers . But the opinions of intelligent and well-informed men in society who have not written or published any opinion concerning your memorialists, are also worthy of consideration. All that your memorialists can say about their opinions is this, that of any one would go to any

---

[13] Hindu Castes and Sects pt 279-281.
[14] Jatinirnaya pp. 85-89 and introduction. The above is the translation of the text.
[15] Hindu Castes and Sects p. 279-281.
[16] Jatinirnaya pp. 85-89 and introduction. The above is the translation of the text.
[17] Quoted by Pandit Dhamananda Mahavarati.

village in any of the districts they have named and if he would ask the Brahmins or Vidyas as to what they know or think about the Chasi Kaivarttas, he would invariable receive this answer that the Brahmins and Vaidyas regard the Chasi Kaivarttas in the same light as they regard the other pure Sudras including the Kayasthas in the village.

13. That the position in society of all the Sudra castes Kayasthas not excepted, depends very much on their circumstances in life. To illustrate this by a few instances will not be out of place here. Many of the people included in the group of Nabashaks, serve as domestic servants of rich, well-to-do Chasi Kaivarttas in various parts of the country. Not only Nabashaks but poor Kayasthas also serve as domestic servants of Chasi Kaivarttas in many places as well as of rich Nabashaks. On the other hand Chasi Kaivarttas also serve the Kayasthas in the capacity of servants. Your memorialists have known Kayasthas serving in the house of Telis as domestic servants. These Kayasthas are not natives of other districts, but are the neighbours of those whom they serve. Society allows all this, because it cannot help doing so. There is as wide a gulf between the rich Kayastha Zemindars and high officials or professional men on one hand, and the *Nangal Kaeths* (ploughmen kayasthas) of Pabna, the *golam* and *boatmen* Kayasthas of Eastern Bengal, the Kayastha hawkers of Calcutta, as between the historic houses of Tamluk, Suja Mutha, Turka &c, in Midnapore and the poor Mahishya cultivators who are their tenents. Not only in different districts, but in different parts of the same district, no particular Sudra caste can be said to posses the same position in society. The Navashaks do not occupy and they have never occupied a higher position in society than the Chasi Kaivartta in all the districts we have already named, When invited in the house of a Brahman or a Baidya, the Navashaks are never shown any precedence over the Chasi Kaivarttas as regards the order in which the several castes are feasted. They and the Chasi Kaivarttas and in many places the Kayasthas, are feasted at one and the same time, and not one after another. This is one of the crucial tests recognised in Hindu Society with regard to the precedence of castes. But this fact does not seem to have been considered by the members of the caste precedence committee of Bengal during the last census, in assigning the position of the caste to which your memorialists belong, with respects to that of the Navashaks.

14. That one of the reasons for assigning the social position of the Chasi Kaivarttas in group IV is that their Brahmins are said to occupy a lower rank than the Brahmins of the Goalas. There are two kinds of Goalas, those who sell milk, ghee &c. and those who brand bulls. The Brahmins of the former in some districts as in Pabna, are the same as those of the Navashaks; and these Brahmins no doubt occupy a higher social position than the Brahmins of the Chasi Kaivarttas. But it would be a gross misrepresentation of facts to say that the Brahmins of the Chasi Kaivarttas are inferior to the Brahmins of the Goalas who brand bulls.In this connection certain remarks have been made about the position in society of the

people to which your memorialists belong which have shocked and astounded them no less than they have surprised people of the other castes who know your memorialists better. To quote the remarks again, “They (the Chasi Kaivarttas) serve as mental servants; their women do not usually observe Jatyachar and in many districts, such as Dhaka, Tipera, Birbhum, Midnapore and Noakhali, their water is not taken by higher castes.

Your memorialists have already discussed the question regarding the taking of water from the Chasi Kaivarttas. Their last reply to this kind of remark is that they have never claimed kinship with the Jaliya Kaivarttas of Tippera, Noakhali and Birbhum or their kindred in certain parts of Dacca and Midnapore, and they are bold enough to assert that their is no Birbhum, whether Rarhi, Varendra or Baidik in the last named district who (provided that he is accustomed to take water from the hands of a Sudra) can have the audacity to decline taking water from the numerous Chasi Kaivarttas who are natives of the of the districts.

That the Chasi Kaivarttas serve in the capacity of domestic servants in the house of Brahmins and sometimes in the house of Kayesthyas has already been mentioned. Your memorialists do not clearly understand what kind of service is intended to be connoted by the word “menial”. If the above kind of srevice is meant, then their reply is that the Kayesthas and Navashaks are equally guilty with the Chasi Kaivarttas. If statistics be taken, the number of Kayestha domestic servants will be found to be much greater than that of Kaivartta servants. There are entire communities of Kayesthas in East Bengal called Nafar, Golam, Sikdar, which names mean a slave. But who can point to a single class among the Kaivarttas sigmatised as *Nafar* or *Golam*?

What is meant by *Jatyachar* your memorialists do not clearly understand. Probably it means the observance of *Ekadashi* or fasting by widows on the 11th day of lunar month, and the abstaining from taking fish by them. If this be the meaning of ‘*Jatyachar’*, then your memorialists venture to say that among the well-to-do and educated sections of the Chasi Kaivarttas and also among the cultivators living in villages where there are Brahmins and Vaidyas, the widows do universally obsreve Ekadashi and abstain from taking fish. But the custom is not universal among the poorer section of the people living in localities where the influence of the examole of Brahmins and Vaidyas is not so much felt. But what is the case with the Navashaks and the lower sections of the Kayesthas? Whether educated or not, whether poor or rich, their widows rarely abstain from taking fish and rarely observe Ekadashi. If any one will dispute the truth of this statement, your memorialists will be glad to take him with them to any village in the Province and prove to his satisfection and absolute correctness of what is stated here. Your memorialists sincerely grieve to say that the benign Government should take advantage of its exalted position of and high authority to unjustly brand with opprobrium an innocent people whose only fault seems to have been

their honest attempt to remove certain errors and misconception regarding their caste and society, which some ill-informed persons managed to create in the mind of their masters when the first census in the country was taken.

There is another astonishing remark in the report that the Chashi Kaivarttas do not take food in the house of their priests. It has not been mentioned in what district or locality or village, this custom unheard of by your memorialists, prevails. Probably this custom is meant to be universal. All that your memorialists beg to say about it is that the Chashi Kaivarttas do not only take food inthe house of their priests but eat their leavings. The Brahmins, and the Vaidayas who take from their hands do know that the Chashi Kaivarttas eat the leavings of their priests and that they do it in every district and village where they live. Probably this superstitions (your memorialists can call it can not call by any other name) is based upon a custom which prevails only in the family of the Rajas. of Turks (midnapore) who have cgot priests from two classes of Brahmins, one of whom is held in higher estimation than the other. But in the District of Midnapore,the Brahmins who perform the priestly service of the Chashi Kaivarttas have better social position than their brethren in other parts of Bengal. It is also a fact that the Brahnins of the Chashi Kaivarttas in some of the districts of Behar where they are found, are not looked down upon by the other Brahmins as in Bengal. The Brahmins of the Chashi Kaivarttas are called Vyasokta Brahmins in the reprt upon the authority of atradition. If the traditin be accepted, as a historic evidence of unquestioned credibility, does it not prove conclusively that your memorialists are the decendents of the Mahishyas, since the first Vyasokta Brahmins according to the Shastras were the family priests of the sons of the Bidur who figured so prominently in the wars of the Mahabhrata and who was a Mahishya, being the son of a Kshatrya father and a Vaishya mother?

15. That in a footnote to para 612 of the report the opinion of Dr. Grierson has been quoted. The learned doctor has hazrded the guess that the Kaivarttas are a non-aryan race, owing originaly some non aryan language, afterwords speaking a corrupt patois of oorya, on which "as a basis they have built the dialect of Bengali which they speak in their present home," With due difference to hte erudition of the learned doctor, your memorialists beg to enquire what is the true test by which they can ascertain whether a particular people is of Aryan or of non-Aryan origin? If the language test be the surest and the only test, then your memorilists may be permitted to say that there are no people of Aryan origin in Midnapore; for do they not all, Brahmins, Kayesthas, Vaidyas speak a dialect which is a mixture of Bengali and a corrupt form of Oorya? Who except Dr. Grierson, has up to date discovered the slightest shade of difference in the spoken languages of the Kaivarttas and of the other people of the district? If no such difference is perceptible to the most censorious critic or the scrutinising enquirer, upon what basis does the theory then stand. Your memorialists have mixed with the people of Midnapore, people of tehir own as well as of other castes, such as Brahmins,

Kayesthas, Vaidyas &e. and they have not the least hesitation in accompanying any enquirer to any village in the distrct to prove to his satisfaction the utter absurdity of Dr. Grierson's opinion. But supposing that Dr. Grierson's theory is correct, and that the Brahmins, Vaidyas and other castes in Midnapore adpoted the dialect introduced by the Kaibarttas, how can one account for the fact that there is no such dialectic difference in the neighbouring district of Howrah, or in any other district where the Chashi Kaivartta element preponderates?

Judging by the light of historical evidence alone, and ignoring altogether the authority of the Hindu Shastras, it would, in the opinion of your memorialists be extremely difficult to prove satisfactorily that, not to speak of Kayesthas, Navashaks and other mixed castes, the numerous groups of Brahmins in this country, whether Rarhi, Barendra or Vaidik, are of true Aryan descent. What result may be disclosed by anthropometric tests, your memorialists cannot ventures to guess; but judging by outword appearence or the test of physiognomy, and by the standard of intellectual development, your memorialist may say, without the fear of contrdiction by the people of other castes in this country who are said to be of Aryan origin, that the Chasi Kaivarttas have as good a claim to Aryan blood as the others have. If shastric authority be alone relied upon, then your memorialists have a far better claim to be recognised as being of Aryan descent than many other Sudra castes.

16. That in concluding this portion of this humble memorial, your memorialists beg respectfuly to submit that the publication of the opinion by Government that the Chasi Kaivarttas and the fisherman Kaivarttas have a common origin, has been heard with amazement and indignation by the people of the caste to which your memorialists belong in every place where the opinion has come to be known and the Government ca easily ascertain the truth of this ascertion by deputing an officer to any village of the districts where there are Chasi Kaivarttas. The poorest cultivator, if told by such an officer that the Government consider him to be of common origin with a Jaliya, would reply simply by stopping his own earswith his fingers, crying RamRam as Hindus do when they significantly express their horror and digused at any abomination. Your memorialists venture to state this because the publication of the report has caused a commotion not only among the educated members of their community each district, but it has stirred the lowest depths of their community.

17. That in the foregoing paragraphs your memorialists have shown that the Chasi Kaivarttas are adistinct caste or endogamous group. They now beg to submit for your cosideration the reasons which in their humble opinion conclusively prove the identity of the Chasi Kaivarttas and the Mahishyas.

It is unnecssary for your memorialists to quote again the Slokas in which the origin of the Mahishyas occurs.

পরিশিষ্ট ২

(১) বৈশ্যাশুদ্র্যোন্তু রাজন্যান্মহিয্যোগ্রৌসুতো তথা।

যাজ্ঞবল্ক সংহিতা।

(২) ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাকন্যারাং মাহিষ্যস্যচ সম্ভবঃ॥

পরশুরাম সংহিতা।

A comparison of these Slokas with the Slokas in wich the the origin of the Chasi Kaivarttas has been mentioned leaaves no doubt as to the common paertage of the Mahishya and the Chasi Kaivarttas. To the question why the offerings of the same parents should be denominated by one appellation in some books and and by another in some other books, the reply is that the use of two different names for the same caste is not a solitary one in the case of the Chasi Kaivarttas. For instance, the offering of a Brahmin father and a Vaishya mother are called by different authorities by three distinct names, such as Ambastha, Vaidya and Vrijyakantha. Of the three names, the last mentioned one is now entirely obsolete, while Ambastha is very rarely used, the name Vaiday being alone used, as the recognised nameof the caste. It is, therefore, nothing strange or unusual for the offspring of a Kshatriya father and Vaishya mother being spoken of by two different names, Mahishya and Kaivartta by different authorities in their respective works describing the origin of the caste.[18] The name Mahishya or Mahishya Das, however, is not so obsolete as the name Vrijyakantha; for it has been in use from the eariest times in many families of the Chasi Kaivarttas in various parts of Bengal. In the Midnapore district, the ancient Raj families of Sujamutha, Turks and Tumlook have always observed the customs and usages in regard to the wearing of the *holy thread and the observance of the period of mourning as prescribed for the Mahishyas in the sacred books.* These Raj families are at present known as Chasi Kaivarttas. It is a historical fact that the Mahishyas were the most powerful people in central Bengal in days of Adisur who had a long continued struggle with them for establishing his supremacy in the country. Now it may be asked what became of this once-powerful clan or caste in Bengal? The supposition that they must have been wholly extirpated by Adisur in their long continued struggle within is a myth of the same kind as the so-called extirpation of the Kshatriyas by Parasuram. There is no other instance in the annals of the Hindu Castes of Bengal of the total extinction of a powerful caste during comparatively recent times so that its identity has been completely lost in oblivion the only rational explanation is that the Mahishyas who had opposed the power of the Sen kings, and who had not like the other castes, agreed to accept the Kanouj Brahmins as their priestly chief, must have been sought to be degraded along with their priests by Adisur and his successors of the Sen dynasty and have therefore, been called by their other caste name Kaivartta as that was shared by a lower caste, the Jaliyas. The principalities of the Haliks e.g. Lat and Kankadwip

---

[18] Pandit Swami Dharmananda Mahavharati in an article published in the Bengal Magazine Janmabhumi for Falgun says, `The celebrated commentator of ancient books Kesavacharipa and Ganapati Bhatta who compiled the Drihat Darma Puran use the word Kaivartta as a synonym for Mahishya. মাহিষ্যাণাং কৈবর্ত্তানাং; মহিষ্যেতু কৈবর্ত্তেতু দাসেতু মাহিষ্যেভ্যঃ কৈবর্ত্তেভ্য।

mentioned in the *Karikas* of the time of Ballal Sen, were no other than the Principalities of the Mahishyas who had by the time come to be known by the names of Halik or Halik Kaivartta, the appellation Halik having been used by themsalves as well as by others who knew them, to distinguish them from the caste of Jaliya.

18. That it has been argued that the identity of the origin of the Mahishya and the Chasi Kaivarttas on the ground of the common occupation of the two, that is agricalture, cannot be maintained, as protection of grain and not agricalture was the occupation of the former as mentioned in the Shastras. The expression *Shashya Rakhsya* has been interpreted to mean only protection of grain and not cultivation. But what on earth was protecting grain apart from cultivating the soil and rearing crops, no ingenious critic has as yet attempted to explain. There had never been, nor there is any such occupation as protecting grain which may be supposed to have afforded or to afford the means of livelihood to an entire community.

Kulluck Bhatta, the great commentator of Manu quotes this expression *Shashya Rakhsya* in his commentary, as that of Ushana but no such expression is to be found in the original Sanhita. The edition of the Sanhita by Pandit Mahadev Shastri of Bambay contains the following Sloka.

"নৃপাজ্জাতোহথ বৈশ্যায়াং গৃহায়াং বিধিনা সুতঃ।
বৈশ্যবৃত্ত্যা তু জীবেত ক্ষাত্রধর্ম্মং ন চাচরেৎ॥"

It means that the son of Kshatriya father by a Vaishya, wife must live by the occupation of a Vaishya, but is never permitted to adopt the occuation of a Kshatriya. That the Mahishyas followed the occupation of aVaishyas is supported by the authority of "Pandit Sarvasva" a book on Smriti of Orissa. According to the Hindu Shastras the occupation of Vaishyas is keeping cows, cultivation and trade (Goraksha Krishi and Banijya) so that the occupation of the Mahishyas is also taht of the Vaishyas ie agriculture and trade etc.

19. That your memorialists have already referred in para 11 to the athoritative decisions of the leading Pandits of Bengal in support of the adoption of the name Mahishya by the people of their community, and it would be unnecessary to refer to those opinions again in this place. These decisions are all unanimous in support of the claims of the Chasi Kaivartta community to the adoption of the name Mahishya as their caste name. It is on the strength of these decisions that the community of your memorialists has adopted Mahishya as the recgnised name of their caste|: and when the last Census in Bengal was being taken, it their humble prayer to the Government that this name may find recognition from the authorities.

20. Your memorialists do not hesitate that their their chief reason for the adoption of this name was the necessity of clearly distinguising their caste from

the Jaliyas who also are known by the name of Kaivartta. They have already stated that the name Halik Das, Parasar das, and Halik Kaivartta were adopted in various parts of the province for differentiating their people from the Jaliya community. But your memorialists have fond that all these names have created greater confusion as regards the origin and social status of their caste. They have therefore revived the ancient name of their community; since its adoption would not create any more confusion between themselves and Jaliya Kaivarttas.

The recognition of this name by government will not lead to any confusion of the caste. On the contrary, it will remove the present confusion regarding the classification an enumeration of the two castes known by the name of Kaivartta. Your memorialists therefore humbly pray that will be graciously pleased to retain the name Mahishya as the recognised name of the Chasi Kaivartta community in the Census table of the Government of India.

And your memorialists as in duty bound shall ever pray.

We have the honour to be.

Sir,

Your most obedient servents.

Raja Kali Orasanna Gajendra Mahapatra.
Trailoki nath Biswas.
Chandi Charan Chaudhuri.
Shosi Bhushan Biswas.
Prasanna Kumar Dass.
Gopal Krishna Dass.
Amrita Lall Dass.
Gurudass Biswas.
Narendra nath Dass.
Mahendra nath Dass.
Ananda Gopal Kanthabharan.
Amriya Lal Dass, M.B.
Debendra nath Biswas.
Hira Lall Biswas.
Ratan Lall Biswas.
Gopennra nath Bhaumick.
Gagan Chandra Biswas B.E.
Rakhal Des Bhaumick. V.L.M.S.
Trilokya nath Biswas 11.
Upendra Krishna Mandal.
Brazendra nath Mandal.
Kali Kumar Mandal.
Krishna Prasanna Mandal.

Nava Kishor Mandal.
Paran Chandra Mandal.
Ram Krishna Mandal B.L.
Khirod chandra Dass.
Girish Chandra Mandal.
Pyari Mohan Ray.
Mahedra nath Tatwanidhi.
Banamali Paul.
Nafar Chandra Dass.
Jaladhar Kolay.
Ishaur Chandra Hazra.
Harinarayan Mallick.
Raj Krishna Roy.
Kedar nath Dass.
Harish Chandra Chakravarty.
Mahendra Nath Dass.
Bhagabati Charan Pradhan.
Sagor Chandra Kabiratna.
Gopal Chandra Sarkar, B.A.
Mahitosh Biswas B.L.
Adhar Chandra DassB.L.
Rakhal Dass Biswas, M.A.
Basanta Kumar Roy, M.a, B.L.
Sitanath Sarkar.
Radhabinodh Biswass.
Kishri mahan Roy Chaudhuri.
Hare Krishna Roy Chaudhuri.
Doyal Chandra Dass.
Chandra Kanta Biswas.
Umesh Chandra Dass.
Kali Kumar Dass.
Phatik Chandra Chaudhuri.
Kailash Chandra Sarkar.
Rajani Kanta Sarkar B.A.
Digindra Chandra Hazra B.L.
Gurudas Hazra.
Chandra Bhushan Roy.
Hari Mohan Sarkar.
Shoshi Bhusan Chaudhuri.
Hari Dass Biswas.
Mukunda Lal Biswas.
Rama Nath Saha.
Golap Chandra Mazumdar.
Sudarshan Chandra Biswas.

Pyari Mohan Sikdar B.L.
Dr. Lal Bihari Samanta.
Mukunda Lal Biswas.
Shashi Bhushon Chaudhuri.
Bishnu Pada Dass.
The member of the Presidency Mahishya Samiti of Bengal.[19]

[19] The memorial was drawn up by one of the signatories, Srijut Gopal Chandra Sarkar, B.A. a native of Chithalia in the Pabna District.

পরিশিষ্ট ২ঘ

১৯১১ সালে জেলে কৈবর্তদের মাহিষ্য পরিচয়ের দাবির বিষয়ে বাংলার শুমারি কর্মকর্তা এলএসএস ও'ম্যালী কর্তৃক বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতিকে পাঠানো চিঠি

No. 422-O. C.
From
L.S.S. O'malley Esq. I.C.S.
Superentindent of the Census Operations Bengal.

To
The Secretary, Central Mahishya Samiti, Bengal.
38, Police Hospital Road, Entally, Calcutta.
Dated Calcutta, 23 February, 1911.

Sir,

I beg to inform you that I have received a memorial from the Calcutta Mahishya Samiti requesting that all Kaibarttas may be returned under the general heading as Mahishya and to request that you will be so good as as to inform me whether this Samiti is connected with the Samiti of which you are the Secretary, and whether it represents the interests of the same community.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant
Sd, S. O'malley Supdt.

পরিশিষ্ট ২৬

১৯১১ সালে বাংলার শুমারি কর্মকর্তা এলএসএস ও'ম্যালীর চিঠির উত্তরে বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির চিঠি

From
The Secretary,
Central Mahishya Samity, Bengal
38, Police Hospital Road, Entally

To
The Superintendent of Census Operations, Bengal.
Dated Calcutta, The 24 February 1911.

Sir,

In reply to your letter No 422-O.C. dated the 23rd inst., I have the honour to inform you that the Calcutta Mahishya Samity, which you reffered to is in no way connected with the "Central Mahishya Samity" Bengal (Bangiya Mahishya Samity) and it does not represent the interests of the community to which we (Chasi Kaibarttas) belong.

We strongly protest the request of the "so called" Calcutta Mahishya Samity to return all Kaibarttas under the one general heading Mahishya, which will be highly prejudicial, objectionable and will deeply wounds the feelings of the Mahishya community formerly known as Chasi Kaibarttas.

It may not be out of place to mention here, for your information that some of the "Jelia Kaibarttas" as I come to learn, induced, out of a malicious spirit by a few members of the other communities, are trying to mislead the Government, and the general public, by recently setting on foot a curious movement, the object of which is to get the Jelia Kaibarttas also returned as Mahishyas.

Your honour is perfectly aware of the fact that it has been finally decided, after a good deal of controversy and with the opinions of several eminent Pandits of India that the Mahishyas (Chasi Kaibarttas) are quite distinct from Jelia Kaibarttas both in origin and social position.

In conclusion, I beg most respectfully to request the favour of your informing me of any other points of misinterpretation against Mahishya Community.

I have the honour to be
Sir,
Your most obedient servant
(Sd.) Narendra Nath Das, Secretary.

পরিশিষ্ট ২

পরিশিষ্ট ২চ

জেলে কৈবর্তদের মাহিষ্য পরিচয় প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে শুমারি কর্মকর্তা এলএসএস ও'ম্যালীর চিঠি

From
L.S.S. O'malley Esq. I.C.S.
Superentindent of the Census Operations Bengal.

To
Babu Radha Nath Das,
Secretary to the Calcutta Mahishya Samity,
Kali Nath Munshi Lane, Chingrighata.
Dated Calcutta, the 1st March, 1911.

Sir,

With reference to your memorial dated the 19th February 1911, asking that all Kaibarttas may be returned under one head as Mahishya, I have the honour to inform you that I am unable to grant your request as the use of the term Mahishya is confined to the Chasi Kaibartta.

I have the honour to be
Sir,
Your most obedient Servant
(Sd.) S. O'mally
Superintendent.

— — — —

Memo No. 4366---C

Copy forwarded to the Secretary, Central Mahishya Samity, Bengal, 38, Police Hospital Road, Itally, Calcutta, for information with refference to his letter of the 24th February 1911.

Calcutta — Sd. S. O'mally

Dated the 1st March, — Supdt. of Census Operations

1911 — Bengal

পরিশিষ্ট ২ছ

পাটনিদের চাষি কৈবর্ত/মাহিষ্য নামের আবেদন গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে শুমারি কর্মকর্তা এলএসএস ও'ম্যালীর চিঠি

From

L.S.S. O'malley Esq. I.C.S.

Superentindent of the Census Operations Bengal.

To

Babu Uma Prashad Das

President

Dated Calcutta, the 1st March 1911.

Sir,

With refference to your letter of no data stating that thr chief occupation of the Patnis is cultivation and that therefore they should be called Chasi Kaibarta and placed under the category of Mahishya, I have the honour to point out that Patnis and the Chasi Kaivarttas have hithero been returned as seperate caste, and that no proof is produced by you to show that the Patnis and the Chasi Kaivarttas from the one and same caste. In these cercumstances, I am unable to accede to your request.

I have the honour to be

Sir,

Your most obedient Servant

(Sd.) S. O'mally

Superintendent.

— — —

Memo No. 4368---c

Copy forwarded to the Secretary, Central Mahishya Samity, Bengal, 38, Police Hospital Road, Itally, Calcutta.

পরিশিষ্ট ২জ

পূর্ববঙ্গ ও আসামের চাষি কৈবর্তদের পক্ষ থেকে তৎকালীন শুমারি কর্তপক্ষের কাছে মাহিষ্য নামের আবেদনপত্র (১)

To

The Hon'ble Sir

LIEUTENANT GOVERNMENT OF EASTERN BENGAL AND ASSAM

The humble memorial of the undersigned members o the Mahishya Caste of the.......

MOST RESPECTFULLY SHEWETH–

1. That you Honor's humble memorialists perused, with unmitigated pleasure and gratitude, the Resolution No. 17690 Appointment Department, dated the 15th February 1907, as published in the "Eastern Bengal and Assam Gazzette" of the 16th February, and that your Honor's humble memorialists beg to offer their heart-felt thanks to the Government for trying to remove a grievance so long keenly felt by members of the Mahishya catse to which your Honor's humble menorialists have the honor to belong.

2. That the Mahishya caste on whose behalf this humble memorial is submitted is locally known by such different names as Das, Mahishya &c., but by whatever of these names the members of this community be called, they all belong to the same Mahishya race (vide Census Procedure Code 1901) and have almost the same status and strength throughout the length and breadth of the country.

3. That, according to the historical account of the country, the only old fighting races of Bengal previous to the advent of the Mahomedan conquerors, were the Mahishyas, the aguris, the Gualas and Mallas, of whom the Mahishyas and Mallas alone maintained independence in the district of Midnapore, Beerbhum, and Bankura till the time of the downfall of the Pathan rulers of Bengal, and were not wholly reduced to the state of actual cultivators till they were finally crushed at the end of the 16th century.

4. That in this district the Mahishyas from one of the most important Hindu castes.

5. That among the Hindus, the Mahishyas alone resemble the Mahomedans in all other respects except in the matters of religion – both the communities being mostly agriculturists, with a thin layer of aristocracy decaying day by day for want of nourishment, and both being equally brave and strong, and the proportion of the educated to the uneducated being almost the same in both the communities.

6. That the Mahishyas like their hardy and brave, brethren, yhe Mahomedans after then, falling down from their former position could ill-afford to compete for Government service with those who have for various reasons, been in advance of them in that particular matter.

7. That having regard to the number, strength, intelligence, perseverance, patience and education.. combined with the fact that most of them are substantial agriculturists and a very large number of them substantial landholders, this community is one of the most important Hindu castes of Bengal.

8. That Mahishya caste being mostly simple and hardy cultivators, have little pretentions to politics and have implicit faith in the sense of justice of the Government.

9. That your Honor's humble memorialists are ready and willing to render as much assistance to the Government as lies in their power in giving effect to the resolution, so far as teir own caste is concerned by corresponding with all the existing social Mahishya Samities and other similar institutions throughout the country if the Government be graciously pleased so to district.

10. That unless some special form of application be prescribed, and some measures be taken against deviation from the line of action indicated in the Resolution, in making appointments, your Honor's memorialists fear that it will take a long time to give effect to the said resolution.

11. The under the circumstances, your Honor's humble memorilists most respectfully pray that the Government will graciously be pleased to issue instructions to the heads of several departments, both in districts and sub-divisions to see that a due proportion of the government patronage is secured to the caste to which your Honor's humble memorialists have the Honor's belong.

And your Honor's humble memorialists shall, as in duty bound, ever pray. *

* This is the form of the memorial submitted by the Mahishyas of the several centres of the New Province in July 1907. A copy of one of the circular letter issued by the Government in response to the memorials has been annexed as Appendix (B).

(The circular letter of the Gov.)
No. 13292C.
GOVERNMENT OF ESTERN BENGAL AND ASSAM.

APPOINTMENT DEPARTMENT.
Appointment Branch.
Shillong, the 2nd December, 1907.
From
C. TINDALL, ESQ. I.C. S.

পরিশিষ্ট ২ঝ

পূর্ববঙ্গ ও আসামের তৎকালীন শুমারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চাষি কৈবর্তদের (মাহিষ্য) কাছে পাঠানো চিঠি (১)

To

Babu Pyari Mohan Das, Pleader,

Sonamgange, (Sylhet)

Sir,

I am directed to acknowledge the receipt of your memorial praying that a due preparation of Government patronage may be accorded to the community which you and the other signatories to the memorial represent.

2. In reply, I am to say that Government will always be prepared to aid your community in any educational scheme that may be put forward for its amelioration, and to that if you will bring to the notice of the local officers, the cases of applicants for Governments service in your community who are qualified according to rules, the Lieutenant-Government has no doubt that their claims will receive sympathetic consideration.

I have the honour to be,

Sir,

Your most obedient servant

(Sd)...

for Under-Secretary.

পরিশিষ্ট ২

পরিশিষ্ট ২ঞ

পূর্ববঙ্গ ও আসামের চাষি কৈবর্তদের পক্ষ থেকে তৎকালীন শুমারি কর্তপক্ষের কাছে মাহিষ্য নামের আবেদনপত্র (২)

To

The Honourable Sir,

LIEUTENANT-GOVERNOR OF EASTERN BENGAL AND ASSAM.

May it please your honour,

We, the undersigned, for ourselves and on behalf of the Mahishya community of this Province, beg leave to approach Your Honour with this humble tribute of address.

The Mahishya community, we have the honour to represent, comprises a considerable portion of the Hindu community, has well-defined position in the upper grades of the Hindu society, from a well recognised section of old gentry of the Province, both in the shape of middle and lower grades of landowners and agriculturists.

We are able to say with pride that ours is a community which has ever been deeply loyal to the Government and is fully conscious of the benefits of the British rule in India. After centuries and centuries of anarchy and misgovernment it is under the British rule that the country is enjoying equal rights of free-citizenship, liberal education, uninterrupted peace, security of person and prosperity, rapid progress in all possible directions, freedom of thought and action unprecedented in the history of India. Under the rule free-booters like the Pindaries and the 'Thugs disappeared from the land, and brands of dacoits subsequently arose as remnants only to be crushed for good at the hands of the benign Government. Our community firmly believes that the lawless actions of the seditionists are only the precursor of their utter annihilation.

Our community avows with heartfelt gratitude that the British Government is the only Government in the annals of India which has, at heart, the interest of the whole population of this vast country and not of any particular race, caste or creed. We are conscious that the Government is practically fighting out a battle for the millions who once groaned under oppression and injustice. We pray that the all merciful God, who has brought the British people to rule us, may help them in fulfilling their great mission.

It is most re-assuring that Your Honour has directed attention to that important part of duty, imposed on the rulers of a country like India inhabited by races and castes representing interest often conflicting, which consists in nursing, with due care and tenderness, the interest of different castes and races lying in different stages of civilization in their respective onward course to progress. We hope that the New Province under Your Honour's administration will serve as a model province.

We take this opportunity of expressing our heart felt gratitude to Tour Honour for the resolution of 1907 which provides for the distribution of patronage among all classes. We

will not fail to use our endeavours for the advancement of our community in the manner indicated in the Circular Letter, from Your Honour's Government, of the 2nd December, 1907, and we trust that we shall always receive sympathetic consideration in this matter which so vital to us.

In consideration of the backwardness of our community in matters of education, special provisions for the establishment and maintenance of schools and boarding houses in important Mahishya centers are very desirable. We read with great satisfaction the Resolution of the Government providing a number of new scholarships for backwards classes. These measures will, we hope, serve to ameliorate the condition of our community. We may add that we submitted an educational scheme to the Government sometime back. We earnestly hope that the same will meet with Your Honour's favourable consideration.

In common with the rest of India, we desire to express our gratitude for the recent administrative changes announced by the Secretary of State, and we hope that in making these changes due regard will be had to the interest of all classes.

We cannot but take this opportunity of expressing our deepest hatred against sedition, lawlessness and anarchism existing in some parts of the country. We trust that the measures which the Government has taken will serve to suppress the evil, and we shall always aid the Government in the maintenance of law and order.

Lastly, we beg to give expression to the deepest loyalty of our community to the Government and our greatest for, and confidence in, Your Honour's administration, and we pray that the Almighty God may grant Your Honour health and vigour for discharging the responsible duties of Your Honour's exalted office.

We beg to subscribe ourselves,

Your Honour's most obedient servants. *

পরিশিষ্ট ২ট

পূর্ববঙ্গ ও আসামের তৎকালীন শুমারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চাষি কৈবর্তদের (মাহিষ্য) কাছে পাঠানো চিঠি (২)

A deputation of a large number of influential and leading Mahishya gentlemen of the Province of Eastern Bengal and Assam waited upon, and, on behalf the Mahishya community of the Province, oresented an address to the Hon'ble Sir Lancelot Hare, K.C.S.I. , E. , I C.S. , The Lieutenant Governor, in the Governor House, dacca on the 15th January, 1909, and His Honour was pleased to give the following reply:–

"Gentlemen,

"I have had much pleasure in receiving your address, and it is with much satisfaction that I accord you a very hearty welcome.

"I you represent a very large important community of this province, constituting nearly 3/5 of its population, and that in coming before me with this address, your object is to call my attention to your wants and aspirations and to interest me in your welfare

*The name s of the leading Mahishya signatories of different districts of new Province are omitted as being numerous.

"You call to mind the benefits which the country has received from the British rule, and point out the protection which this rule afforded to you and the opportunities you have thereby had for peaceful development and progress. It is very gratifying to me that you recognize so clearly, as you evidently do recognize, the impartial character of the Government and its honest desire to extend its protection alike to all classes and creeds. You may rest assured that I shall always pay a most sympathetic regard to your representations."

"The importance at this particular moment of putting yourselves forward rests in the fact that creation reforms are now under contemplation and you are naturally anxious that in these reforms your interests shall not be disregarded. Hitherto it has been for the Government to ascertain your wants and requirements and to take the necessary measures to safe-guard your interest. This duty will continue to fall upon the Government and adequate powers must be retained by the Government to enable it to carry out this purpose. At the same time, Government look to you not only for moral support, but under the circumstances which now exit, it expects active assistance, I welcome your strong expression of hatred and condemnation of the lawless action of which certain persons have been guilty, and I count upon your active co-operation in their suppression. I would remind you that unless you come forward even at some personal risk to yourselves, with information of the tyranny and suppression by which certain misguided people are attempting to force you to act contrary to your natural inclination and wishes, it exceedingly difficult for Government to afford you adequate protection. I therefore welcome the information of your society, as it will not only give you the means of

bringing prominently to the notice of Government and the public your views and interests, but will create leaders who will be in a position authoritatively to inform the Government of abuses which may be found to exist.

"It remains for me only to thank you for the kind expression of your good will towards me and assure you again that the sympathetic interest of of this Government will always be extended towards you, and that every effort will be made to secure your prosperity and welfare."

পরিশিষ্ট ২ঠ

পূর্ববঙ্গ ও আসামের তৎকালীন শুমারি কর্তৃপক্ষের কাছে চাষি কৈবর্তদের (মাহিষ্য) পাঠানো ইশতেহার

THE MANIFESTO.

THE MAHISHYA COMMUNITY OF THE COUNTRY

SIRS,

It is well-known that we, the Mahishyas re deeply loyal to the British Government and, as such, do not require any manifesto to trumpet out our loyalty. We have all along offered resistance to the forces of lawlessness and disorder. But yet it cannot be said that we discharged all our duties both to the Government and to ourselves. It is therefore necessary to understand our duties. It is for this reason that we the undersigned Mahishya members of the province have ventured to define our duties and responsibilities under the present state of things. We have already indicated that it is not enough to say that we are loyal. Loyalty is, as we understand, a deep sense of gratitude to the protecting power, an implicit faith in its sense of justice, from allegiance and attachment to it and a determination to come to its help whenever required. We live under the protection of a benign Government the like of which perhaps never existed in this wretched country within the memory of history.

A distinguished citizen America, a country which is believed to enjoy liberty in the highest degree conceivable, confessed the other day on his return from England that English people under their Government enjoy liberty in a far greater degree than the Americans themselves do. We, the Indian races, live under the protection of that very Government modified only so far as to suit the requirements of the continent of India, representing the most divers and most conflicting interests the world has ever known. It is by the Divine will that the greatest and the most advanced race in the world has taken upon itself onerous duty of administering even-handed justice to Indian races claiming interests of so conflicting a nature.

It is a notorious fact that this conflict of interests has rendered solution of good many problems extremely difficult. We require a strong extraneous force to keep us within our respective bounds for the common good of the country and for preventing us from trampling on one another's interests. We have seen formation of leagues for monopolising privileges showered on the country by the British rule. Nay, this and similar other actions persisted in by some people have led many to believe that it is not possible to receive even the blessing of a proposal of gift of new privileges and rights from the Government without misgivings; as such privileges, unless duly and carefully regulated, would practically arm some with tremendous power depriving others of that protection so long guaranteed by the impartial character of the British rule.

পরিশিষ্ট ২

We feel for those who are so grievously labouring under a misconception of actual state of things. We the Indian races, are still steeped in superstition bigotry, selfishness, murderous race-feelings and clanishness in in all departments of life. We have not sufficiently learnt as yet to respect one another. We can rarely appreciate education and progress of others. Many of us are frightened out of wits if they bear of education being spread among the people! Indeed our education is too imperfect, society too primitive, notions yet too crude, minds too narrow, conceptions of things too hazy to entitle us to the position of the great ruling races of the world. Modern European conception of society, brotherhood, fellow-citizenship, fellow-feeling, equal rights, charity, duty and Government has entered into us only skin-deep. It is but too plain that no Indian race or group of Indian races even within centuries to come. British Government in India is therefore an indispensable necessity. Nothing on earth can replace it. It is the right thing in the right place. It is the Divine will that myriads of the Indian races, whom we pity and who are half-dead under tyranny and oppression of ages, will revive and re-occupy their respective positions under the vivifying influence of the British nation to the eternal glory of the British rule. Those who will stand in the way of such progress will perish like flies in conflagration. as the people of the country have once tasted the advantages of the British rule, they will stick to it and stand by it.

The advantages of the British rule alluded to above are real and not imaginary. There is inconvincible progress in all directions. No right-thinking man can be ungrateful to the Government. It has worked a revolution in the direction of progress. Look at the condition of the several classes of men of our country. The treatment meeted out to Zemindars by the previous Government is recorded in history, we need not revert to that. They are now a prosperous class and are treated like the English gentry and nobility. The unsettled condition of the country previously rendered trade risky and often unprofitable. The traders were victims of the hardier races of the country, who swooped down upon them at pleasure. But protection and facilities afforded by the British rule has opened to the trader easy path to wealth. Even shop-keepers belonging to the lowest classes, so helpless and miserable in society, are now becoming wealthy and emerging out from their degradation.

Even the higher classes of agriculturists, not to speak of the lower one's were for various reasons, doomed things. Now their disadvantages are giving way. They are no longer hampered by unjust interference against free trade and exportation which used to compel them to sell the whole produce of their jotes at a nominal price, and as result they used to remain in abject poverty and almost in a state of slavery to the convince of some. Now free-trade has proved a blessing to the agriculturists. They get now full reward of their labour and are bringing abundance of wealth in to the country. They are now enjoying a enviable freedom and comfort. They are growing in importance and are fast becoming a power.

With the exception a few weavers of Bengal who suffer from want of spirit of enterprise, all other artisan classes are rising and thriving fast. Great demand for labour is ameliorating the condition of the labouring class. The country is thus continually growing wealthy. Signs of growing prosperity are visible every where in the country.

Some sections are progressing beyond dreams. Even some of them have become giddy at the height of their flights of fortune and are asking for the moon.

The Mahishya community as a class understood the real nature of the new sort agitation and stood aloof from it. And when the clouds of sedition, disaffection and lawlessness were looming in the horizon, the Mahishyas were the first among those having position and stake in the country to declare from the very beginning their deep loyalty to the Government and their appreciation of the manifold blessings showered by it on the country, and their intense hatred against seditious movements. Other big Hindu races subsequently did the same. The Rajputs, the Shikhs, the Jaths, the study Maharatta cultivators, and many others, as well as the ruling princes, the landed aristocracy and various other professions have since declared their loyalty one by one. The loyalty of the Mahomedan community is too well-known to require mentioning. Account must be taken of the dumb millions deeply attached to the Government though no expression of loyalty could proceed for them. Indeed the Government ids dearly loved by the people.

Whatever may be the methods of other loyal sections, we, the Mahishyas, must demonstrate our loyalty by action as we are always doing. We must be on the alert that none of us, whether adults or children, landholders or profesional men, agriculturists or any, be seduced. We must be actively on the side of law, order, progress and humanity.*

*The names of the signatories are omitted, they being thousands in number.

(ABOUT THE MANIFESTO)

No. 2922A.

GOVERNMENT OF EASTERN BENGAL AND ASSM

Appoint Department.

Appoint Branch

From

THE HON'BLE MR. P.C.LYON. C.S.I.I.C.S

Chief-Secretatry to Government.

পরিশিষ্ট ২ড

১৯০৯ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসামের তৎকালীন শুমারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুনামগঞ্জ মাহিষ্য সমিতির সম্পাদকের কাছে পাঠানো চিঠি

To
BABU KAMAL CHANDRA DAS,
Secretary to the Mahishya samiti,
Sonamegange, Sylhet.
Dated Shillong, the 1st July, 1909.
Sir,

I am directed to acknowledge with thanks the receipt of your letter no 342 dated the 28th May, 1909, forwarding a copy of the Manifesto of your samiti in Dacca and Sonamganje, and to say that his Honour the Lieutenant Governor has persued it with interest and notes with gratification the expression of loyalty to the established Government that are contained in it.

I have the honour to be,

Your most obedient servent

(Sd) P.C. Lyon.

Chief-Secretary to Government.

পরিশিষ্ট ২ঢ

ইশতেহার প্রতিলিপি সর্বত্র প্রচারের নির্দেশপত্র

(His Excellency the Viceroy's appreciation)

Letter no. 1047. T, dated Camp Shillong, the 7th August, 1909, from the Offg: Commissioner of the Surma Valley and Hill Districts, to the Deputy Commissioner, Sylhet.

I have the honour to request that you will be so good as to Babu Kamal Chandra Das, Secretary to the Mahishya Samiti at Sonamgange that his Excellency the viceroy has appreciated the loyal sentiments expressed in the Manifesto issued by the Mahishyas of dacca and Sonamgange samitees, a copy of which submitted by the Local Government of India.

Memo no. 3604.

Dated Sylhet, the 14th August, 1909.

Copy forwarded to the Assistant Secretary to the Mahishya samiti, sonamgange with reference to his no. 339 dated the 28th May, 1909.

(Sd) I.J. Barniville

Deputy Commissioner, Sylhet.

পরিশিষ্ট ৩

কৈবর্ত/মাহিষ্য জাতিবর্ণের উপরে লিখিত কয়েকটি গ্রন্থের আখ্যাপত্রের ছবি

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে নিম্নোক্ত পাঁচটি গ্রন্থের আখ্যাপত্র মুদ্রিত করা হলো। গ্রন্থগুলোর নাম:

১. শ্যামাচরণ কবিরত্ন রচিত 'জাতিতত্ত্ব' গ্রন্থের আখ্যাপত্র।

২. প্রকাশচন্দ্র সরকার রচিত 'বৃহৎ মাহিষ্যকারিকা' গ্রন্থের আখ্যাপত্র।

৩. ধর্মানন্দ মহাভারতী রচিত 'মাহিষ্য-সিদ্ধান্ত' গ্রন্থের আখ্যাপত্র।

৪. বিজয়ভূষণ ঘোষ-চৌধুরী রচিত 'আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি' গ্রন্থের আখ্যাপত্র।

৫. পূর্ণলাল দাস কর্তৃক অহমিয়া ভাষায় রচিত 'সতী রাধিকা' গ্রন্থের আখ্যাপত্র।

শ্যামাচরণ কবিরত্ন রচিত 'জাতিতত্ত্ব' গ্রন্থের আখ্যাপত্র

জাতিতত্ত্ব

(বৈদ্য, যোগী, মাহিষ্য ও কায়স্থের)

পণ্ডিতরত্ন

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি

লিখিত

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।

(গীতা)

কাশীধাম

(৮০ নং মিশির পোখরা)

বিশালাক্ষ পাঠশালা হইতে

তৎসম্পাদক

শ্রীসারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশিত

১৩৩২

পরিশিষ্ট ৩

প্রকাশচন্দ্র সরকার রচিত ‘বৃহৎ মাহিষ্যকারিকা’ গ্রন্থের আখ্যাপত্র

শ্রীগোবর্দ্ধন কৃত

বৃহৎ মাহিষ্যকারিকা

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার

এম্-এ, এল-এল-বি, এম-আর-এ-এস,

এড্‌ভোকেট কলিকাতা হাইকোর্ট।

দ্বারা

সংগৃহীত ও সংকলিত।

কলিকাতা।

সন ১৩৩১ সাল।

(সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

ধর্মানন্দ মহাভারতী রচিত 'মাহিষ্য-সিদ্ধান্ত' গ্রন্থের আখ্যাপত্র

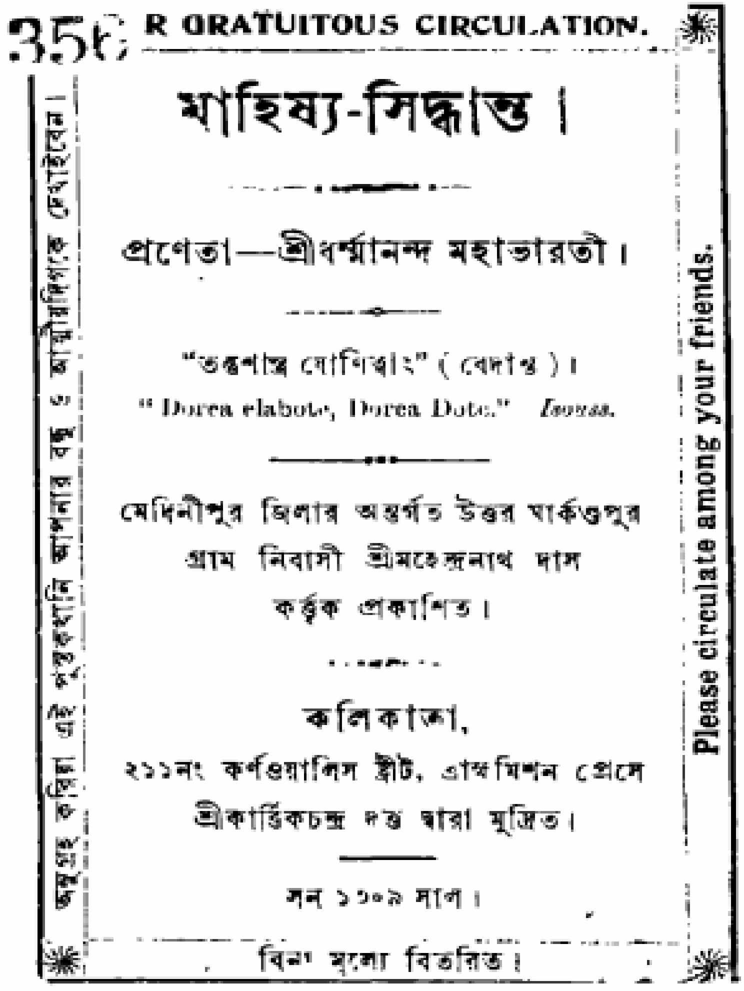

3556

R GRATUITOUS CIRCULATION.

মাহিষ্য-সিদ্ধান্ত।

প্রণেতা—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

"তত্ত্বশাস্ত্র যোগিত্বাং" (বেদান্ত)।

"Dorea elabote, Dorea Dote." *Isonas.*

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত উত্তর খার্কণ্ডপুর
গ্রাম নিবাসী শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,
২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৯ সাল।

বিনা মূল্যে বিতরিত।

অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তকখানি আপনার বন্ধু ও আত্মীয়দিগকে দেখাইবেন।

Please circulate among your friends.

পরিশিষ্ট ৩

বিজয়ভূষণ ঘোষ-চৌধুরী রচিত 'আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি' গ্রন্থের আখ্যাপত্র

আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি

আসাম পর্য্যটক—

শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ-চৌধুরী প্রণীত ও প্রকাশিত

ঘাটেশ্বরা, জেলা—২৪ পরগণা

১৩৩৯—জ্যৈষ্ঠ

থম সংস্করণ]

[আড়াই টাকা

পূর্ণলাল দাস কর্তৃক অহমিয়া ভাষায় রচিত ‘সতী রাধিকা’ গ্রন্থের আখ্যাপত্র

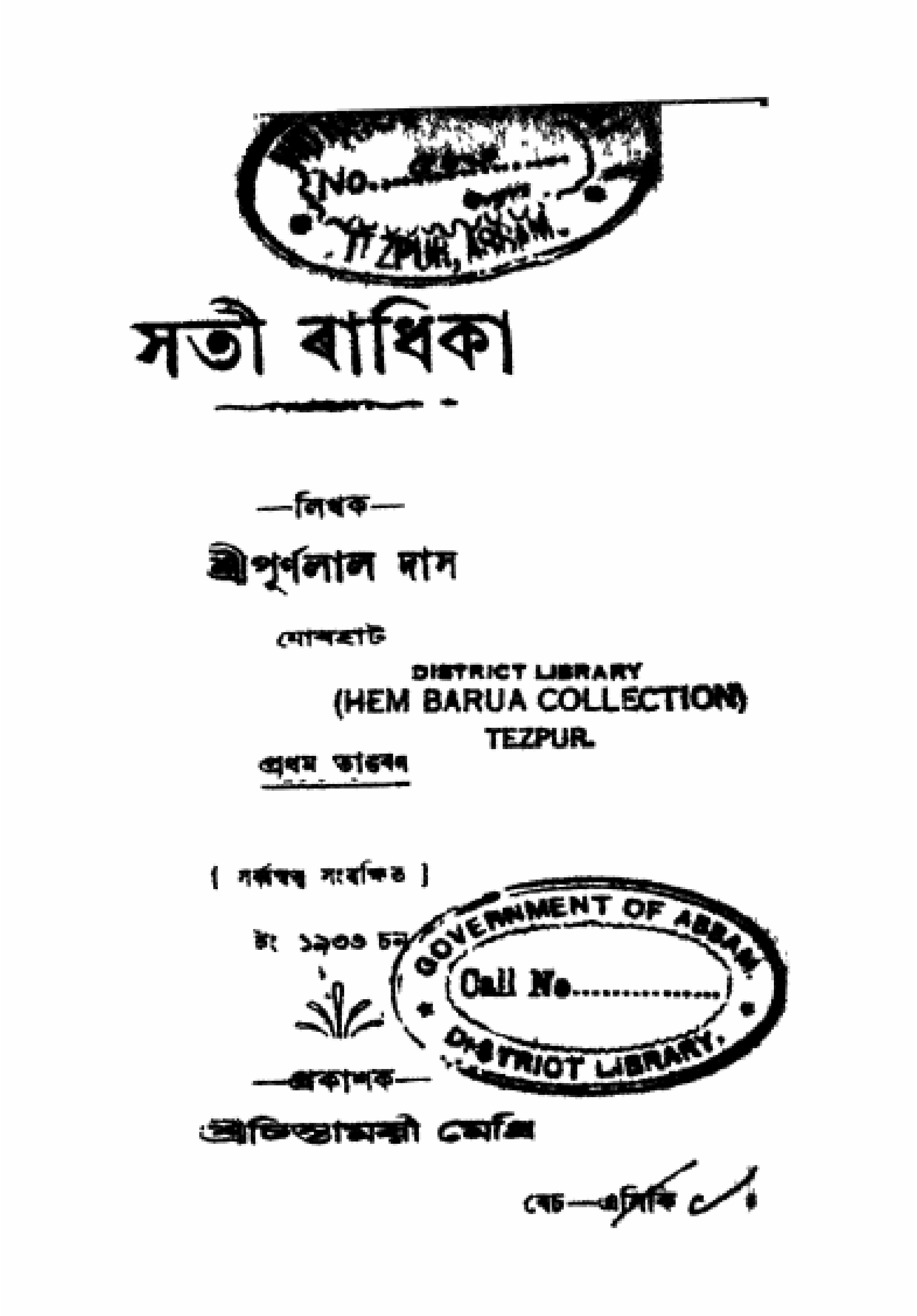

NO.
TEZPUR, ASSAM.

সতী ৰাধিকা

—লিখক—

শ্ৰীপূৰ্ণলাল দাস

যোৰহাট

DISTRICT LIBRARY
(HEM BARUA COLLECTION)
TEZPUR.

প্ৰথম তাঙৰণ

[সৰ্ব্বস্বত্ব সংৰক্ষিত]

ইং ১৯০৩ চন

GOVERNMENT OF ASSAM
Call No.................
DISTRICT LIBRARY.

—প্ৰকাশক—

শ্ৰীচিন্তামণী মেধি

বেচ—এসিকি

পরিশিষ্ট ৪

তথ্য সংগ্রহের আলোকচিত্র

পরিশিষ্ট ৪

দিব্বকের স্মৃতিবাহী স্তম্ভ

রাজশাহী শহরের সপুরা কারখানায় রেশম শাড়িতে নকশা করছেন এক মাহিষ্য নারী

পরিশিষ্ট ৪

নওগাঁ জেলার কৈবর্তখণ্ড গ্রাম, এখন সেখানে কোনো কৈবর্ত থাকে না

কৈবর্তখণ্ড গ্রামের একমাত্র হিন্দু পরিবারের (কামার) একজন সদস্য

পরিশিষ্ট ৪

নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলার কৈবর্তগ্রাম, এই গ্রামেও কোনো কৈবর্ত নেই

নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলার কৈবর্তগ্রাম

পরিশিষ্ট ৪

চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গা জেলেপল্লীর মুদি দোকানদার ব্রাহ্মণ পুরোহিত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরের হরিণবেড় গ্রামে কর্মরত মালো কৈবর্ত

পরিশিষ্ট ৪

চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গা জেলেপাড়া, জেলেদের বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার প্রস্তুতি

সিলেট শহরের হালদারপাড়ায় জেলে কৈবর্তদের সঙ্গে দলীয় আলোচনা

পরিশিষ্ট ৪

বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ফুলবাগান, কলকাতা।

সম্পাদক, বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি

পরিশিষ্ট ৪

নওগাঁ জেলার রানীনগর উপজেলার দেউলা গ্রামে দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী মাহিষ্য ব্যক্তিদের একাংশ

ছবি: তমলুক রাজবাড়িতে দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সঙ্গে গবেষক